বাঙালী সংস্কৃতির রূপ

গোপাল হালদার

অগ্রণী বুক ক্লাব

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

প্রবন্ধ-গ্রন্থ : সংস্কৃতির রূপান্তর
এ যুগের যুদ্ধ
বাজে লেখা

উপন্যাস : একদা
পঞ্চাশের পথ
উনপঞ্চাশী
তের শ' পঞ্চাশ
ভাঙন (যন্ত্রস্থ)

গল্প সংগ্রহ : ধূলিকণা (যন্ত্রস্থ)

●

প্রকাশক
প্রফুল্ল রায়
অগ্রণী বুক ক্লাব
১৬ বৃন্দাবন বসু লেন
কলিকাতা-৬

মুদ্রাকর
শ্রীকালীপদ চৌধুরী
গণশক্তি প্রেস
৮ই ডেকার্স লেন, কলিকাতা-১

প্রচ্ছদপট
শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

ব্লকনির্মাণ ও প্রচ্ছদপট মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
৭২।১ কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা

বাঁধাই করেছেন
হার্টসন এণ্ড কোং (ইণ্ডিয়া)
১২ হলওয়েল লেন, কলিকাতা

মূল্য চার টাকা আট আনা

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ, ১৩৫৪, মে ১৯৪৭

নিবেদন

ভূমিকা স্বরূপ যা বলবার ছিল এ গ্রন্থের 'কথা সূত্রেই' তা বলা হয়েছে। তার পরে বাঙালী জীবনে দুর্যোগ আরও ঘনিয়ে উঠেছে; এখন 'বঙ্গ-ভঙ্গই' এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতির বাহকদের অনেকের একমাত্র স্বপ্ন।

প্রশ্নটা অনেকাংশে রাজনৈতিক সতরঞ্চ খেলার প্রশ্ন,—কিস্তি এড়াবার জন্য পাল্টা কিস্তি। যতক্ষণ পর্যন্ত বাঙালী হিন্দু বুঝতে না পারবেন—"প্রত্যক্ষ সংগ্রামে" উদ্যত মুসলমানই সমস্ত মুসলমান নন,—তার বাইরেও আছেন বহু সাধারণ মুসলমান;—বাঙলার ষোলটি জেলা জুড়ে এ-সময়েও যাঁরা কৃষকের নতুন বাঙলা রচনা করছেন হিন্দুর সঙ্গে হাজং সাঁওতালের সঙ্গে বুকের রক্ত ঢেলে; এ সময়েও যাঁরা কলকাতা ও তার শিল্পাঞ্চলে ট্রামে, পোর্ট-ট্রাস্টে রচনা করছেন শ্রমিকের নতুন বাঙলা;—এবং যতক্ষণ পর্যন্ত "১৯৪৮ এর জুনের" আশ্বাসে বাঙালী নেতৃ-মণ্ডলী আস্থা রাখবেন, আস্থা রাখবেন না তাঁদের বিপ্লবী ঐক্যের ও বিপ্লবী সাধনার উপরে,—ততক্ষণ পর্যন্ত এই বাঙালী হিন্দুর চক্ষে বাঙালীর ইতিহাসের রূপ আর ধরা পড়বে না, খণ্ড বিকৃত বাঙলারই তারা ধ্যান করবেন—'কলোনির কেরানী-অভিশাপের' বশে।

কিন্তু প্রশ্নটা শুধু মাত্র রাজনীতির প্রশ্ন নয়, বাঙালী সংস্কৃতিরও প্রশ্ন। বরং এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতির রূপ চিন্‌লে, তার ঐশ্বর্য ও তার অসঙ্গতি,—বাঙলার 'ভদ্র সংস্কৃতি' ও 'লোক-সংস্কৃতির' বিচ্ছেদ-বিরোধ, এই 'বাবু কাল্‌চার' ও 'মিঞা কাল্‌চারের' জাল-মামলার অর্থ বুঝলে, বাঙলার সেই ঐতিহাসিক রূপ স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। তারপর বাস্তব দৃষ্টিতে যুদ্ধ ও যুদ্ধান্তের বাঙালী জীবনের বিপর্যয়, বাঙালী সংস্কৃতির নতুন পরীক্ষা ও প্রয়াসের অর্থ জানলে, বুঝ্‌তে কষ্ট

হয় না—এই পুরাতন অসঙ্গতি কোন্ নূতন সৃষ্টির মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করতে চায়।

হিন্দু-মুসলমান, মধ্যবিত্ত ও শ্রমিক কৃষক, সকলের দিক থেকে এ গ্রন্থে বাঙালী সংস্কৃতির এই রূপ ও রূপায়ন-সম্ভাবনাই নানা ভাবে নানা-উপলক্ষে আলোচিত হয়েছে। বাধ্য হয়ে অনেকক্ষেত্রে আলোচনা সময়াভাবে ও স্থানাভাবে সংক্ষেপে ও সূত্রাকারে শেষ করতে হয়েছে। সচরাচর স্বীকৃত তথ্য ও তত্ত্ব অপেক্ষাও আমি বাঙালী সাধারণের সাম্‌নে তুলে ধরতে চেয়েছি সেই সত্যকে যার প্রমাণ পাওয়া যায় বাস্তব তথ্যে ও জিজ্ঞাসায়। আলোচনা পদ্ধতিতে ত্রুটি-বিচ্যুতি এরূপ ক্ষেত্রে রয়েছে জানি; কিন্তু তার চেয়ে বেশি লেখক প্রত্যাক্ষা করবে—আলোচ্য বস্তুর সমালোচনার। তা হলেই সে কৃতার্থ হবে।

প্রসঙ্গত নানা ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিশ্লেষণ আমাকে করতে হয়েছে। তার কারণ তাদের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব নয়; বরং বাঙালীর জীবনে তাদের শক্তি ও প্রভাবেরই তা স্বীকৃতি। ব্যক্তিগত ভাবে লেখককে তাঁরা দায়ী না করলে আমি কৃতজ্ঞ থাকব।

ত্রুটি বিচ্যুতির মধ্যে একটি কথা স্বীকার করা বাহুল্য—ছাপার ভুল। পাঠকের তা সহজেই চোখে পড়বে। আমি 'চলন্তিকা'-সম্মত বাঙলা বানানের পক্ষপাতী। কিন্তু নিজেও সর্ব ক্ষেত্রে তা পালন করতে পারি না, বাঙলা দেশের মুদ্রাকরেরাও এখনো পর্যন্ত সে বানানে অভ্যস্ত হয়ে ওঠেননি। তার উপরে, এ গ্রন্থের প্রুফ্ কেউ একজন পূর্বাপর না দেখাতে নিয়মের ব্যতিক্রমও বারেবারে ঘটেছে। পাঠকের নিকট থেকে এ জন্য যে ক্ষমাশীলতা আশা করছি, তা বাঙলা লেখক হিসাবেও বুঝি অত্যধিক প্রার্থনা। তবু সেই প্রার্থনা জানাচ্ছি।

সংস্কৃতিক্ষেত্রের বহু বন্ধু, সহকর্মী, সতীর্থকে আমার ধন্যবাদ। এ আলোচনা ও এ গ্রন্থের মূলে আছে তাঁদেরই দান—বিচার, বিশ্লেষণ, প্রেরণা—এবং তাড়না।

ইতি ১লা মে, ১৯৪৭।

পূজনীয়

শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীচরণেষু

সূচী

কথা-সূত্র

বাঙালী সংস্কৃতি বল্‌তে সাধারণত আমরা বুঝি—বাঙালী জাতির জীবন-যাত্রা আর তার সংস্কৃতিকে। অবশ্য 'সংস্কৃতি' কথাটা খুব ব্যাপক; আমরা ইংরেজি 'কালচার' কথাটির মতই ব্যাপক অর্থে তা প্রয়োগ করি। তাই সংস্কৃতি বল্‌তে আমরা বুঝি মানুষের প্রায় সমুদয় বাস্তব ও মানসিক কীর্তি ও কর্ম; তার জীবনযাত্রার আর্থিক সামাজিক রূপ, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান; তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা-ভাবনা, নানা বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া আর নানা শিল্প সৃষ্টি—সমস্ত কারুকলা ও চারুকলা এই হল সংস্কৃতির স্বরূপ (দ্রষ্টব্য: 'সংস্কৃতির স্বরূপ')।

ভদ্রলোকের ভিত্তিভূমি

কিন্তু বাঙালীর সংস্কৃতি বল্‌তে আমরা সাধারণত ইংরেজ আমলের ইংরেজি শিক্ষিত বাঙালী সমাজের জীবন-যাত্রা, ও তার বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টি সমূহকেই বুঝি। এই শিক্ষিতদের বাইরেও বাঙালী জন-সমষ্টি রয়েছে। তাদের সেই লোক-সংস্কৃতির ধারাকে আমরা এ-হিসাবের মধ্যে সাধারণত গ্রহণ করি না। আবার, ইংরেজ আমলের পূর্বে বাঙালী জাতি প্রথম যুগে (মোটামুটি পাল রাজত্ব থেকে তুর্ক বিজয় পর্যন্ত) কিংবা মধ্যযুগে (মোটামুটি মুসলমান আমলে) যে জীবন-যাত্রা ও যে সংস্কৃতি উদ্ভাবনা করেছে, তাও এই বাঙালীর সংস্কৃতির হিসাবে আমরা বিশেষ গণনা করি না। একালের "বাঙালী কাল্‌চারের" সঙ্গে বাঙলার একালের লোক-সংস্কৃতির যোগ প্রায় নেই; প্রথম যুগ ও মধ্যযুগের বাঙলার সংস্কৃতির দানও এর

প্রধান বস্তু নয়; এমন কি প্রাচীন বা মধ্যযুগের ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গেও এ কালচারের যোগ বিশেষ ঘনিষ্ঠ নয়। কারণ, এ বাঙালী কালচার এক নতুন শ্রেণীর ও নতুন ধরনের বাঙালীর সৃষ্টি! (দ্রষ্টব্য: 'বাঙ্গালী সংস্কৃতির রূপ-রেখা') ইংরেজ শাসন-কালে বিশেষ করে সাম্রাজ্যবাদী ব্যবস্থার মধ্যে, সে ব্যবস্থার ও তার প্রচলিত ইংরেজি শিক্ষার ঘাত-প্রতিঘাতে বাঙলার সমাজ প্রায় নতুন রূপে গড়ে উঠ্‌ল। কর্নওয়ালিসের তৈরী জমিদারী-তন্ত্রে জমির মধ্যস্বত্ব ও বিদেশী শাসকের চাকরি-বাকরি জীবিকার প্রধান অবলম্বন রূপে লাভ করে বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত "ভদ্রলোকদের" এক নতুন অভ্যুদয় ঘটল। পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষায় ও নতুন আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তারা চিন্তায় ও সৃষ্টিতে নিজেদের এক অদ্ভুত পরিচয় দান করলেন। মোটামুটি তা'ই বাঙলার কালচার, বা আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি—সাম্রাজ্যবাদের আওতায় মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু ভদ্রলোকেদের দান। মধ্যবিত্তের সেই পরাশ্রয়ী জীবনে তখনো হেরফের কম ছিল না (দ্রষ্টব্য: 'রিনাইসেন্সের হেরফের'), তাঁরা সৃষ্টির প্রেরণা পেয়েছিলেন পাশ্চাত্যের ধনিকতন্ত্রী জীবনাদর্শে।

কালান্তরের সূচনা

কিন্তু এই "এ কালেরও" কালান্তর এবার ঘট্‌ছে। সে কালান্তরের সূচনা হয়েছিল প্রথম মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) শেষেই। তখনই বোঝা গেছল—সাম্রাজ্যবাদই যে শুধু আপনার বিরোধে আপনি বিনষ্ট হতে যাচ্ছে তা নয়, তার চাপে তারই সৃষ্ট বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজও নিঃশেষ হতে চলেছে এবং সাম্রাজ্যবাদের ও জমিদারী-তন্ত্রের নানা শোষণে আর পেষণে বাঙালী সমাজের কৃষি-বনিয়াদই ধসে যাচ্ছে। জমির উপস্বত্ব-ভোগীদের বোঝা তা আর বহন করতে পারছে না। অন্যদিকে চাকরির বাজারেও শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা আর সকলে স্থান করতে পারছে না—সেখানে তাদের সংখ্যা বেড়েছে। উল্টো, ইংরেজের শিক্ষা দীক্ষারও রাজটীকা নিয়ে সেখানে স্থান দাবী করছে নিম্নবর্ণের ও মুসলমান সম্প্রদায়ের নতুন মধ্যবিত্তরা।

ভদ্রলোকের জীবন-যাত্রায় সঙ্কট দেখা দিলে ভদ্রলোকের সংস্কৃতিতেও সঙ্কট দেখা দেবে—সঙ্গে সঙ্গে না হোক, একটু আগে কিম্বা একটু পরে। (দ্রষ্টব্য:

'বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্কট') আসলে বাঙালী সংস্কৃতির সে সঙ্কটের প্রথম আভাসও দেখা দিয়েছিল তখনি—প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে। মুসলমান সমাজের থেকে শিক্ষিত মধ্যবিত্তের উদয়ের সঙ্গেই দেখা গেল বাঙালীর এ-কালের সংস্কৃতির দুর্বলতা কত বেশি। হিন্দু ভদ্রলোকের সঙ্গে চাকুরির বাজারে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমে অতি সহজেই বাঙালী মুসলমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত এ সংস্কৃতিকে প্রতিযোগীর সংস্কৃতি বলে, হিন্দুর সংস্কৃতি বলে, গণ্য করতে চাইলেন; তাঁরা খুঁজতে লাগলেন মধ্যবিত্ত মুসলমান সংস্কৃতির কোনো স্বতন্ত্র যাত্রাপথ। সেইজন্যই মধ্যযুগের হিন্দু-মুসলমান বাঙালীর যুক্ত-সংস্কৃতি ও সাহিত্যকে নিজের বলে গ্রহণ না করে, বাঙালী সাধারণ মুসলমানের লোক-সংস্কৃতিকেও গণ্য না করে, নতুন মধ্যবিত্ত মুসলমান আরব্য-ঈরানী মুসলিম্ সংস্কৃতির পুরনো ও হারানো ধারাকেই খাত কেটে বাঙলায় বহাবার স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। (দ্রষ্টব্য: 'বাঙালী মুসলমান ও মুস্‌লিম সংস্কৃতি', 'বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতি' এবং 'বাঙালী মুসলমানের কাব্য সাধনা')। নন কো-অপারেশনের পর থেকে বাঙলার সংখ্যাগুরু মুসলমান সম্প্রদায় যতই তাঁদের রাষ্ট্রীয় গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হতে লাগলেন ততই নবজাগ্রত মুসলিম মধ্যবিত্ত শ্রেণী হিন্দু "বাবু কাল্‌চারের" প্রতিদ্বন্দ্বী-রূপে মুসলিম "মিঞা কাল্‌চার" গঠনের স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। সাম্রাজ্যবাদের পরিবেশে যে বাঙালী ভদ্রলোক ও ভদ্রলোকের সংস্কৃতি গড়ে উঠছিল তার সমস্যা ও সঙ্কট এ-ভাবেই দুই মহাযুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে (১৯১৮-১৯৩৯) ক্রমেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে—যদিও তখনো বাঙলার এ-কালের কালচার তার সঙ্কট সত্বেও সাহিত্যে, শিল্পে, সংগীতে, জ্ঞান বিজ্ঞানে নতুন সৃষ্টির শক্তি খোয়ায়নি। সংস্কৃতি ক্ষেত্রের বাইরে জীবন ক্ষেত্রে কিন্তু তখন বাঙালী বনিয়াদে অনেক বেশি ফাটল ধরেছে। কিন্তু কি বাঙালী হিন্দু মধ্যবিত্ত, কি মুসলমান মধ্যবিত্ত কেউ সেই প্রথম মহাযুদ্ধ শেষের শিল্পোদ্যোগে তবু বিশেষ পা বাড়ালেন না, আঁকড়ে রইলেন সেই মধ্য-বিত্তের চিরকেলে বনিয়াদ।

বরং বাঙলা দেশের পুরনো ধরনের মারোয়াড়ী বণিক-ব্যবসায়ীরা এ সুযোগে ধনিক শিল্পপতি হয়ে উঠছে। প্রথম যুদ্ধ পর্যন্ত বিলাতী মালের আমদানী রপ্তানী ও শেয়ার মার্কেটের দালালি ছিল তাদের কাজ। সঙ্গে সঙ্গে তারা এখন হয়ে উঠছে ক্রমে বাঙলায় কল-কারখানার উদ্যোক্তা, মালিক আর পুঁজিপতি। বাঙালাদেশে গুজরাটী, সিন্ধী, ভাটিয়া, মেমন, খোজা বোহ্‌রা সকলে এসে নূতন কালের উপযোগী কল-কারখানা, ব্যবসা-পত্র প্রভৃতির

পত্তন করছে। আজ ইংরেজ কলওয়ালার উত্তরাধিকারও তারাই আয়ত্ত করবার স্বপ্ন দেখ্ছে। কিন্তু সারারণ ভাবে বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বা বাঙালী বিত্তবান্ শ্রেণী নিজেদের জীবন-যাত্রার জমিদারী চাল ও জমিদারতন্ত্রী দৃষ্টিভঙ্গি বদলে এই শিল্পোদ্যোগে তখনো যোগ দিতে পারল না। বাঙালীর ছোটখাটো ব্যাংক, ইনসিওরেন্স কোম্পানি প্রভৃতি দু'যুদ্ধের মধ্যকালীন সময়ে বাঙলায় গজিয়ে উঠেছে; এসূত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালীর কারো কারো উদ্যোগের পরীক্ষা হয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কয়লার খাদে, পাটের ব্যবসায়ে, এবং আরো অনেক স্থলেই এ-সময়ে বাঙালী স্থানচ্যুত হয়েছে—তাও স্মরণীয়। মোটের উপর এ-কথা প্রত্যক্ষ—প্রথম মহাযুদ্ধের পরে বাঙালী ভদ্রলোকের আর্থিক জীবন অচল হয়ে উঠ্তে থাক্লেও বাঙালী "ভদ্রলোক" তার আর্থিক জীবনকে নূতন করে সংগঠন করতে পারেনি। তার আর্থিক-সামাজিক জীবনে ফাটল ধরতে লাগ্ল। নতুন সৃষ্ট মুসলমান মধ্যবিত্তও সেই বনিয়াদেরই উপরে দাঁড়াতে গেল—পুরনোদের সঙ্গে সংখ্যার জোরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে; আর সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সূত্রেই খুঁজতে লাগল এই হিন্দু ভদ্রলোকের সংস্কৃতির মত কোনো মুসলিম কালচার ও বাঙালী মুসলিম কাল্চারের ভিত্তিভূমি, ঐতিহ্য ও প্রেরণা।

এদিকে ১৯২৯-৩০ থেকে এল ব্যবসায়ে সংকট। ফসলের দাম পড়ে গেল, দেনার দায়ে বাঙলার কৃষক জমি খোয়াতে লাগল,—বাঙালী সমাজের আসল মেরুদণ্ড নুয়ে পড়ল তখনি।

তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এল, এল তার ফাঁপানো টাকার জোয়ার। বাঙালার জীবন-যাত্রা পদ্ধতি ভেসে গেল। যা বাঁচল তাও গুঁড়িয়ে গেল মহাযুদ্ধের দান মন্বন্তর ও মহামারিতে। তখন দেখা গেল—কর্নওয়ালিসের তৈরী জমিদারী-তন্ত্র বাঙলা দেশের মূল জীবন-পদ্ধতিকেই কতটা অসার, কতটা জরা-জর্জর করে রেখেছিল যে, যুদ্ধ, মন্বন্তর, মহামারীর ধাক্কায় সেই ফাটল-ধরা সমাজ দেখতে না দেখতে চুর-চুর করে ফেটে পড়ল। কালান্তর একেবারে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠ্ল এবার তেরশ' পঞ্চাশের সঙ্গে সঙ্গে। (দ্রষ্টব্য: 'বাঙালীত্বের ভাঙা বনিয়াদ')

দ্বিধা-বিভক্ত মধ্যবিত্ত

চিরকালের বাঙালী ভদ্রলোকদের জীবন-যাত্রার বর্তমান রূপও আজ তাই পরিবর্তিত হচ্ছে। সেই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের শ্রেণী একেবারে বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে। দু এক জনা মাত্র যুদ্ধের সুযোগে হঠাৎ ফেঁপে উঠে উচ্চ মধ্যবিত্তের বা বিত্তবানের স্তরে উঠে গিয়েছেন, তাঁরা হয়ত ছোটখাটো ব্যাংক, ইনসিওরেন্স বা অন্য ব্যবসায়ের মালিক। কিন্তু অধিকাংশ বাঙালী ভদ্রলোক আজ গিয়ে ঠেকেছেন নিম্ন-মধ্যবিত্তের শেষ পৈঠায়। জমির এই উপস্বত্বভোগী পরিবার বাঙলায় মোট ৬ লক্ষের মত। এদের মধ্যে ৫ লক্ষ 'ভদ্রলোক' পরিবারের আসলে জমির থেকে **মাসে পরিবার পিছু গড়ে আয় মাত্র ১২৷৷০ টাকা।** কাজেই জমির উপর আজ বাঙলার ১৫ আনি ভদ্রলোক পরিবারই নির্ভর করেন না; তাঁরা নির্ভর করেন চাকরি-বাকরি, পেশা, ছোটখাটো ব্যবসা-পত্রের উপরে;—এ তথ্যটা যদিও ভদ্রলোকেরা জানেন না। আজ তাঁরা স্ত্রী-পুরুষে রোজগার করেন, তবু অন্নের সংস্থান করতে পারছেন না। আসলে আজ তাঁরা নেমে এসেছেন শ্রমজীবীর স্তরে, বেতন-দাসের বা ওয়েজ-স্লেভের পর্যায়ে। তবু 'ভদ্রলোকি মেজাজ' এখনো তাঁরা অধিকাংশেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি। মুসলমান নতুন মধ্যবিত্ত বাঙালীও এখন পর্যন্ত স্বপ্ন দেখেন লীগ্-মন্ত্রিত্বের প্রসাদের; সরকারী চাকরি থেকে সাপ্লাইর কন্ট্রাক্ট, এখনো তাঁদের সকলেরই আশা। পুরনো মধ্যবিত্ত হিন্দুরাও অনেকেই পুরনো দেমাকে এখনো তাদের নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী এই মুসলমান ও নিম্ন বর্ণের প্রতি বিরূপ। কিন্তু রেলের, ডাকের ও তারের, ব্যাংকের ও ট্রামের হাজার হাজার হিন্দু মুসলমান 'ভদ্রলোক' কর্মচারী আজ ছত্রিশ জাতের মুটে-মজুরের, মেয়ে-পুরুষের সঙ্গে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে নিজেদের মজুরীর লড়াই চালান। তাই একেবারে বলা চলে না যে, বাঙালী 'ভদ্রলোক' এখনো সম্পূর্ণ মোহগ্রস্ত রয়েছেন।

অবশ্য এটাও ঠিক, তাঁদেরই মুখপাত্র যারা বরাবর—বাঙালী নেতারা, বাঙালী কংগ্রেসের কর্তৃপক্ষ ও লীগের কর্তৃপক্ষ, আর বাঙালী সংবাদপত্রের মালিক ও পরিচালকবর্গ,—তাঁদের ঘোষণায় ও প্রচেষ্টায় বাঙালী ভদ্রলোকের এই আর্থিক-মানসিক বিপর্যয়ের সন্ধান পাওয়া যাবে না। সে দিক থেকে 'আজাদ' 'আনন্দবাজার' একই যোগে ক্লাইভ স্ট্রীটের সঙ্গে সম্মিলিত ফ্রন্ট তৈরী করে হরতালের বিরোধিতা করে। এ্যাসেম্ব্লিতে একই যোগে হিন্দু-মুসলমান বিত্তবান্‌রা

দাঁড়ায় শাদা মুখের পার্শ্বে জমির উপর কায়েমি স্বার্থ বজায় রাখবার জন্য। আর একই যোগে তারা পাস করে দিল্লীতে শ্রমিক-বিরোধী আইন। অর্থাৎ বাঙালী মধ্যবিত্ত ও তাদের নেতাদের মধ্যকার পার্থক্য আজ মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছে—সে দূরত্ব আজ পরিণত হয়েছে শ্রেণীগত বৈষম্যে স্বার্থের পার্থক্যে। ভদ্র শ্রেণীর অধিকাংশ আজ বেতন-দাস, আর নেতৃশ্রেণীর অধিকাংশ আজ মালিক বা কায়েমি স্বার্থের পক্ষে। ভদ্রলোকের অধিকাংশের পক্ষে বিপ্লব আজ প্রয়োজন আর তাঁদের নেতাদের অধিকাংশের পক্ষে বিপ্লব আজ বিভীষিকা। 'ভদ্রলোক' এই পুরনো নামটির মোহ বিস্তার করে কায়েমি স্বার্থের হিন্দু মুসলমান পাণ্ডা ও পণ্ডিতেরা এখনো অবশ্য ভদ্রশ্রেণীর নাম ভাঙিয়ে খায়, আর ভদ্রলোকের ঐতিহ্য, ভদ্রলোকের সংস্কৃতির দোহাই পেড়ে এখনো তারা সহজেই ভদ্রশ্রেণীর মন ভাঙিয়ে নেয়। কিন্তু নিম্ন-মধ্যবিত্ত শ্রমজীবীর এরূপ দুর্দশা সকল দেশেই কম-বেশি দেখা যায়। কালান্তরের মুখেও তাঁরা নিজেদের রূপ ভুলে থাকতে চান। এই দুর্দশার কারণ তাই তাঁদের দুর্বুদ্ধি—বাস্তব দৃষ্টির অভাব ও অভাব সুস্থ চেতনার। জীবনের ক্ষেত্রে যেখানে বাঙালী ভদ্রলোক এসে পৌঁছেচে সেখানে আজ তার সতীর্থ আর ভদ্রতা-বিলাসীরা নয়, তার স্বার্থ আজ দেশের শোষিত জনতার সঙ্গে। আশা আকাঙ্ক্ষায় তাঁরাই তার সগোত্র; সৃষ্টিতে কল্পনায়ও তাঁদেরই সঙ্গে তার আত্মীয়তা; সৃষ্টির অধিকার ও দায়িত্ব আজ তাঁদেরই সঙ্গে তার সমভাবে প্রাপ্য।

সংস্কৃতির সংকট

কালান্তর যখন এই পথে ঘটছে তখন তার আঘাতে বাঙলার সংস্কৃতিরও এরূপ রূপান্তর অনিবার্য। কিন্তু পরিবর্তন সকল ক্ষেত্রে সমান তালে ও একই কালে ঘটে, এমন নয়। আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ও সাংস্কৃতিক সৃষ্টিক্ষেত্রে একটু ব্যবধান আছে। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে সমাজে নতুন শক্তি জন্মে; কিন্তু তখনো চোখে পড়ে না। সমাজ-জীবনের সেই সুপ্ত শক্তি অনেক সময়েই প্রথম পড়ে সৃষ্টি-প্রতিভার চক্ষে। সংস্কৃতি-ক্ষেত্রেই হয়ত তার আগমনী রচনা হয় নানা শিল্প-কলায় ও চিন্তা-ভাবনায়। যেমন, ফরাসী বিপ্লবের আগমনী রচনা হয়েছিল রুশো, ভল্‌তেয়ার ও এন্‌সাইক্লোপিডিস্টদের চেষ্টায়। আর, তাতে করেই

সামাজিক জীবনের শক্তি সমাজ-ক্ষেত্রে আরও সচেতন হয়ে ওঠে,—যেমন হয়েছিল ফরাসী বিপ্লবের কালে। সেই সামাজিক চেতনা তখন আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে। তার ছাপ আবার পড়ে তাই সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও। কিন্তু সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে তার সুপ্রতিষ্ঠা একটু সময় সাপেক্ষ; আর্থিক বা রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রের মত নূতন শক্তি ওখানে সরাসরি আপনাকে স্থাপিত করতে পারে না। তাই, রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক জীবনে যখন হয়ত কালান্তর সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে তখনো দেখতে পাওয়া যায় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি—সেখানে তার রূপ পরিস্ফুট হচ্ছে না, সৃষ্টিশক্তির যারা নূতন বাহক তারা হয়ত তখনো সৃষ্টির রূপায়ণ ও কলা-কৌশল আয়ত্ত করতে পারেনি, উদ্ভাবনা করবার মত অবকাশ ও শিক্ষাও লাভ করেনি। উপযুক্ত প্রযাস, উপযুক্ত পরিকল্পনা, উপযুক্ত সংগঠন না লাভ করতে সেখানে তাঁদের দান অস্পষ্ট হয়, সে-সব প্রয়াস অনেকাংশে থাকে পরীক্ষামূলক। বরং দেখা যায় আগের যুগের জের টেনে হয়ত কোনো কোনো সুনিপুণ রূপকার সেখানে তখনো বেশি কৃতিত্ব দেখাতে পারেন—এবং এ-ভাবে কালান্তরকে করতে পারেন অস্বীকার। বাঙলারও তেমন কলা-কুশল লেখকের অভাব নেই। কায়েমি স্বার্থও এই কায়েমি রূপকলাকেই মুদ্রা-প্রসাদে পরিপুষ্ট ও পরিতুষ্ট করবেন, তাতে সন্দেহ নেই। আর সেই 'সনাতনী' রূপ স্রষ্টারাও—হয়ত আন্তরিক বিশ্বাস নিয়েই—নাম করবেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের; বল্‌বেন, তাঁদেরই পদাঙ্কের অনুবর্তী তাঁরা।

এঁদের কথা হয়ত আক্ষরিকভাবে সত্য; কিন্তু কালান্তর তাঁদের থেকেও স্বীকৃতি আদায় করবে নানা পথে। বাঙলা সংস্কৃতির চলতি ধারায় (দ্রষ্টব্য: 'বাঙালী সংস্কৃতির চলতি হিসাব') এই স্বীকৃতিও দেখা যায়—কেউ তা দিচ্ছেন জেনে, কেউ তা দিচ্ছেন না জেনে, কেউ দিচ্ছেন ইচ্ছায়, কেউ দিচ্ছেন—বা দিচ্ছেন না—অনিচ্ছায়। অধিকাংশ স্রষ্টাই সাধারণত ঘোরপাক খান মধ্যখানে—কেউ কখনো এগোন, কখনো পিছোন; বর্তমানের বিপর্যয়ে কখনো বিচলিত, কখনো বিরক্তি; কখনো অর্ধচেতন ভাবেই ঘোষণা করেন বিদ্রোহ, কখনো আবার অর্ধচেতন ভাবেই খোঁজেন কোনো আর্টের বা দর্শনের আশ্রয়-কেন্দ্র। বিশেষ করে পরাধীন জীবনের পরিবেশে এই দৃষ্টিবিভ্রম খুবই স্বাভাবিক (দ্রষ্টব্য: 'পরাধীনের দৃষ্টিবিভ্রম')। কারণ সাম্রাজ্যবাদের আওতায় আমরা পেয়েছি বড় জোর কেরানীগিরি। কাল্‌চারের বা জ্ঞান-

বিজ্ঞানের কর্মশালায় আমরা কর্মচারী—আমরা সেখানেও মালিক তো নই-ই, বড় সাহেবও হতে পাই না, হতে পাই বড় জোর "বড় বাবু"। সাম্রাজ্যবাদের আমলে সাধারণভাবে আমাদের পণ্ডিত ও স্রষ্টাদেরও এটাই বিধিলিপি। তবু তাঁরা কেউ কেউ দেন শিক্ষা, কেউ দেন আনন্দ। একমাত্র মহৎ স্রষ্টা যিনি তাঁরই চেতনায় প্রতিফলিত হয়ে ওঠে যুগের অন্তর্নিহিত সত্য, আর মহৎ যে সৃষ্টি তাতেই রূপ গ্রহণ করে সেই যুগের বাণী, তাতেই জনসমাজ পড়ে নিজের স্বাক্ষর, দেখে নিজের ভবিষ্যৎ। কিন্তু এরূপ মহৎ সৃষ্টি স্বভাবতই সহজ লভ্য নয়। আসলে মহৎ স্রষ্টাও সহজে জন্মে না। তবু 'মহৎ' না হোন, সচেতন স্রষ্টা যিনি, তিনিও স্পষ্ট করে হন তাঁর যুগের সাক্ষী। আর যতখানি তিনি সচেতন ততখানিই সত্যের স্বাক্ষর বহন করে তাঁর সৃষ্টি। এ সত্যই হল সৃষ্টির নিরিখ।

সংস্কৃতির সংগঠন

শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের সচেতনতা—এ হল তাই সংস্কৃতির দাবি। এ সচেতনতা অবশ্য জীবন-ক্ষেত্রের সাক্ষ্য থেকেই তাঁদের পক্ষে লাভ হতে পারে। কিন্তু জীবন ক্ষেত্রের সে সাক্ষ্য তাঁদের নিকটে তুলে ধরার দায়িত্ব হল সংস্কৃতির কর্মীদের। আর সংস্কৃতির কর্মী শুধু ছাত্র বা শিক্ষক নন, সে-কর্মী দেশের সকল মানুষ, বিশেষ করে আবার সেই মানুষ যারা জানে সংস্কৃতির অর্থ কি, যারা বোঝে সংস্কৃতি শুধু মাত্র সমাজের রূপ-কর্ম নয়;—তা সমাজকে রূপান্তরিত করে; শুধু মাত্র তা সমাজের সৃষ্টির পরিচয় নয়, তা নবতর সৃষ্টির প্রেরণাও।

এ সত্য মনে রাখার সঙ্গে সঙ্গেই আমরা স্বীকার করি, সংস্কৃতিরও সংগঠন দরকার—যেমন সংগঠন দরকার সমাজের। সমাজ যে নিয়মহীন নিয়মে চলে না, তার যে পরিকল্পনা ও পরিচালনা সম্ভব, এ কথা আজ সকলেই বোঝেন। তাই সংস্কৃতির সংগঠনও যে সম্ভব আর প্রয়োজন, এ কথাও আজ বুঝতে অনেকের দেরী হয় না। বলা বাহুল্য, এ সংগঠনও স্থির করতে হয় বর্তমানের অবস্থা বুঝে ও স্ফুটনোন্মুখ সত্যকে স্মরণে রেখে। এজন্য একদিকে তাই হিসাব করে দেখতে হয় —পূর্বতন সমাজের বনিয়াদ ও আর্থিক-সামাজিক অবস্থা, পূর্বতন সেই জীবনযাত্রা ও তার বাস্তব-মানসিক রীতি আচার ও অনুষ্ঠানসমূহ, পূর্বতন আবিষ্কার ও শিল্পকলার নানা সৃষ্টিধারা। আর দিকে লক্ষ্য করতে হয় আর্থিক-সামাজিক নূতন সঙ্কটের ও

সংগ্রামের সাক্ষ্য, লক্ষ্য করতে হয় নূতন বাস্তব ও সামাজিক শক্তির জন্ম, নূতন বৈজ্ঞানিক ও শিল্প-সৃষ্টির তাড়না ও সম্ভাবনা। আর শেষে নূতন সংগঠনে গতিপথ রচনা করতে হয় নূতন সংস্কৃতির ও নূতন সমাজের (দ্রষ্টব্য ঃ 'বাঙালী সংস্কৃতির সংগঠন')।

এই হল একালের সমাজ-কর্মীর ও সংস্কৃতি-কর্মীর দায়িত্ব—অতীতকে রূপান্তরিত করা ভবিষ্যতে, ঐতিহ্যকে বিবর্তিত করা ইতিহাসে (দ্রষ্টব্য ঃ 'কালচার ও কমিউনিস্ট-এর দায়িত্ব')।

যুদ্ধ মন্বন্তর, মহামারীর মধ্য দিয়ে যে বাঙালী জীবনের বিপর্যয় ঘটতে থাকে আজ যুদ্ধান্তের গণ-অভ্যুত্থানে, স্বাধীনতার সংগ্রামে, জমির দাবিতে, মজুরীর লড়াইতে সেই বিপর্যস্ত বাঙালী জীবন ভারতবর্ষের বৃহত্তর জনযাত্রার সঙ্গে পা ফেলে চলেছে, অগ্রসর হচ্ছে বিপ্লবের দিকে। বিপর্যয় থেকে বিপ্লবের পথে এই যাত্রায় বাঙালী জীবন ও বাঙালী সংস্কৃতির স্বরূপ সন্ধান ও তার নূতন সংগঠনের কথাও তাই আলোচ্য হয়ে ওঠে তাঁদের পক্ষে যাঁরা জানেন বিপ্লব স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন নয়, যাঁরা মানেন সংস্কৃতি শুধু ভাব-বিলাস নয়, তা এক সক্রিয় শক্তি। সেই চেতনা ও উপলব্ধি থেকে বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, তার দুর্বল বনিয়াদ, তার স্বরূপ, তার সমস্যা, আভ্যন্তরীণ বিরোধ, দৃষ্টি-স্বল্পতা, সমাগত সংকট আর তার চল্‌তি রূপ ও ভারতবর্ষের বৃহত্তর জীবন-যাত্রায় তার ভবিষ্যৎ যোগাযোগ—আর সর্বোপরি তার সম্ভাব্য সংগঠন ও সে সংগঠনের দায়িত্ব সম্বন্ধে—এই কালান্তরের মুখে যা আমরা সংস্কৃতিকর্মীরা তেরশ' পঞ্চাশের সময় থেকে আলোচনা করেছি—তা'ই এ. গ্রন্থে সন্নিবেশিত হল। সে আলোচনা কখনো হয়েছে মুখে কখনো কোনো উপলক্ষে—পরে তা সংক্ষেপে অনুলিখিত হয়। তাই, অনেকখানে দ্বিরুক্তি ঘটেছে, অনেকখানে সেইরূপ বক্তব্য বিশদও করা হয়নি। বিবিধ সাময়িক পত্রে প্রকাশিত প্রবন্ধ হলেও এদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রয়েছে—কালান্তরের বাঙালী কালচারের কথাই ছিল সাধারণভাবে এ প্রবন্ধ সমূহের আলোচ্য।

২৭-২-৪৭

সংস্কৃতির স্বরূপ

মানুষের সৃষ্টিশক্তির মোট পরিচয় তার সংস্কৃতিতে। এই সৃষ্টিশক্তির জন্যই মানুষ মানুষ, অন্য জীবের থেকে স্বতন্ত্র। অন্য জীব প্রকৃতির বশ, কিন্তু মানুষ প্রকৃতিকেও বশ করে। কারণ, মানুষ গড়তে পারে, সৃষ্টি করতে পারে। যে 'কৃতি' বা সৃষ্টির সহায়ে মানুষ—মানুষ, প্রকিতির সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী—তাই সংস্কৃতি।

সংস্কৃতি বলতে তাই বোঝায়—সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান (sciences) ও সমস্ত সৃষ্টিসম্পদ (arts); অর্থাৎ যা আমরা জেনেছি (প্রকৃতির নিয়ম-নীতি প্রভৃতি), যা আমরা করেছি (যন্ত্র-শিল্প, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান; মানসিক প্রয়াস, চিন্তা-ভাবনা, নৃত্য, গীত, চিত্র, কাব্য প্রভৃতি)। আর্ট বা শিল্প এই সংস্কৃতিরই একটি এলেকা; আর শিল্প বল্‌তে বোঝায় বাস্তব সৃষ্টি আর মানস-সৃষ্টি দুইই, কারণ দুইই সৃষ্টি; কারুকলা (crafts) ও চারুকলা (arts) দুইই তাই সংস্কৃতির পরিচয় দেয়।

নূতন সংস্কৃতির মানে কি ?

সংস্কৃতির গোড়ার কথা হল সৃষ্টি, নূতন প্রকাশ, নূতন প্রয়াস। আর সংস্কৃতির মূল লক্ষ্য হল—প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামে মানুষকে জয়ী করা, অগ্রসর করে দেওয়া, শক্তিশালী করে তোলা। আব মানস-সৃষ্টিরও সার্থকতা তাই বাস্তব সৃষ্টিতে, বাস্তব সৃষ্টিরও প্রয়োজন তাই মানস-সৃষ্টির সহায়তা

করা। বাস্তবক্ষেত্রে যারা সৃষ্টিশীল তাদের পক্ষে দরকার তাই মানসিক ক্ষেত্র থেকে নিজেদের সৃষ্টিশক্তিকে সঞ্জীবিত করে নেওয়া, সেখান থেকেও নিজেদের পুষ্টি সংগ্রহ করা; আর মানসক্ষেত্রে যারা সৃষ্টিশীল তাদেরও পক্ষে দরকার বাস্তব ক্ষেত্র থেকে নিজেদের সৃষ্টিপ্রেরণাকে সবল করে নেওয়া নিজেদের সৃষ্টিশক্তিকে দৃঢ়মূল করা। বাস্তব ক্ষেত্রে সৃষ্টিশীল আজ শ্রমিক ও কৃষক। তাই তাদের থেকে চাই চারুকলার সহায়তা। বা চারুকলার স্রষ্টাদের (শিল্পী, সাহিত্যিক, নৃত্যশিল্পী গায়ক প্রভৃতির) নিজেদেরই দায়ে চাই এই শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে নিবিড়তর যোগাযোগ। তাতেই নূতন সংস্কৃতি গঠিত হয়ে উঠবে। নূতন সংস্কৃতির মানে তাই সমাজের সৃষ্টিশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা—একালে তার মানে শ্রমিক কৃষকের বাস্তব স্বরাজ প্রতিষ্ঠা, আর প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতির স্বরাজ।

সংস্কৃতির স্বরাজ

সমাজের সৃষ্টিশক্তির অকুণ্ঠিত প্রকাশেই সংস্কৃতির স্বরাজ সম্ভব হয়। সমাজে বরাবরই অবশ্য যখন যে-শ্রেণী সৃষ্টিশীল চারুকলা তাদেরই জোগায় প্রেরণা, শক্তি; তাদের জয়কে নিশ্চিত করে তোলে, তাতেই তার সার্থকতা। কিন্তু সমাজে সৃষ্টিশক্তি এতকাল অকুণ্ঠিত প্রকাশ লাভ করতে পারেনি। কারণ, সমাজে শ্রেণীভেদ আছে, শাসক ও শাসিত আছে, শোষক ও শোষিত আছে। শাসক ও শোষকেরা চায় সমাজে নিজেদের শাসন ও শোষণ কায়েম রাখতে। সৃষ্টিশক্তি পরিবর্তন আনে—পরিবর্তনে শাসকদের স্থান বদলে যেতে চায়। তাই সৃষ্টির দাবী শাসকেরা মান্‌তে চায় না; মানলে তাদের পক্ষে শাসনক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়, তাদের শোষণ অব্যাহত থাকে না। তাই, তারা নূতন সৃষ্টিধর্মী শ্রেণীকেও চায় চেপে রাখতে; আর চায় সৃষ্টিধর্মী শিল্পীদেরও নিজেদের আজ্ঞাধীন রাখ্‌তে। সংস্কৃতিকে তারা সৃষ্টিধর্মী হতে দিতে চায় না, শাসক শ্রেণীর অনুগামী করে রাখতে চায়। তার মানে, শাসকেরা বিজ্ঞান, কারুকলা ও চারুকলা, সব কিছুকে শোষণ করে—শাসক আওতায় সংস্কৃতি আর বিকাশ লাভ করতে পারে না; মানে, সংস্কৃতি স্বরাজ লাভ করে না।

শোষণ-ধর্ম্মী সমাজে এই নিয়ম,—সংস্কৃতিও সেরূপ সমাজে একদিকে

শোষণের বস্তু হয়, অন্যদিকে আবার হয় শোষণের এক হাতিয়ার। ইতিহাসে তার প্রমাণ রয়েছে। কবি, শিল্পী, নট প্রভৃতি ছিলেন রাজার প্রসাদ-জীবী। তাদের দেখি কখনো পরিষদ, কখনো সামন্ত-মুরুব্বির (patron) মোসাহেব। তারপর, ধনিকতন্ত্রের (গণতন্ত্রের) যুগে তারা হয়েছেন ক্রেতার বা বাজারের (market) মুখাপেক্ষী। অবশ্য ধনিকতন্ত্র শিল্পীদের মুক্তি দিয়েছে মুরুব্বির খোশামুদী থেকে। তবু শিল্পীদের এখনো ধনিকরাই অনেকাংশে পোষণ করে। তারাই শোষণও করে,—শোষণ করে কঞ্চনমূল্যে ধনিকদের রুচিমত স্বার্থমত রসরচনার জন্য, ধনিকতন্ত্রের জয়গান গাইবার জন্য। সে শোষণ কখনো হয় একটু স্থূল, প্রত্যক্ষ, উগ্র ও ইতরতাপূর্ণ (যেমন ফাসিস্ট দেশে দেখি); কখনো হয় একটু সূক্ষ্ম, পরোক্ষ, মোলায়েম ও ভদ্র (যেমন তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশে চলে)। কিন্তু তার উদ্দেশ্য একই—সংস্কৃতিকে শোষণের সহায়ক করা—সৃষ্টিধর্ম ও সৃষ্টিকর্ম থেকে সংস্কৃতিকে বিচ্যুত করা।

"সংস্কৃতির স্বরাজ" সম্ভব তাই একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজে। যেখানে শোষণ নেই—সংস্কৃতিরও শোষণের বা প্রতারিত হবার কারণ নেই। তাই শ্রেণীহীন সমাজের কর্মীরা, বিপ্লবীরাই চায় শিল্পীর ও বৈজ্ঞানিকদের পূর্ণ স্বাধীনতা।

শ্রমিক ও কৃষকের আসল স্বার্থ তাই সংস্কৃতিকে শোষণ করা নয় ;—শোষণ ধনিকের নীতি। শ্রমিক ও কৃষকের স্বার্থ হল শিল্পী ও বৈজ্ঞানিককে সৃষ্টির অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া। কারণ সমাজে আজ সৃষ্টিধর্মী কে ? বাস্তব কর্মক্ষেত্রে শ্রমিক ও কৃষক ; মানসিক ক্ষেত্রে শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি। সৃষ্টির নিয়মেই শিল্পী ও বৈজ্ঞানিক তাই শ্রমিক-কৃষকের সৃষ্টিশক্তিকে উজ্জীবিত করবেন, শিল্পী ও সাহিত্যিক নিজেদের সৃষ্টির তাগিদেই হবেন শ্রমিক ও কৃষকের সহযোগী, সহযাত্রী, সহস্রষ্টা। এভাবেই নতুন সংস্কৃতি গড়ে উঠ্‌বে।

সংস্কৃতির বিকৃতি

কিন্তু সমাজে যতক্ষণ পর্যন্ত ধনিক শ্রেণী পরাজিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত ধনিকেরা নানাভাবে চাইবে সংস্কৃতি-স্রষ্টাদের নিজের মুনাফা গড়ার কাজে লাগাতে এবং নিজের দলে টানতে। টাকাকড়ি, সুখস্বস্তি, মানমর্যাদা, ভয়-ভীতি এ-সবই হল সংস্কৃতিকে বিপথ চালিত করবার জন্য ধনিকতন্ত্রের নানা উপায়। তাতে সংস্কৃতি বিকৃত হয়—তা বিকাশ লাভ করে না, নানাভাবে তার বিনাশ হয়। মানে, ব্যবসাদারের হাতে পড়ে (commercialised হয়ে), শিল্পের দু'রকম বিকৃতি হয়—vulgarisation of art ও perversion of art।

শ্রমিক-কৃষকের হাতেও এখন পর্যন্ত সুবিধা নেই। তার দাবীও আরো বড় দাবী—তা সৃষ্টির দাবী। কিন্তু সঙ্কটের তাগিদে শ্রমিক-কৃষক অনেক সময় ঠিক তার এই মুখ্য সত্যটি শিল্পীদের নিকটেও পরিষ্কার করে তুলতে পারে না। সাময়িক প্রয়োজনে তারাও দাবী করে বসেন—সাময়িক কথাটাই শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা প্রচার করবেন। কাজের প্রোগ্রামই শিল্পের প্রতিপাদ্য হবে; তার মানে এভাবে শ্রমিক-কৃষকও সৃষ্টির দাবীর বদলে করে বসেন প্রচারের দাবী—ধনিকদের দেখাদেখি তাঁরাও চান শিল্পকে নিজেদের কাজে খাটাতে, বিকৃত করে তুলতে। শিল্পকে প্রচারকাজে এভাবে সরাসরি ব্যবহার করাটা ধনিকতন্ত্রেরই একটা ছোঁয়াচে রোগ; কিন্তু তা শ্রমিক-কৃষককেও আক্রমণ করে।

প্রচার ও প্রকাশ

শ্রমিক-কৃষক এ ভুল করেন, কারণ ধনিকতন্ত্রের আওতায় তাঁরা বিজ্ঞান, শিল্প ও সাহিত্যের মূল কথাটি পরিষ্কার করে ধরতে পারেন না। বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য পার্টি-প্রোগ্রাম রচনা নয়—সমাজ-নিয়মকে জানা, আর সেই জ্ঞানের দ্বারা প্রোগ্রাম যাচাই করা, বুদ্ধিকে মার্জিত করা, সমাজের বৈজ্ঞানিক বিন্যাসের পথ নির্দেশ করা। চারুশিল্পের কাজও পার্টি-প্রোগ্রাম রচনা নয়—প্রেরণা জোগানো, কর্মীদের প্রাণশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করা, আবেগকে দৃঢ়তর করা, চেতনাকে

গভীরতর করা; মার্জিত বুদ্ধির সঙ্গে যুক্ত করা প্রাণের শক্তি। অবশ্য শিল্পকলাও বুদ্ধিকে একেবারে অস্বীকার করে না, বুদ্ধিবৃত্তিকে সাধারণভাবে মেনে নিয়েই শিল্প শক্তিশালী হয়। বুদ্ধিবৃত্তিও আবার তেমনি শিল্পের দান গ্রহণ করেই কর্মশক্তিতে রূপলাভ করে। দুই-ই পরস্পরকে পুষ্ট করে, তবু শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল সৃষ্টি এবং মানুষের অন্তরাবেগকে সৃষ্টিমুখী করে তোলা—প্রোগ্রাম রচনা নয়, পার্টি লাইনের প্রচার নয়।

একদিক থেকে দেখলে সব শিল্পই কিছু না কিছু প্রচার করে; কারণ, তা কিছু না কিছু বলে। কিন্তু শিল্পের মুখ্য উদ্দেশ্য হল প্রকাশ,—প্রচার নয়; আর প্রেরণা জোগানো,—কোনো সূত্র প্রমাণ করা নয়। শিল্পকে প্রত্যক্ষভাবে প্রচারের কাজে লাগালে শুধু শিল্পকে শোষণ করা হয় না, শিল্পের মূল উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়—মানে, শ্রমিক-কৃষক প্রভৃতি সৃষ্টিধর্মী কর্মীরা নিজেদের অন্তরাবেগের শক্তিকে তা হলে ঠিকভাবে উদ্বুদ্ধ ও সংহত করতে পারে না। তার ফলে তাদের সৃষ্টিশক্তি দুর্বল থেকে যায়। যেখানে শিল্প অন্তর স্পর্শ করে না, সেখানে শিল্প রসোত্তীর্ণ হয় না। তাই শিল্প সেখানে ব্যর্থ।

শ্রমিক বিপ্লবের যুগে শ্রমিক-কৃষকের চোখে শিল্পের উদ্দেশ্য হবে তাই প্রোগ্রাম প্রচার নয়, পার্টির লাইন বাৎলানো নয়—সমসাময়িক জীবনসত্যকে প্রকাশ করা, সংঘাতের রূপ চিত্রিত করা। অর্থাৎ শ্রমিক-কৃষক বলবে—"শিল্প সত্যকারের সৃষ্টি হোক এবং সৃষ্টির দাবিকেই সমাজে প্রতিষ্ঠিত করুক।"

১৭-১-৫২

বাঙালী সংস্কৃতির রূপ-রেখা

'বাঙালী সংস্কৃতি' কথাটিকে আমরা সাধারণত 'বাঙ্লার কাল্চার' কথাটির প্রতিশব্দ রূপেই প্রয়োগ করে থাকি। সে হিসাবে 'বাঙালী সংস্কৃতি' বললে বোঝাতে চাই—আধুনিক বাঙালী সংস্কৃতি বা ইংরাজ আমলের 'বাঙ্লার কাল্চার।' নইলে বাঙালী সংস্কৃতি বল্লে বোঝানো উচিত যে-দিন থেকে বাঙালী জাতি জন্মেছে সেদিন থেকে আজ এই প্রায় হাজার খানেক বছরের বাঙালী সংস্কৃতিকে,—বাঙালী সমাজের হাজার বছরের রূপ ও তার বাস্তব ও মানসিক সমস্ত সৃষ্টিকে।

নানা দিক থেকেই সে বাঙালী সংস্কৃতিরও বিচার বিশ্লেষণ চলে; অনেকেই তা করেনও। কেউ প্রধানত বৈজ্ঞানিক নৃ-তত্ত্বের দিক থেকে তা বিশ্লেষণ করেন, কেউ জাতি-তত্ত্বের দিক থেকে তার বর্ণনা করেন; আর কেউ অধ্যাত্ম সম্পদের নানা দিক থেকে তার মূল্য বিচার করেন। তাঁদের অনেকের নিকটেই বাঙালীত্ব একটা সুস্থির ও অপরিবর্তনীয় ধর্ম; তার গতি থাকতে পারে, কিন্তু তার পরিবর্তন নেই। তাঁদের মতে, বাঙালীত্বের স্বরূপ হল এই যে, তার রূপ আছে, সে রূপের স্ফুরণও নানাভাবে হয় নানা কালে; কিন্তু সে রূপ চিরন্তন, তার রূপান্তর নেই। বলা বাহুল্য, প্রত্যেক জাতিরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য কিছু না কিছু থাকে, এ-কথা সত্য। বাঙালীরও বৈশিষ্ট্য আছে। কিন্তু তাই বলে কোনো জাতির একটা রূপই শাশ্বত, 'রক্তের দোহাই' দিয়ে এ-কথা মহানেতারা ঘোষণা করলেও বিজ্ঞান তা মানবে না। আর, ভৌগোলিক পরিবেশ ও জাতীয় ঐতিহ্যের নামে এ-কথা দাবী

* ১৯৪৪-এর ৯ই নভেম্বর প্রগতি লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘের সংস্কৃতি কর্মীদের নিকট কথিত "বাঙালীর ঐতিহ্য" নামক বক্তৃতার নোট অবলম্বনে লিখিত।

করলেও ইতিহাস তা স্বীকার করবে না। ঐতিহ্যকে ইতিহাস অগ্রাহ্য করে না ;—বরং করে পূর্ণতর। কারণ, ঐতিহ্য হচ্ছে পরিচিত খাতে প্রবহমান স্রোত। আর ইতিহাস উজান-বাহী নদী,—যে নদীতে ঢল নামে, যাতে সাত-সাগরের আহ্বান নিয়ে আসে জোয়ারের জল, যা মহাসমুদ্রের দিকে ভেসে চলে আবার ভাটার টানে ;—যে নদী পাড় ভাঙ্গে, দুকূল ভাসিয়ে দেয়, ধুয়ে মুছে ফেলে তীরের ক্ষেত আর গ্রাম আর অভ্যস্ত জীবন-যাত্রা ;—যে নদী খাত বদ্‌লায়, পথ করে ছোটে নতুন নতুন খাতে ; হয়ত পথ হারায় এখানে-ওখানে শুষ্ক পৃথিবীর বালুকার শয্যায়, আর হয়ত নতুন গৌরবে পথ কেটে নেয় নতুন জনগণের বুক চিরে।

একথা যে মিথ্যা নয় তারই প্রমাণ আমাদের এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতি— বাঙলার কাল্‌চার। সে-ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করে না, অতীতকে সে-ও বর্তমানের মধ্যে জীইয়ে বহন করছে। কিন্তু তবু কথা এই—সে নতুন খাতের স্রোত, আর এ-খাত ইংরেজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে দুর্বার বলে উন্মুক্ত হয় বাঙালী জাতির সাম্‌নে। এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে তার পূর্ববর্তী যুগের বাঙালী সংস্কৃতির তফাৎ শুধু কালগত নয়, অনেকাংশে তা বস্তুগত আর গুণগত। এর বনিয়াদ, রূপ ও ধর্ম একেবারে আলাদা।

বাঙালী সংস্কৃতির এ-কালের রূপকে আমরা চিনি—তাই বলে তার স্বরূপ বুঝি, এ-কথা সর্বাংশে বল্‌তে পারি না। তবু সে স্বরূপ বুঝ্‌তে আমরা চেষ্টা করি (ডাক্তার ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, অধ্যাপক ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি মনীষীরা এ-দিকে আমাদের ভিন্ন ভিন্ন পথে সাহায্য দান করেন ; লেখকের 'সংস্কৃতির রূপান্তরের' 'বাঙলার কালচার' অধ্যায় দ্রষ্টব্য)—এ দাবী আমরা যারা সংস্কৃতি-কর্মী তাঁরা করতে পারি। এ-চেষ্টা এখনো শেষ হয়নি—হয়ত তার স্বরূপ-বিশ্লেষণও এখনো সর্বাংশে সম্পূর্ণ হয়নি। শুধু তার মোটামুটি রূপটি আমরা দেখ্‌তে পাচ্ছি, দেখতে পাচ্ছি তার বাস্তব পাদপীঠ, আর তার সত্যকার তাৎপর্য বা significance.

ভারতীয় সংস্কৃতি ও বাঙালীর সংস্কৃতি

এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতি যে পূর্ববর্তী যুগের বাঙ্‌লার সংস্কৃতির থেকে অনেকাংশে স্বতন্ত্র, এ-কথা এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম-কথা ও তার এই দেড়শ' বৎসরের মোট ইতিহাসের দিকে তাকালেও অনেকাংশে বোঝা যায় (দ্রষ্টব্য : "সংস্কৃতির রূপান্তর" ২য় সং)। আসলে তা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদের ছায়ায় উদ্ভূত 'পরাধীন জাতির সংস্কৃতির' কথা, "colonial culture"-এর এক বিশেষ পাতা। বাঙলা দেশেই ব্রিটিশ শাসকরা তাদের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করে (মাদ্রাজ তাদের কেন্দ্র হয়নি, বোম্বাইয়েও নয়)। তাই ভারতবর্ষের মধ্যে এখানেই সেই 'ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির' রূপ প্রথমত ও প্রধানত প্রকটিত হয়েছে। ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে এ-কারণে, এবং অন্যান্য স্থানীয় নানা কারণে, তাদের সংস্কৃতি একালে ততটা পরিস্ফুট হতে পারেনি—পারলে তাও এই "বাঙালী সংস্কৃতির" অনুরূপ সংস্কৃতিই হয়ে উঠ্‌ত; এখনো তা'ই হয়ে উঠ্‌ছে। এ-দিক থেকে দেখলে এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতিকে বল্‌তে পারি—"ঔপনিবেশিক" অবস্থার, সাম্রাজ্যবাদী আমলের, ভারতীয় সংস্কৃতিরই মুখ্য নিদর্শন।

এ কালের বাঙালী সংস্কৃতির প্রেরণা আমরা হিন্দী বা মারাঠী বা গুজরাঠীদের জীবন-যাত্রা বা সংস্কৃতি ধারা থেকে সংগ্রহ করি না, বরং সংগ্রহ করি প্রধানত ইংরেজি ও ইংরেজির মারফৎ পাওয়া পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রা ও সংস্কৃতি সংবাদ থেকে। কিন্তু তবু আমাদের বাস্তব জীবন-যাত্রার সঙ্গে ইংরেজ বা মার্কিন বা ঐরূপ জাতিদের জীবনযাত্রার পার্থক্য একেবারে মৌলিক,—তারা শ্রমশিল্পে সমুত্তীর্ণ (industrialised) সাম্রাজ্যাধিকারী (imperialist) জাতি, আর আমরা শ্রমশিল্পে প্রত্যাহত সাম্রাজ্য-শোষিত জাতি। আমরা ভারতবর্ষের সকল জাতিই বাস্তব জীবনযাত্রায় এই ঔপনিবেশিক জীবনের গণ্ডীতে আবদ্ধ—কেউ তার মধ্যে প্রথম সঞ্চরণের সুযোগ পেয়েছি, কেউ তা পাইনি,—তবু আসলে সকলেই প্রায় সমাবস্থ, মূলত এ-কালেও আমরা 'ঔপনিবেশিক অবস্থার' ভারতীয় সংস্কৃতির ছোট-বড় নিদর্শন। আর সাম্রাজ্যবাদের বিলোপের সঙ্গেই আসলে আমাদের বাঙালী, হিন্দী, মরাঠী, প্রভৃতি এ কালের এসব জাতীয় সংস্কৃতির সুস্থ ও স্বাধীন বিকাশ সম্ভব। তেমনি তার বিলোপেই আবার সম্ভব হবে ভারতীয় মহাজাতির সংস্কৃতির এক সামগ্রিক বিকাশ,—তার সুস্থ রূপান্তর। এমন কি, সে-দিন যদি বাঙ্‌লা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়

স্বতন্ত্রও হয়ে থাক্‌তে চায় তা হলেও তার বাস্তব ও মানসিক সৃষ্টির টান—তার সাংস্কৃতিক যোগাযোগ তাকে বারেবারেই অন্তর্ভুক্ত করবে সেই ভারতীয় জগতের মধ্যে—অসমিয়া, ওড়িয়া, হিন্দুস্তানীর সঙ্গে সংস্কৃতির সূত্রে একত্র করে।

কিন্তু এই কথাটিও স্মরণীয়—বরাবরই বাঙালী সংস্কৃতি আসলে ভারতীয় সংস্কৃতিরই একটি বিশেষ ধারা। তার অনেক বৈশিষ্ট্য ছিল, এখনো আছে; তার নিজস্ব রূপ ছিল, এখনো আছে। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতির থেকে তাই বলে বিভিন্ন করে তাকে দেখা চলে না। বাঙালী জাতিকে যেমন ভারতীয় মহাজাতি থেকে বিচ্ছিন্ন করা সহজ নয়, বাঙালী সংস্কৃতিকেও তেমনি ভারতীয় সংস্কৃতি-জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়। সত্য বটে, যা আমাদের পক্ষে বুঝ্‌বার তা হচ্ছে এই যে, প্রথমত, কোনো জাতির সংস্কৃতি তার বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গিমার যেমন পরিচায়ক তেমনি তার বিশিষ্ট মানসিক ভঙ্গিমাও গড়ে ওঠে আবার সেই সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়ত, এই মানসিক-ভঙ্গিমা ও সংস্কৃতিও আবার তাদের বিকাশের জন্য নির্ভর করে সেই জনসমাজের আবাস-ভূমি, তাদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা, আর বিশেষ করে তাদের আর্থিক-সামাজিক জীবন-পদ্ধতির উপর। সংস্কৃতির বাস্তব পাদপীঠ তো তা'ই—এই বিশেষ স্তরের জীবন-যাত্রা, জীবন-পদ্ধতি—সমাজের আর্থিক রূপ, তার বিন্যাস, তার উৎপাদনের বিশেষ পদ্ধতি, তার বিনিময়ের বিশেষ ধরন, তার অন্তর্ভুক্ত নানা শ্রেণীর সেই উৎপাদন-পদ্ধতিতে যোগাযোগ। এরূপ আর্থিক বিন্যাসের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে সমাজের নানা প্রতিষ্ঠান, ফুটে ওঠে নানা আচার অনুষ্ঠান; সেই মূলেরই সঙ্গে দৃশ্য ও অদৃশ্য নানা সূত্রে তবু যোগ থাকে একেবারে উপরতলার মানসিক সৃষ্টিসমূহের—জ্ঞান বিজ্ঞান, ধ্যান ভাবনা এবং নানা শিল্পকলার।

এ-সব কথা আমরা জানি। বাঙালী সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝতে হলেও এসব মূল সূত্র দিয়েই যে তার মূল রূপ বুঝতে হবে, তা-ও আমরা মনে রাখব। এখন এখানে যা স্মরণীয় তা হচ্ছে একটি সহজ কথা—জাতি গঠনে ও সংস্কৃতি গঠনে ভাষার স্থান ও দান। যাদের ভাষা এক, নিতান্ত ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক বা আর্থিক কারণে তারা পৃথক না থাকলে তাদের এক-জাতি হওয়া সহজ ও স্বাভাবিক। আর প্রত্যেক জাতির সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য আবার প্রধানত নির্ভর করে এই নিজস্ব ভাষার উপরে। নিজের একটি ভাষা যে-দিন থেকে কোনো মানব-সমাজ লাভ করতে থাক্‌ল সে-দিন থেকেই নিজস্ব সংস্কৃতিরও সে অধিকারী হতে চল্‌ল।

হাজার খানেক বছর ধরে বাঙালী জাতিও ভারতবর্ষের অন্যান্য আধুনিক জাতিদের সঙ্গে একটা বিশিষ্ট সত্তা লাভ করেছে—এ-সত্তা তারা লাভ করেছে প্রধানত স্ব স্ব ভাষাকে অবলম্বন করে। মোটের উপর জাতি গঠনের ইতিহাসে এই ভাষা একটা প্রকাণ্ড ও অপরিহার্য উপাদান, তা আমরা জানি;—জাতি গঠনের পক্ষে অন্যান্য উপাদান যেমন বিশিষ্ট এক আবাসভূমি, বিশিষ্ট এক আর্থিক-সামাজিক জীবন-যাত্রা, বিশিষ্ট এক ঐতিহ্য বা ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা আর বিশিষ্ট এক মনের ভঙ্গিমা—যাতে তার সংস্কৃতিও বিশিষ্ট হয়ে ওঠে।

জাতীয় সংস্কৃতির জন্মকাল

প্রায় হাজার বছর আগে বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতি ভারতবর্ষের মধ্যে একটা বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করতে শুরু করলে—তখন গুপ্ত যুগ শেষ হয়েছে, পাল যুগ চলছে, সেন যুগ আছে সাম্‌নে। এই সময়েই বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম; (মোটামুটি প্রায় ৮০০ খ্রীঃ)। তার প্রথম যুগ শেষ হল মোটামুটি তুর্ক বিজয়ে (১২০৩ খ্রীঃ)। তার পর থেকে শুরু হল তার মধ্যযুগ।

কিন্তু তার মধ্যেও নানা পর্ব রয়েছে। মোটামুটি বল্‌তে পারি এই মধ্যযুগ শেষ হল মুসলমান রাজত্বের শেষে—১৭৫৭ ছাড়িয়ে ১৮০০'র কাছাকাছি এসে। তারপরে এল তৃতীয় যুগ—মোটামুটি ১৮০০ থেকে যা চলে এসেছে ১৯৪০ পর্যন্ত, আর আজ যা আবার পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। কিন্তু এই তৃতীয় যুগের সঙ্গে আগের দু-যুগের বাঙালী সংস্কৃতির যোগাযোগ আর তত অব্যাহত নেই তা আমরা জানি। তবু কিছুটা অব্যাহত নিশ্চয়ই আছে—যতটা চোখে দেখি, তার চেয়ে বেশিও হয়ত আছে; উপর স্তরে যতটা স্বীকৃত, তার চেয়েও বেশি হয়ত বাঙালী সংস্কৃতির পূর্বধারা তা কখনো প্রচলিত, নানা পরিবর্তনের মধ্যেও নিচের এলাকার লোক-সমাজের জীবনে, আচারে অনুষ্ঠানে, মানসিক ভঙ্গিতে তা টিকে আছে। অবশ্য তার সঠিক হিসাব নেওয়া সহজ নয়। কারণ, প্রথম যুগের বাঙালী সংস্কৃতির স্বরূপ বুঝ্‌বার মত তথ্য আমাদের হাতে এসে বেশি পৌঁছেনি। যা পৌঁছেচে তারও মূল্য নির্ধারণ গবেষণা সাপেক্ষ। মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতির তথ্য আমরা সে তুলনায় অনেক বেশি পাই—

আর তা' এ-কালের জীবনযাত্রার মধ্যেও বেশি উত্তীর্ণ হবার কথা। কিন্তু তবু সেই তথ্যসমূহের বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য নির্ণয় করা এখনো আলোচনা সাপেক্ষ।

সেই গবেষণা ও আলোচনার মধ্যে না গিয়ে আপাতত এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতির পূর্ব-ধারা বলে সেই পুরনো বাঙালী সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত একটা হিসাব আমরা মনে রাখ্‌তে পারি—এ হচ্ছে মোটামুটি হিসাব, গবেষকের বিবেচনায় হয়ত যা ভুলে-ভরা।

বাঙালী সংস্কৃতির পূর্বযুগ

প্রথম যুগ : ৮০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ

মোটামুটি এ-সময়কেই বলতে পারি বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম ও শৈশব কাল। এ-সময়ের জীবন-যাত্রার তথ্য পণ্ডিতদের সংগ্রহ করতে হয় নানা অনুশাসন থেকে,—তা থেকে তারা রাজা-অভিজাতদের কথা জানেন, সাধারণ লোকের অবস্থাও জানেন বুঝে নেন। আবার সংস্কৃত নানা গ্রন্থাদি থেকে তাঁরা পান প্রধানত উচ্চবর্গের মানুষের কল্পনা ভাবনা ও জীবনযাত্রার সন্ধান, আর স্মৃতিশাস্ত্র প্রভৃতি থেকে নেন খানিকটা সাধারণ মানুষেরও জীবনের আভাস। সেকালের নানা শিল্পকলা থেকেও মোটামুটি সমাজের উচ্চকোটির সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় কিন্তু সাধারণ মানুষের ভাষার ও ভাবনার আচরণের পরিচয় পাওয়া যায় চর্যাপদ ও দোহাকোষ প্রভৃতির মত গীত গান থেকে। প্রাচীন বাঙলার ইতিহাসই* এ-যুগের জন্য আমাদের সম্বল (যেমন, History of Bengal, Vol, 1, Ed. R. C. Mazumdar; 'বাঙালী জাতি ও বাঙালী সংস্কৃতি'—শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন; 'বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ'—নীহাররঞ্জন রায়, বিশ্বভারতী, ইত্যাদি)। কিন্তু তা থেকেও আমরা আসলে সমাজের আর্থিক জীবন বা সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে

* এ বিষয়ে ১৯৪৬ সালে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘের উদ্যোগে শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র যে ছ'টি সুদীর্ঘ ও অসামান্য বক্তৃতা দেন তা ছাড়া বোধ হয় আর কোথাও বাঙলার ইতিহাসের এ যুগের এমন তথ্যপূর্ণ ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা হয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে সে বক্তৃতা মুদ্রিত হয়নি। কিন্তু তার অনুলিখিত সংক্ষিপ্ত সারও যদি মুদ্রিত হয় তা হলে এরূপ আলোচনার গোড়াপত্তন হবে। লেখক ২৮-২-৪৭।

বেশি সংবাদ পাই না—তা না পেলে কতটুকু চেনা যায় এই প্রথম যুগের বাঙালী সংস্কৃতিকে ?

তবু পরবর্তীকাল ও সমসাময়িক বাতাবরণ থেকে অনুমান করতে পারি—তখন বাঙালীর জীবনযাত্রা ছিল কৃষি-প্রধান, পল্লী-গত ; আর সেই পল্লী-বৃত্তিতে জীবিকা সংগ্রহ করত জেলে, ডোম, বাগ্দী, মাঝি, প্রভৃতি। 'রাষ্ট্রে' এক রকমের সামন্ত-তন্ত্র চলছিল ; ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করা হয় প্রচুর। কিন্তু (বৌদ্ধ ?) বণিকের নতুন উন্মেষও হয়ত দেখা দিয়েছিল বৌদ্ধ পাল-সম্রাটদের সহায়তায়—(হিন্দু ?) সামন্তদের ও ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ রাখবার দায়েই। বাণিজ্যের জন্য সাত সমুদ্রে পাড়ি দিত সেসব বণিকদের নৌকা। আর সেন রাজত্বে এই বণিক-শক্তিকে খর্ব করেই বোধ হয় স্থাপনের চেষ্টা হয়েছিল এক জবরদস্ত রাজতন্ত্র—কৌলিন্যের সূত্রে যে-অত্যাচার পাকা হল বণিকদের উপরে, বিরোধী জাতিদের করলে ছোট বা পতিত। সমাজের ভেতরে এই শ্রেণী-বৈষম্য ও সংগ্রামে যে সেন রাজ্যই পরিণামে অন্তঃসারশূন্য হয়ে উঠছিল তাও বোঝা যায়। আর শেষ দিককার শাসকশ্রেণীর উচ্ছৃঙ্খলতার ও অকর্মণ্যতার কাহিনী তখনকার কাব্য কথায় যথেষ্ট রয়েছে।

আচার-অনুষ্ঠানের দিক থেকে অনুমান করতে পারি—ব্রত, পার্বণ প্রভৃতি লোকাচার যথেষ্ট ছিল ; নাথ, (শৈব ও বৌদ্ধ) তন্ত্রের খুব প্রচলন ও মন্ত্রতন্ত্র ঝাড় ফুঁকের খুব প্রসার ছিল।—সমাজের মধ্যে আজও এসব যা আছে হয়ত তা তখনো ছিল, এমন কি হয়ত তা আরও পুরনো।

বাঙালী সংস্কৃতির মধ্যযুগ

প্রথম পর্ব : ১২০০ থেকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ

মধ্যযুগের বাঙলা মোটামুটি শুরু হয় তুর্ক বিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে আর তার প্রথম পর্ব শেষ হয় ১৪০০-এর কাছাকাছি। এ-যুগের গৌড়-বাঙলার অনেক কথাই নানা সংস্কৃত শাস্ত্র আর কুলজী গ্রন্থ থেকে জানা যায়, জয়দেবের কবিতা আর অন্যান্য কাব্য গ্রন্থও আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকদের লেখায় রাষ্ট্রীয় চিত্রও লাভ করা যায়। কিন্তু বাঙালীর পক্ষে এ-যুগের চিত্রের জন্য উল্লেখযোগ্য হল 'সেখ শুভোদয়া'র (হৃষীকেশ সিরিজে প্রকাশিত ডাঃ সুকুমার

সেন সম্পাদিত) ও 'শূন্য পুরাণের' মত বই। আর বাঙলা সাহিত্যের পক্ষে অবশ্য 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের' মূল্য অসামান্য। কিন্তু তুর্কী বিপ্লবে সামাজিক বিপর্যয় ঘটলেও মূলত সেই কৃষিপ্রধান সমাজের জীবনযাত্রার কী পরিবর্তন ঘটল? বিশেষ নয়, বনিয়াদ প্রায় ঠিকই রইল।

দ্বিতীয় পর্ব: ১৪০০—১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ

পাঠান রাজত্ব ও বারভুঞার কালে আমরা পৌঁছে সামন্ত বাংলার ছবি পাই। মোটামুটি বাঙলা সাহিত্যের আসর বসতে থাকে—হুশেন শাহের দরবারে, পরাগল খাঁ, ছটিখাঁর সামন্ত সভায়, রোসাঙ্গের রাজসভায়। মুসলমান হিন্দু সমভাবে বাঙলা কাব্যরসে তখন আনন্দিত। ওদিকে নবদ্বীপে নৈয়ায়িকদের প্রতিষ্ঠা বেড়ে চলে; বৈষ্ণব যুগের প্রারম্ভ ও প্রসার শুরু হয়। বিষ্ণুপুরের হিন্দু রাজসভায় বৈষ্ণব ধর্মের এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে ওঠে। বৈষ্ণবধর্মের জোয়ারে বাঙলাদেশের মনপ্রাণ টলমল করে উঠল; সাহিত্যে, শিল্প-কলায় কোনো দিকেই এ-যুগের নিদর্শনের অভাব নেই। কবি কঙ্কণ চণ্ডী হল যুগের চিত্র হিসাবে উৎকৃষ্ট। তবু কিন্তু দেখি—সেই পূর্বযুগের মত জায়গীরদার সামন্ত জীবন-যাত্রা পদ্ধতিতেই মোটামুটি ব'য়ে চলেছে।

তৃতীয় পর্ব: ১৬৫০-১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ

মোটামুটি এই তৃতীয় পর্বের শুরু মোগল বিজয়ে। বাঙলার সঙ্গে ভারতের যোগাযোগ তাতে নিকটতর হল; আর তোডর মল্লের আসল তুমার জমায় বন্দোবস্ত নতুন ভূম্যধিকারী সামন্ত সৃষ্টি হল, সামন্ততন্ত্রের একটু নতুন ভঙ্গি দেখা দিলে। ওদিকে ততক্ষণে বিদেশী বণিক আবির্ভূত হয়েছে—দেশ-বিদেশের সঙ্গে বাণিজ্যের প্রসার ঘটায় সওদাগর শ্রেণীর প্রভাব বাড়তে বাধ্য, পুরনো গণ্ডী ও গণ্ডীবদ্ধ দৃষ্টিও ঘুচে যেতে বাধ্য। তা ছাড়া এল শেষ দিকে বর্গীর হাঙ্গামা, আর সামন্ত-তন্ত্রের সঙ্কট তাতে ঘনিয়ে এল। অবশ্য এরই মধ্যে দরবারী সভ্যতার বিকাশ দেখা দিল মুর্শিদাবাদে, ঢাকায়; পরে কৃষ্ণচন্দ্রের রাজসভায় দেখা গেল তার

নকলনবিশী। সভ্যতার কেন্দ্র হিসাবে বিষ্ণুপুর ক্রমে বিনষ্ট হতে লাগল, নাটোর বর্ধমান বেঁচে রইল।

এই দ্বিতীয় যুগে রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি পৌরাণিক কাব্য, মঙ্গল কাব্য, বৈষ্ণব সাহিত্য—পদাবলী, জীবনী-কাব্য, রসশাস্ত্র, কীর্তন এবং শেষ দিকে বিষ্ণুপুরে সংগীতকলার যথেষ্ট অনুশীলন চলে। উচ্চকোটির বাঙালী সমাজ-স্রষ্টারা অধিকাংশই হিন্দু ছিলেন, কেউ কেউ মুসলমানও (আলাওল, দৌলত কাজী প্রভৃতি), কিন্তু মুসলমান শাসকরা হিন্দু রাজাদের মতই মোটামুটি সবাই এই সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। দুই চারিটি শহরে তাদের দরবারী কায়দার প্রাথমিক প্রচলন হয়েছে, নইলে পল্লীসভ্যতাই অক্ষুণ্ণ রয়েছে।
শহরের সঙ্গে সঙ্গে নূতন কারুশিল্পীরও আবির্ভাব হয়েছে। অবশ্য জীবন যাত্রায় অব্যাহত রয়েছে কৃষি-প্রাধান্য, জায়গীরদারী ও টোডর মল্লের নতুন ভূমি-ব্যবস্থা। মোটামোটি মধ্যযুগের উচ্চকোটির বাঙালীর এসব দান আমাদের হাতে কম-বেশি এসে পৌঁছেচে। বর্তমান কালেও মধ্যযুগের অনেক আচার-অনুষ্ঠানে সেই পূজা, পার্বণ, মেলা, খেলা, বাইচ দৌড়, ব্রত নিয়ম সবই গতানুগতিকভাবে চলছে।

কিন্তু মধ্যযুগের এই উচ্চকোটির সৃষ্টিধারাই ছিন্ন হয়ে যায় ইংরেজ রাজত্বে বাঙালী সংস্কৃতির নূতন বিকাশে। বরং মধ্যযুগের লোক-সংস্কৃতির দান অবজ্ঞাত হলেও টিকে থাকে আমাদের পল্লীতে জন-সাধারণের মধ্যে। এই লোক-সংস্কৃতির নিদর্শনের মধ্যে পাই "ময়মনসিংহ গণ-গীতিকা"র মত অপূর্ব কাব্য ও গাথাসমূহ (রোমান্টিক কাহিনী হলেও এসবের মধ্যে সামাজিক সত্যও আছে); মুসলমান লেখকদের লেখা মুসলমানী পুঁথি-সাহিত্য (এর উপরে আরব্য উপন্যাস, পারস্য উপন্যাসের জিন পরী হুরী, আর নানা বুজর্গের নানা কেরামতির ছাপ সুস্পষ্ট); বৈষ্ণব কীর্তন ছাড়াও আউল বাউল সহজিয়া প্রভৃতি ভারতীয় ধারার গান, দেহতত্ত্বের গান; সুফীদের প্রাণাবেগ ও সাধনায় প্রদীপ্ত মর্সিয়া ও মারফতি গান; নানা ধর্ম অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কীর্তন, যাত্রা, তরজা, কথকতা, ঝুমুর, ধামালি, গম্ভীরা প্রভৃতি গান; আর একেবারে সাধারণ মানুষের প্রাণ যাত্রার গান—জারি, সারি, ভাটিয়ালী, বেদে গান, আগমনী, নবমী, বিয়ের গান।

আধুনিক বাঙলার লোক-সংস্কৃতি

এ সবই আজও আমাদের লোক-জীবনে সচল—এ কালের "বাঙালী সংস্কৃতি" এদের পাশ কাটিয়ে গিয়েছে; কিন্তু এ-সব সংস্কৃতি-নিদর্শন মধ্য যুগ থেকে আমাদের লোক-জীবনে বাসা বেঁধে রয়েছে। মধ্য যুগের বাঙালী সংস্কৃতির রূপ আজও তাই দেখতে পাই আমাদের আধুনিক বাঙলার লোক-সংস্কৃতির দিকে তাকালে (দ্রষ্টব্য: 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য'—সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)।

বাঙলার লোকজীবনে আজও সেই পুরনো (১) **বাস্তব সভ্যতার দান** রয়েছে; যেমন, টিন আস্‌ছে, টালি আস্‌ছে গ্রামে গঞ্জে, কিন্তু এখনো বাস্তশিল্পে সেই খড়ের ঘর, বাঁশের ও বেতের কাজ, সেই কাঠের কাজ, সেই ইটের মন্দির রয়েছে। ভাস্কর্যে বিলিতী পুতুল আস্‌ছে কিন্তু পোড়ামাটির মূর্তি, পাথরের দেবমূর্তি, হাতীর দাঁতের কাজ, শাঁখার কাজ, সোলার কাজ, কাঠের পুতুল, মাটির পুতুল চলছে। চিত্রবিদ্যায় কালীঘাটের পট নষ্ট হলেও বাঁকুড়া বীরভূমের পটুয়ার পট, লক্ষ্মীর সরা, কুলা-চিত্র, পিঁড়ি-চিত্র, ঠাকুরের চাল-চিত্র প্রভৃতি উঠে যায়নি। সোনা ও রূপার নানা কাজ, নকশী তোলা, মীনার কাজও রয়েছে। কাঁসা, পিতলের বাসন-কোসন থেকে বিগ্রহ পর্যন্ত টিকে আছে—এলুমিনিয়ম, এনামেলের দিনেও। তা ছাড়া পোলাও কালিয়া, চপ্‌-কাটলেট, আইস্‌ক্রিম্‌ প্রভৃতির সঙ্গে শাক, শুক্তানি, ঘণ্ট থেকে মাছ ও ছানার মিষ্টান্ন টিকে রয়েছে; রসগোল্লা-সন্দেশ প্রভৃতি বাঙালী কাল্‌চারের বাহন হিসাবে বরং দিগ্বিজয় করছে। বস্ত্রশিল্পে মুর্শিদাবাদের রেশম গেল, তসর যেতে বসেছে, তবু ঢাকা, টাঙ্গাইল, ফরাস ডাঙ্গা প্রভৃতি এখনো চল্‌ছে। শ্রীহট্টের পাটি দুর্লভ হয়ে উঠছে—জাপানী মাদুর বাজার প্রায় ছেয়ে ফেলেছিল। (২) অবশ্য **আচার-অনুষ্ঠান** তো লোক-জীবনে প্রায় অব্যাহতই রয়েছে—সে বিবাহ-শ্রাদ্ধ প্রভৃতিই হোক্‌, পূজা পার্বণ প্রভৃতিই হোক্‌, ভাইফোঁটা জামাই ষষ্ঠী, নবান্ন, নূতন খাতা প্রভৃতিই হোক্‌ কিংবা মহরম, ঈদ, শাহ মাদারের উৎসবই হোক্‌। আল্‌পনা কাঁথা সেলাই পূর্ব বঙ্গে এখনো মরেনি; লাঠি খেলা, কালিকাছের নাচ, রাইবেঁশে নাচও অচল হয়নি। (৩) অবশ্য **আধ্যাত্মিক ও মানসিক সংস্কৃতির** উচ্চকোটির ক্ষেত্রে টোল-চতুষ্পাঠীর কেন্দ্রসমূহ কিংবা তাদের পুরানো বিদ্যা-চর্চার ঐতিহ্য আজ আর সে শ্রদ্ধা পায় না। লোক-গীতি, লোক-সাহিত্য যা টিকে আছে, টিকে আছে লোক-জীবনের মধ্যে। ইংরেজ আমলের নতুন বাঙালী সংস্কৃতি লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতি সম্বন্ধে উদাসীন;

লোক-সমাজ ও এই শিক্ষিত ভদ্রলোকের সংস্কৃতির রসাস্বাদনে অক্ষম। তারা গান, কীর্তন প্রভৃতি নিয়েই সান্ত্বনা পেয়েছে। কিন্তু এ যুগে সে সবে নূতন প্রাণ সঞ্চার করতে না পারায় ক্রমেই সে-সব লোক-শিল্পও ক্ষীণায়ু হয়ে পড়েছে।

কিন্তু যে একটি বড় কথা প্রথম যুগ ও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির সম্বন্ধে মোটামুটি সত্য,—এবং এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতি সম্বন্ধে সত্য নয়,—তা এই যে: ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব পর্যন্ত বাঙালী সমাজে শ্রেণী-বৈষম্য ছিল—উচ্চকোটির লোক উচ্চাঙ্গের শিল্প ও কারুকলার চর্চা করতেন, নিম্নকোটির লোকও তাদের নিজস্ব লোক-সংস্কৃতি নিয়ে আনন্দ লাভ করতেন। কিন্তু এই দুই বর্গের মধ্যে যত তফাৎ থাকুক তাদের মধ্যে আদান-প্রদান ছিল সহজ এবং স্বাভাবিক। উচ্চবর্গের সংস্কৃতির দান সহজ ভাবেই বয়ে নাম্‌ত নিম্নবর্গের সংস্কৃতির মধ্যে। আর নিম্ন বর্গের জারি গান, সারি গান, কীর্তন প্রভৃতিও উচ্চবর্গের নিকট অখাদ্য হয়ে ওঠেনি—তারও সারল্য ও স্বাভাবিকতা সহজ সূত্রে উচ্চকোটির স্রষ্টারা আয়ত্ত করে নিতেন। একদিকে যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, পালা গান প্রভৃতির মধ্য দিয়ে, আর অন্য দিকে আউল-বাউল, দরবেশ ও সুফীদের মারফত এ দুই বর্গের জীবনে ও সংস্কৃতিতে সর্বদাই লেন-দেন চল্‌ত। অর্থাৎ পল্লী-সভ্যতার ও কৃষিপ্রধান সভ্যতার বাতাবরণে মধ্যযুগের সামন্ত জীবনেও "ভদ্রলোকে"-"ছোটলোকে", আর "ভদ্র" সংস্কৃতিতে ও 'লোক'-সংস্কৃতিতেও এত বড় তফাৎ ঘটেনি, যেমন তফাৎ ঘটল সাম্রাজ্যবাদী শাসনে এ কালের বাঙালী সংস্কৃতিতে ও এখনকার লোক-সংস্কৃতিতে। তার কারণ সাম্রাজ্যবাদের যুগে বাঙালী সংস্কৃতি হয়েছে (ক) মধ্যবিত্তের সৃষ্টি বাবু কাল্‌চার; (খ) ইংরেজি শিক্ষিতের সৃষ্টি; (গ) শহুরে লোকের সৃষ্টি; (ঘ) চাক্‌রে ভদ্রলোকের সৃষ্টি। আবার সেই মুসলমান শাসনে জীবনক্ষেত্রে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বাঙালী হিন্দু ও বাঙালী মুলসমানে এমন দূরত্ব ও বিবাদ ঘটেনি যেমন ঘটেছে এই সাম্রাজ্যবাদী শাসনে শাসিত হিন্দু ও মুসলমান বাঙালীর মধ্যে। তারও কারণ সাম্রাজ্যবাদী আমলে প্রথমে এই চাক্‌রে ও মধ্যস্বত্বভোগী মধ্যবিত্ত, শিক্ষিত শহুরে ভদ্রলোকরা ছিলেন হিন্দু, মুসলমান তখনো বিজেতার সংস্পর্শে আসতে উৎসুকই ছিল না। আর আজ সেখানে মুসলমান মধ্যবিত্ত এসে উপস্থিত হয়েছেন হিন্দু মধ্যবিত্তদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে।

শত দোষ-সত্ত্বেও তাই মনে রাখা দরকার—মধ্যযুগের বাঙালী জীবন যাত্রা

যেমন অনেকাংশে (সর্বাংশে নয়) অখণ্ড ছিল, তেমনি পূর্বযুগ ও মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতিও ছিল অনেকাংশে অখণ্ড।

ইংরেজ শাসনে বাঙালীর জীবনে ও সংস্কৃতিতে একেবারে ওলট-পালট হয়ে গেল—পুরনো বাঙালী সংস্কৃতির অতি অল্প অংশই টিকে রইল তার পরে। তাই বাঙালীর জীবন ও সংস্কৃতির এই তৃতীয় যুগে হল খণ্ড বিকাশ।

ইংরেজ রাজত্বের বিপর্যয়

ইংরেজের রাজত্ব-লাভে যে বিপর্যয় রাষ্ট্রে ও সমাজে সূচিত হল প্রথমে তা'ই একবার স্মরণ করা দরকার।

পুরনো শাসন ব্যবস্থা ধ্বংস হলে নবাবী আমলের পরিপুষ্ট অভিজাত শ্রেণী, বিশেষ করে মুসলমান অভিজাত শ্রেণী বিনষ্ট হল। সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বাঙালী সংস্কৃতি হারাল তার পৃষ্ঠপোষকদের। খাজনার লোভে দেশ চলে গেল খাজনা-আদায়ী ইংরেজের একদল অনুচরের হাতে, ক্রমে ইংরেজের তাঁবেদার এই দালাল, মুৎসুদ্দি, প্রভৃতি হয়ে বসলেন জমিদার। পুরনো সংস্কৃতির প্রতি এদের দরদ ও দৃষ্টি থাকবার কথা নয়। এরা অনুকরণ করতে চেয়েছে কখনো সেই আধা-নবাবী চাল, কখনো সেই ইস্ট ইণ্ডিয়া ফিরিঙ্গির জীবন-যাত্রা। দেশের শিক্ষা-বাণিজ্যে ইংরেজ বণিক অধিকার স্থাপন করে দেশের ধনী লোকদের পথ সেদিকে একেবারে বন্ধ করে দিলে জমিতেই তারা দেখলে মুনাফা। তাই, আগেকার বড় বড় ব্যবসায়ীরা ক্রমেই জমির মালিক হয়ে বসতে লাগ্‌ল। জমিদারী প্রথার সুযোগ (১৭৯৩) নিয়ে নানা মধ্যস্বত্ব সৃষ্টি করে তারা জমির খাজনা আদায়ের ভারও ক্রমেই তালুকদার পত্তনিদার, প্রভৃতির হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে বস্‌ল। এভাবে জমিদার বনে গিয়ে তারা উদ্যোগ-উদ্যম খুইয়ে ফেল্‌লে—ফলে এদেশে ব্যবসায়ী বণিকদের পক্ষে শিল্পপতি, পুঁজিপতি হবার মত আগ্রহ ও উদ্যম ক্রমেই কমে গেল। জমির উপস্বত্ব পেয়ে নানা ধাপের মধ্যবিত্তও তখনকার মত কৃষ্টির উপর চেপে বসল। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি কুঠীর দাদন ও অত্যাচারের চাপে এ-দেশের কারুশিল্প ও পল্লী-শিল্প ১৮০০ খ্রীঃ পূর্বেই লোপ পাচ্ছিল। বিলাতে কল-কারখানার যুগ এলে, (১৮০০-১৫ এর সময়) শ্রম-শিল্পের যুগ এলে, এদেশের হাতের কাজের শিল্পীর দিন শেষ হল। তারা বাধ্য

হয়ে চাষী হয়ে কৃষির দিকে ঝুঁকে পড়ল। অন্য দিকে ব্রিটেনের শোষণে, জমিদার ও নানা মধ্যবিত্তের শোষণে, কৃষক ক্রমশ গিয়ে পড়ল মহাজনের কবলে। সেচের ব্যবস্থার অভাবে, অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টিতে কৃষির অবনতি ঘট্‌তে লাগ্‌ল। আর টুক্‌রো টুক্‌রো জমিতেই ক্রমেই যত 'কৃষি-জীবী'র ভিড় বাড়ল ততই কৃষি হল নুকসানের কাজ—অথচ জীবিকার অন্য পথও কারও নেই। তখনকার মত বাঁচবার পথ রইল জমিদারের মধ্যবিত্তের ও মহাজনের,—কিন্তু কৃষি ও কৃষকের যদি মৃত্যুই ঘটে তা হলে তাদের মৃত্যু ক্রমে ঘনিয়ে আস্‌বে। কালক্রমে তা আজ এসেছেও এই হল ইংরেজ রাজত্বের বিধ্বংসী কাজ।

কিন্তু ইংরেজ রাজত্বের ঘাত-প্রতিঘাতে আর একটি আবার নতুন সম্ভাবনার দিকও সঙ্গে সঙ্গে খুলে যায়—দেশ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায় সূত্রে গণ্ডীবদ্ধ জীবন ভেঙে গেল। অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে পুরনো পদ্ধতির এদেশীয় পল্লী-শিল্প আর টিকিয়ে রাখা যায় না। বিলেতী শিল্পজাত নিয়ে আসবার জন্য রেলপথ বসে, তাই কয়লার খনি দরকার হয়, লোহার কারখানাও খুলতে হয়। ফলে শিল্প-যুগের দিকে দেশ এগিয়ে যেতে চায়। নিতান্ত জমিদারী প্রথায় বাঁধা না পড়লে উদ্যোগী ও সম্পন্ন পুরুষেরা এগিয়ে যেত তখন ব্যক্তিগত কারবারে, বিদেশী বাণিজ্যে (যেমন পার্শীরা গেল), শেষে স্থাপন করতে কল-কারখানা। ফলে সামন্ত-যুগ আর তার জীবনযাত্রা শেষ হত। তা'ই হল পশ্চিম উপকূলে, কিন্তু বাঙলায় জমিদারীতন্ত্রের জন্য তা'ই হয়নি। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষে একই শাসনব্যবস্থায় একটা একতা গড়ে ওঠে, আর ইংরেজি জীবনাদর্শের প্রভাবে গড়ে ওঠে স্বাধীন মুদ্রাযন্ত্রের, স্বাধীন মতবাদের ও গণতন্ত্রের আদর্শ। তৃতীয়ত, ইংরেজের রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে ইংরেজীর মারফত পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষা প্রবর্তিত হলে এক মুহূর্তে সেই শিক্ষার্থীর সামনে উন্মুক্ত হল—পৃথিবীর তখনকার উন্নততম জাতিব ও উন্নততম সভ্যতার চরম দান, জ্ঞান-বিশ্বাস, শিল্প ও সংস্কৃতি। তার ফলে এই শিক্ষিতদের মানসিক জীবনে একেবারে বিপ্লব ঘটে গেল। ব্যক্তি স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের চেতনা একদিকে তাদের উদ্‌বুদ্ধ করলে আর দিকে তারা উদ্‌বুদ্ধ হল সেই নতুন জীবনাদর্শে, নতুন সৃষ্টিতে। একালের বাঙালী সংস্কৃতির জন্ম হল প্রধানত এই প্রেরণার বশে, এই চেতনায়। এর স্রষ্টারা হল ইংরেজী শিক্ষিত বাঙালী।

বাঙালী সংস্কৃতির পাদপীঠ

কিন্তু এ প্রেরণা ও এ চেতনা বাস্তব ক্ষেত্রে দাঁড়াবার ভূমি পেল কি করে? পেল এই জন্য যে, প্রথমত, জমিদারীতন্ত্রের আওতায় দেশে মধ্যস্বত্ব ভোগী একদল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আপাতত জীবিকার একটা প্রশস্ত পাদপীঠ মিলল—যদিও তাতে অগণিত কৃষক ও শিল্পজীবীর ঘাড়ে আরও বড় বোঝাই চাপল। দ্বিতীয়ত, ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পেলে ইংরাজের দপ্তরখানায় শিক্ষিতদের তখন সহজেই চাকরি মিলত—আর সে চাকরিতে যেমন আয় ছিল, তেমনি ছিল আবার সম্মানও। অতএব শিক্ষিত বৃত্তি—চাকরি থেকে মাষ্টারি, ডাক্তারি, ওকালতি এ-সবই হল মধ্যবিত্তের জীবন যাত্রার দ্বিতীয় আশ্রয়।

এই দুই আশ্রয়ই যে অত্যন্ত কাঁচা তা আজ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ১৮০০ থেকে ১৯০০ কেন, প্রায় ১৯২০ পর্যন্ত আমাদের বাঙালী ভদ্রলোক অন্য সব জীবিকা পথ বর্জন করে এই দুই পথ আশ্রয় করেই দাঁড়ায়। আর তখনো তার ভাগ্যে এতটা অবকাশ মিলে এই জীবন ক্ষেত্রে, যে সে ব্রিটিশ বুর্জোয়া সভ্যতার শ্রেষ্ঠ জীবন-দর্শনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তেমনি রূপে রাষ্ট্রে সমাজে শিল্পে নিজেকে প্রকাশিত করবার জন্য নিজেকে ঢেলে দেয়। তার এই প্রায় দেড়শ বৎসরের দানই এ-কালের বাঙালী সংস্কৃতি—অত্যন্ত কাঁচা আর্থিক সামাজিক বনিয়াদের উপর সৃষ্ট মুষ্টিমেয় মধ্যবিত্ত ইংরেজি শিক্ষিত হিন্দু ভদ্রলোকদের এক সুতীব্র, বর্ণোজ্জ্বল কুসুম—বাস্তব জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে যারা বুর্জোয়া রাষ্ট্রব্যবস্থা, স্বাধীনতা, আর্থিক বিকাশ থেকে বঞ্চিত হয়ে আবদ্ধ হল জমিদারীতন্ত্রের আধা-সামন্ত গণ্ডীতে, তারাই বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রেরণায় মেতে উঠল মানসিক সৃষ্টিতে। দেহমন নিগড় বদ্ধ রইল সাম্রাজ্যবাদী শাসনে—এমন কি, নিজেরা তারা সংযোগ হারাল দেশের পূর্বসংস্কৃতির সঙ্গে, সংযোগ হারাল দেশের জীবন্ত জনতা ও জনজীবনের সঙ্গে—অথচ তারাই প্রাণ মনে চাইল সৃষ্টি করতে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতীয় সংস্কৃতি। ফলে, এ সৃষ্টির মধ্যে যে সব লক্ষণ দেখা দিতে বাধ্য তাও আমরা বুঝি—অতিরিক্ত ভাবাবেশ ও আত্মকেন্দ্রিকতা, বাস্তববিমুখিতা, তথাকথিত "অধ্যাত্মিকতা", আর রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কর্মে অক্ষমতা, অস্থিরতা।

\ কালানুক্রমিক বিকাশ

তবু এই কালের মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতি কয়েকটি পর্ব সমুত্তীর্ণ হয়ে যায়, তা এখানে সংক্ষেপে স্মরণে রাখতে পারি (দ্রষ্টব্য : Notes on Bengali Renaissance, Amit Sen)।

প্রথম পর্বে (১৮০০-১৮৪০) রামমোহনের উদয়। আমাদের রিনাইসেন্সর প্রভাতের শুকতারা রামমোহন। তাঁরই মধ্যে পূর্ব ও পাশ্চাত্য বিদ্যাচর্চা, ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কার থেকে রাজনৈতিক চেতনার প্রথম স্ফূরণ আমরা দেখতে পাই। আর এ-পর্বে সে-সঙ্গে দেখতে পাই শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের বাঙলা চর্চা; ডেভিড্ হেয়ারের শিক্ষা-দান ব্রত, ডফ্ প্রভৃতি পাদ্রীদের চেষ্টা, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে নতুন বাঙলা গদ্যের প্রথম বিকাশ। দ্বিতীয় পর্ব এরই মধ্যে শুরু হয় হিন্দু কলেজকে অবলম্বন করে। কিন্তু এ পর্বের প্রধান নায়ক হল সেদিনের ইয়ংবেঙ্গলেরা। তাঁরা বিদ্রোহী হলেন পূর্ব সংস্কারের বিরুদ্ধে। তৃতীয় পর্ব চলল ওয়েলেস্‌লি-ডালহৌসির আমলে—সামন্ত ব্যবস্থা ভাঙায় আর রেল, টেলিগ্রাফ প্রভৃতির পত্তনে তার বাস্তব ভিত্তি রচনা হয়। চতুর্থ পর্বে একদিকে সিপাহী বিদ্রোহ ও সামন্ত যুগের অবসান; অন্যদিকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু হয়ে দেখল সত্যকারের বাঙালী সংস্কৃতির বিকাশ—১৮৪৯-৬০-এর কাছাকাছি থেকে সেই বাঙালী রিনাইসেন্স শুরু হল মধুসূদন, দীনবন্ধুকে নিয়ে। এদিকে রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথের সংস্কার আন্দোলন 'বাঙালী রিফর্মেশন' রূপ লাভ করলে কেশবচন্দ্র ও পরে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে; পাশাপাশি জেগে উঠল হিন্দু পুনর্গঠনের চেষ্টা 'কাউণ্টার রিফর্মেশন,—বঙ্কিম-ভূদেব থেকে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যন্ত। আর রাজনৈতিক চেতনা রূপ গ্রহণ করতে লাগল জাতীয় আত্মবোধে দৃপ্ত হয়ে হিন্দু মেলায় আর উদারনৈতিক যুক্তিবাদ অবলম্বন করে ইণ্ডিয়ান্ এসোশিয়েসন। রিনেইসেন্স রিফর্মেশনের ফল রিভোলিউশন—রাজনৈতিক বিপ্লব, কংগ্রেস প্রভৃতির মধ্যে। এধারার চরম পরিণতি স্বদেশী যুগে (১৯০৫-১৯১১)—তখন বাঙালী মধ্যবিত্তের সমস্ত চেতনা একেবারে শত দিকে আপনাকে মেলে দিলে। জন্মাল নতুন তীব্র স্বাধীনতাবাদ, বিপ্লবী প্রেরণা। জাতীয় শিক্ষা দীক্ষা সম্পদের নতুন স্বপ্ন জাগল। রবীন্দ্রনাথের হাতে নতুন সংগীতকলা নতুন করে গড়ে উঠতে লাগল; নতুন ভারতীয় চিত্রকলা জন্মাল,—আরও কত কি যে হল, তা হিসাব করে

দেখবার মত। তারপর এল মহাযুদ্ধের দিন। আর মহাযুদ্ধের শেষে স্পষ্ট হল এই কথাই যে, বাঙালী ভদ্রলোকের চাকরি দুর্লভ; বাঙলার মধ্যস্বত্ব ও জমিদারীতন্ত্রের চাপে কৃষিমূলক জীবনযাত্রা ভেঙে যেতে বসেছে, আর মধ্যবিত্ত বনিয়াদ ধসে না গিয়ে পারে না। এই সঙ্কটকে আরও স্পষ্ট করে বাঙলা দেশের রাষ্ট্রীয় জীবন ক্ষেত্রে আবির্ভূত হল মুসলমান মধ্যবিত্ত—আশা তার অনেক কিন্তু পথ তার কই? রিনাইসেন্স রিফর্মেশন তার লাভ হয়নি, অথচ সে রাজনৈতিক শক্তি। সমস্ত চেতনাই তার খাপছাড়া। আর সেই চাকরির দ্বন্দ্ব ও সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব অনেকটা তাই আচ্ছাদিত করে রাখল মূল সত্যটি—সাম্রাজ্যবাদী আওতায় বাঙালীর এই জীবনযাত্রাই আজ অচল। তবু এই সমস্যার যুগেও সংস্কৃতিক্ষেত্রে বাঙালী সৃষ্টিতে আপনার দান অব্যাহত রেখে যেতে পারে—আরও অনেকদিন—তার প্রমাণ মিলেছে।

সংক্ষিপ্ত হিসাব

কিন্তু তার পূর্বে এই ১৮০০ থেকে ১৯২০-এর মধ্যে বাঙালী সংস্কৃতি যে বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিতে সার্থক হয়েছে আমরা এখানে তা মাত্র উল্লেখ করতে পারি (দ্রষ্টব্য: "সংস্কৃতির রূপান্তর"—'বাঙলার কালচার')।

রিনেইসেন্সের দিক থেকে দেখি:

(১) আমাদের রিনেইসেন্সে আমরা নতুন করে সংস্কৃত ভাষার সম্পদকে আবিষ্কার করলাম,—আমরা ভারতের অতীতকে আবিষ্কার করবার চাবি খুঁজে পেলাম। অবশ্য আমাদের রিনেইসেন্সের আসল প্রেরণা পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা সংস্কৃতি।

(২) বাঙলা গদ্য জন্ম নিলে, প্রথমত তা শিক্ষার বাহন হয়ে উঠল, দ্বিতীয়ত তা হল মানসিক আবেগময় সাহিত্যের বাহন। আর বাঙলা কাব্যে এক বিপ্লবী বিকাশ ঘটল। বাঙালীর প্রধান গৌরবই তার এই শিক্ষা বিস্তার ও সাহিত্য সৃষ্টি।

(৩) ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলায়ই গড়ে উঠতে লাগল এক সাধারণ রঙ্গমঞ্চ আর এক নাট্য-সাহিত্য। পরবর্তী কালে (১৯২০-এর পরে) সূচনা হয় নতুন ফিল্‌ম ও নতুন নৃত্য-কলার।

(৪) আমরা নতুন সংগীতকলা আবিষ্কার করলাম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে।

(৫) নতুন ভারতীয় চিত্রকলার উদ্বোধন হল, (তারও পরে জন্ম নিয়েছে নতুনতর চিত্রশিল্পী যেমন যামিনী রায়)।

(৬) বিজ্ঞানে (জগদীশচন্দ্র হতে), চিকিৎসা শাস্ত্রে (ডাঃ ব্রহ্মচারী প্রভৃতি), অর্থনীতিতে (রমেশচন্দ্র) ইতিহাসে (রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে) নতুন গবেষণার সূচনা হয়।

সংস্কারান্দোলনের দিক থেকে দেখি :

(৭) হিন্দু সমাজসংস্কারের বিপুল আন্দোলনের ধারা, রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত উজান গতিতে চলে।

(৮) ধর্মে ব্রাহ্ম সমাজ এক নতুন সূচনা।

(৯) রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ থেকে নব্য বৈষ্ণবধর্ম বা শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত হিন্দু সাধনার এক নূতন বিকাশ।

রাজনৈতিক আন্দোলনের দিক থেকে দেখি :

(১০) ভারতবর্ষের জীবনে বাঙালীর সর্বাপেক্ষা বড় দান রাজনৈতিক চেতনা ও আন্দোলন। দেশবন্ধু পর্যন্ত বাঙালীই সেদিকে অগ্রণী।

রামমোহনের মধ্যে যে সূত্র ছিল সে সূত্র অবলম্বন করেই উনিশ শতকে বাঙালী জীবনে দু'টি ধারা—পরস্পরের পাশাপাশি—আমাদের রিনেইসেন্স, রিফর্মেশন ও রাজনীতিতে সুস্পষ্ট হয়ে উঠে :

(ক) "উদারনৈতিক" সংস্কারবাদী—যাঁরা প্রধানত ইউরোপীয় জ্ঞান বিজ্ঞান, যুক্তিবাদ ও রাজনৈতিক ইতিহাসের শিক্ষা অবলম্বন করে "ব্যক্তি স্বাধীনতা, জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের" আদর্শ গ্রহণ করেন। এটিই ইয়ং বেঙ্গল, মধুসূদন প্রভৃতি, কেশব আনন্দমোহন, সুরেন্দ্রনাথ, প্রভৃতির ধারা।

(খ) "জাতীয়তাবাদী" স্বাধীনতাকামী—প্রধানত জাতীয় মর্যাদা, জাতীয় গৌরব ও জাতীয় আত্মশক্তিকে অবলম্বন করেই এঁরা দাঁড়াতেন—যেমন, দেবেন্দ্রনাথ রাজনারায়ণ বসু ও হিন্দু মেলার প্রবর্তকগণ ;

বঙ্কিম-বিবেকানন্দ-অরবিন্দের মত ভারতীয় সাধনার প্রচারকেরা।—

বাঙলার বিপ্লবীরা এঁদেরই দেশপ্রেমের প্রেরণাকে অবলম্বন করে।

এই দুই ধারারই সমন্বয় ঘটে রাজনীতি ক্ষেত্রে আর স্বদেশীতে আর সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তায় ও দর্শনে।

সঙ্কটের মুখে

এই বাঙালী সংস্কৃতিতে তবু সমস্যা ও সঙ্কট ঘনিয়ে উঠতে বাধ্য, যখন প্রথম মহাযুদ্ধের পরে দেখা গেল বাঙালী মধ্যবিত্তের জীবনের বনিয়াদ আর টিকে না। তবু কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতি তৎক্ষণাৎ বন্ধ্যা হয়ে গেল না। তার প্রমাণগুলি আমরা গণনা করতে পারি—প্রধানত এ সময়েই আমরা দেখি—(১) 'সবুজপত্র' ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর যুক্তিবাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতাবাদ, 'নারায়ণ' ও বাঙলার রূপ-বাদ, (২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অব্যাহত বিজ্ঞানের গবেষণা (মেঘনাথ সাহা প্রভৃতি) ইতিহাসের গবেষণা, ভাষা-তত্ত্বের গবেষণা প্রভৃতি (৩) অসহযোগের সঙ্গে মুসলিম্ বাঙলার জাগরণ ও তার রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক তাৎপর্য (৪) রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতী স্থাপনা (৫) তাঁর প্রচেষ্টায় বাঙলা কাব্য, সংগীত, শিল্পকলা ও নৃত্যের নবজন্ম (৬) 'বিদ্রোহী' কবি থেকে নজরুলের গজলের, গানের কবি হিসাবে বিকাশ; (৭) তৃতীয় দশকের 'অতি-আধুনিক সাহিত্য' (অবাস্তব 'বস্তি সাহিত্য'; ভাবালু 'যৌন-সাহিত্য', অসুস্থতার কথা-সাহিত্য, প্রভৃতি) ও তার নাতি-আধুনিক প্রতিবাদ; (৮) শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতে বাঙালী মধ্যবিত্তের আত্ম-পরিচয় এবং তার অক্ষমতার পরিচয় (যেমন 'পথের দাবী', 'বিপ্রদাস'); (৯) শিশিরকুমারের নাট্যকলার উদ্বোধন, নূতন সবাক্ চিত্রের জন্ম; (১০) যামিনী রায়ের নূতন আবির্ভাব শিল্পে; (১১) আর রবীন্দ্রনাথের (ও সমসাময়িক অন্য সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্য দিয়ে) সাহিত্যের কালান্তরের সূচনা; (১২) বাঙালী মধ্যবিত্ত পলিটিক্সের অচলতা ও বাঙলার বিপ্লবী কর্ম ও প্রেরণার সাম্যবাদী চিন্তা ও প্রয়াসে রূপান্তর; এবং (১৩) এই যুদ্ধকালে যুদ্ধ-ব্যবসা ও সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে চোরা কারবার মুনাফাতন্ত্রের বিকৃত বিকাশ।

বাঙালী জীবনে সমস্যা যে কত ঘনিয়ে উঠেছে আর একালের বাঙালী সংস্কৃতির বনিয়াদ যে কত সঙ্কীর্ণ ও দুর্বল ভিত্তিভূমির উপর গাড়া হয়েছিল এই দুই যুদ্ধের মধ্যকালে ক্রমেই তা পরিস্ফুট হয়। আর শেষে এই মহাযুদ্ধ কালের আঘাতে তা একেবারে নির্মম ভাবে আমাদের প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে কলিকাতার পথের হাজার হাজার বাঙালী চাষী আর দরিদ্র কারুকর্মীর মৃতদেহের সাক্ষ্য নিয়ে। এ-কথা আর বুঝ্‌তে বাকী নেই—বাঙালীর জীবনের মূল আর্থিক বনিয়াদই অচল, তার জমিদারীতন্ত্রে, তার মধ্যস্বত্বের ভারে, তার শ্রমশিল্পের অভাবে, মহাজনের ঋণভারে, জমিদারের চাল, সেচের ব্যবস্থার অভাবে, লাঙলের অভাবে; ভালো বীজের অভাবে, পাটের দামের অভাবে,—স্বাস্থ্যের অভাবে, শিক্ষার অভাবে, অন্নের অভাবে সমস্ত কৃষি-জীবন ভেঙে পড়েছে। অপরদিকে তার পাট, তার চা, তার কয়লা কিছুরই উপর তার মালিকানা নেই। বাঙলার এতবড় শিল্পায়োজনে সে না মালিক, না মজুর—সে শুধু কেরানী ও চাকর। বলা বাহুল্য মুষ্টিমেয় "ভদ্রলোকের" বা চাকরের সংস্কৃতির দিন ফুরিয়েছে—বাঁচতে হলে তাকে নতুন সুস্থ বনিয়াদের উপর বাঁচতে হবে, জন-জীবনকে সংগঠন করে, জন-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগ স্থাপন করে। হিন্দু মুসলমান সকল বাঙালীর দানে তখনই তা আসলে বাবুসংস্কৃতি থেকে হবে "বাঙালী সংস্কৃতি"।

বাঙালী মুসলমান ও মুসলিম কালচার

তীক্ষ্ণ বুদ্ধি একটি মুসলমান যুবকের সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল, বাঙালী মুসলমান কি করে সংস্কৃতিক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠ হবেন, তা নিয়ে। যুবক বন্ধু ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়টের আলোচনা থেকে আভাস সংগ্রহ করে নিয়ে যা বললেন তা সংক্ষেপে এই: "বাঙালী মুসলমানের সংস্কৃতির উৎস মুসলিম সংস্কৃতির ঐতিহাসিক ধারা থেকে উজ্জীবিত হবে। বর্তমান পাশ্চাত্য (বা খ্রীস্টান) সংস্কৃতির প্রাণ যেমন, এলিয়ট বলেছেন, ক্যাথোলিক চর্চ ও ক্যাথোলিক সংস্কৃতি, মুসলমানের সংস্কৃতিরও প্রাণ তেমনি সেই মুসলিম আরবী কালচার।"

এলিয়টের এসব মতবাদ নিয়ে আলোচনা এখানে নিরর্থক। কঠিন বাস্তব ইতিমধ্যেই তাঁর সাধের মুসোলিনি-হিটলারদের প্রতিক্রিয়ামূলক প্রয়াসকে চুকিয়ে দিয়েছে। সমস্ত পাশ্চাত্যদেশের বিভিন্ন সংস্কৃতি মধ্যযুগের ক্যাথোলিক খাদে ফিরে না গিয়ে বরং এগিয়ে চলেছে; নিজ নিজ খাদেই তা চলেছে; আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ও সংগঠনে বিপুলতর হয়েছে,—বিশ্ব-সংস্কৃতির সাগরসঙ্গমের দিকে তার গতি। এসব আমরা বুঝি। কিন্তু আমাদের পক্ষে ভেবে দেখা দরকার 'মুসলিম সংস্কৃতি' সম্বন্ধে আমাদের মুসলিম বন্ধুর এই ধারণা। হিন্দু ও মুসলমান সকলেরই তা সমভাবে বুঝবার জিনিস। অবশ্য এ-আলোচনায় হিন্দুদের পক্ষে বাধা আছে। আমাদের জ্ঞানেরও অভাব থাকে, আবার মুসলমানদের দ্বারা ভুল বোঝারও আশঙ্কা থাকে। তবু বিষয়টি হিন্দু-মুসলমান আমাদের সকলেরই আলোচনার যোগ্য। কারণ, এলিয়টের দৃষ্টান্তটা বিশেষ কিছু নয়। মুসলমান বন্ধুর মতবাদের যুক্তি এলিয়ট থেকে সংগ্রহ করা বটে, কিন্তু তাঁর মতবাদের শক্তি আসলে আমাদের শিক্ষিত মুসলমান

বন্ধুদের এক মনোভাব। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এদেশে তাঁরা এখনও অনগ্রসর, তাই তাঁদের মনে একটা আশঙ্কা ও ব্যর্থতাবোধ আছে। তা থেকেই তাঁরা ধাবিত হন এলিয়টের মতোই সুদূর অতীতের উৎসের দিকে—এমন কি, মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান বা ভারতীয় মুসলমানের সৃষ্টিও ততটা আপনার বা ততটা কার্যকরী 'ঐতিহাসিক ধারা' বলে তাঁদের মনে হয় না। তাঁরা মুসলিম কালচার বলে অর্ধেক কল্পনা ও অর্ধেক সত্য একটি সৃষ্টি-উৎসের দিকে তাকিয়ে থাকেন। 'মুসলিম কালচার' কথাটার অর্থ তাঁরাও হয়তো পরিষ্কার করে বলেন না, আমরাও পরিষ্কার করে বুঝি না। তাই তার রূপ বোঝা আমাদের ও তাঁদের সমান দরকার।

'মুসলিম কালচার' কি এক?

গোড়াতেই অবশ্য সংশয় জাগে, 'মুসলিম কালচার,' 'খ্রীস্টান কালচার' এসব কথা কতটা ঠিক। সত্যই এসব কথা বড় ঝাপসা। 'খ্রীস্টান সভ্যতা'র তো বলতে গেলে খ্রীস্টের সঙ্গেই সম্পর্ক ক্ষীণ; তার গৌণ সম্পর্ক বিভিন্ন চর্চের সঙ্গে ক্যাথোলিক, অ্যাংগ্লিকান্, গ্রীক অর্থোডক্স্ ইত্যাদি। এমন কি প্রাচীন সীরিয় খ্রীস্টান মতবাদ আমাদের দেশে কেরলে এদেশের একটা কেরলী রূপ গ্রহণ করেছে। অথচ 'খ্রীস্টান সিভিলিজেশন' দিয়ে পোপ-ফ্রাঙ্কো-হ্যালিফেকস্-আর্চবিশপরা সাধারণত বোঝান ইউরোপ-আমেরিকার পাশ্চাত্য সভ্যতা। 'খ্রীস্টান সভ্যতা'র মুখ্য সম্পর্ক সেই পাশ্চাত্য সমাজের সঙ্গে। মুসলমান ধর্ম অবশ্য সেরূপ অস্পষ্ট মতবাদ নয়। সীয়া-সুন্নী কলহ আছে; শাফি-হানিফী তফাৎ আছে; সুফী, দরবেশ, পীরদেরও বিভিন্ন সাধনাপদ্ধতি রয়েছে; নতুন নতুন মতবাদ ও সাধনাধারা এখনো মুসলমান-সমাজে জন্মাচ্ছে। তবু মুসলমান ধর্মমত খুব পরিষ্কার, সুস্পষ্ট, তার নড়চড় হওয়াও শক্ত। মুসলমান ধর্মমত অনেকাংশেই অবশ্য একরূপ রয়েছে। কিন্তু কথা হল—মুসলিম কালচার কি তেমনি একরঙা একটা জিনিস? তা হলে 'মুসলিম কালচার'এর অর্থ শুধু মুসলিম তত্ত্ববিদ্যা, বড়জোর তার আনুষ্ঠানিক জীবনযাত্রা (রোজা, নমাজ প্রভৃতি পাঁচ ইমান)। অনেকে হয়ত বলবেন—হাঁ, তাই। অনেকে বলবেন —না, আরো আছে। সাধারণভাবে 'মুসলিম কালচার' বলতে আমরা বোঝাই

মুসলমান-জগতের এই ধর্মমত, জীবনযাত্রা (আচার-অনুষ্ঠান) ও তাঁদের নানা সৃষ্টি (চারুশিল্প, কারুকলা, বিজ্ঞান, দর্শন, ইতিহাস প্রভৃতি)। কিন্তু চীন, জাভা, মালয় থেকে বোখারা, মরক্কো, ইস্তাম্বুল, আলবেনিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত 'মুসলমান জগতে' যে, একই জীবন যাত্রা ও সৃষ্টিধারা অব্যাহত নেই, অব্যাহত হয়নি, তা স্পষ্ট। এমন কি খাঁটি আরবেও তা বরাবর এক থাকেনি। খ্রীস্টীয় সপ্তম শতাব্দীর আরব সমাজের ও তখনকার আরব সংস্কৃতির সঙ্গে মুসলিম ধর্ম-মতের ছিল প্রাণের যোগ কিন্তু সেই সপ্তম শতাব্দীর আরব সংস্কৃতি আজ কোথাও অব্যাহত নেই—সৌদি আরবে সেই বিশুদ্ধ ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠার অনেকটা চেষ্টা হয়েছে, কিন্তু এ-কালের সভ্যতার বৈজ্ঞানিক দান, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন্, রেডিয়ো, এরোপ্লেন সবই তাদেরও মেনে নিতে হয়। আজ 'কলে কথা কয়', 'মানুষ ওড়ে'—সপ্তম শতাব্দীর ইসলামের দৃষ্টিতে এ যে গজবের দিন।

আসলে, কালগতিতে কালচার বদ্‌লায়, ধর্মমতও বদলে যায়। আবার দেশভেদেও কালচার, এমন কি ধর্মের অনুশাসনও কিছু-না-কিছু বদলায়। সেই প্রথম দিক্‌কাব খাঁটি ইসলাম যখন উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে তখনো ইসলামী আরব সংস্কৃতি এক-এক নতুন দেশে পদার্পণ করেই আবার কিছুটা পরিবর্তিত হয়েছে। কালক্রমে সেই পরিবর্তন আবার আরো বেড়ে গেল। দেশকাল ব্যতীত শ্রেণীভেদেও যে কালচার বিভিন্ন হয়, তাও স্মরণীয়। ধর্মমতে ইসলাম সমদর্শী; কিন্তু মুসলমান চাষী ও শোষিত মুসলমান আর শোষণবাদী মুসলমান আমীর-ওমরাহের জীবন-যাত্রাও এক নয়, উভয়ের কালচারও কোথাও এক নয়।

প্রকাণ্ড 'মুসলিম জগতের' পরস্পরের মধ্যে যে মিল সে মিল প্রধানত এক কালচারের নয়, এক রিলিজিয়নের। সে মিল ইসলামের—ও ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কিত কিছু কিছু নিয়মনীতির।

রিলিজিয়ন ও কালচার

এই কথাটিই প্রথম বোঝা দরকার—কালচার ও রিলিজিয়ন এক নয়; বরং সম্পর্কিত হলেও দুটি ভিন্ন প্রকৃতির জিনিস। বিভিন্ন অর্থে আমরা কালচার (বা তার অনুবাদ সংস্কৃতি) শব্দটি প্রয়োগ করি। কিন্তু কালচার চির-পরিবর্তনীয় চিরবিকাশশীল। কালচারের প্রকৃতিই হল গতি। জীবিকার

তাগিদে মানুষ হাতিয়ার তৈরীর আর বাক্যরচনার আশ্রয় নিয়ে প্রথম এ-পথে নিজেরই অজ্ঞাতে পা বাড়ায়। হাতিয়ার শক্তি বাড়ায় হাতের, আর বাক্-কৌশল আরো শক্ত করে সামাজিক বন্ধন; প্রকৃতির হাতের পুতুল না থেকে এভাবেই মানুষ করতে থাকে জীবিকার্জন। তারপর সেই সংগ্রামের প্রয়াসের সূত্রে নানা দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জীবনযাত্রার একটি স্তর পেরিয়ে সে চলেছে—বন্য অবস্থা থেকে পৌঁছল সভ্যতার ক্ষেত্রে, সভ্যতার ক্ষেত্রেও কৃষি আর পশুপালনের বিভিন্ন সামাজিক রাজনৈতিক স্তর পেরিয়ে আজ সে এসে পৌঁছেচে শিল্পপ্রধান সভ্যতার স্তরে। সবখানে অবশ্য সব মানুষ এক তালে এগোয়নি—কেউ আজও প্রায় সভ্যতার প্রথম স্তরে, কেউ এখনো কৃষি-পশুচারণার স্তরে। কিন্তু শিল্প-জীবনের ক্ষেত্রেও অনেকেই এসে পৌঁছেচে—আর তারাই দুনিয়ায় প্রধান। অন্যদেব জীবনযাত্রার মুখ সেদিকে—প্রত্যেকেরই কালচার বিকাশ-পথে। এই হল তাই কালচারের মূল কথা: কালচার সর্বব্যাপক—তার বনিয়াদ বাস্তবক্ষেত্রে জীবনযাত্রায়; সেই জীবনের তাগিদেই সে আচার-অনুষ্ঠান গড়ে ভাঙে, বদলায়, সে মানবসম্পদও রচনা করে, বর্জন করে, সৃষ্টি করে। অর্থাৎ কালচার সর্বব্যাপক (all comprehensive) গতিধর্মী (dynamic) এবং সৃষ্টিশীল (creative)।

'রিলিজিয়ন'-এর (যাকে ধর্ম বলা ঠিক সঙ্গত নয়, তবু তা বলেই আমরা কাজ চালাব) প্রকৃতি কিন্তু ভিন্নরূপ। 'রিলিজিয়ন' অবশ্য কালচারের একাংশ। মানুষের জগৎ ও জীবন-বোধ হল তার ইডিয়লজি। সৃষ্টি ও স্রষ্টা সম্বন্ধে যে জিজ্ঞাসা মানুষের মনে জাগে, মোটামুটি তারই নাম হল 'রিলিজিয়ন'; খানিকটা তা তার ইডিয়লজির অন্তর্গত, খানিকটা আচারগত। এই উত্তরে থাকে তাই সমসাময়িক জগৎ ও জীবন-চেতনানুযায়ী তত্ত্বাংশ (জ্ঞানকাণ্ড creed, theology), থাকে সমসাময়িক শ্রেণী-সমাজের উপযোগী আচার-অনুষ্ঠান (কর্মকাণ্ড, rites, rituals); সামাজিক বিধি-ব্যবস্থা (অর্থাৎ laws, socio-political ও personal) ইত্যাদি। এ-সবের সহায়ে সমাজের তখনকার মত বিকাশ সুস্থির ও সুচিন্তিত হয়, প্রায়ই তা দেখা যায়।

কিন্তু জগৎ ও জীব-জিজ্ঞাসা কালে কালে বদলায়, সঙ্গে সঙ্গে বদলায় সৃষ্টি সম্বন্ধে ধারণা। সভ্যতার এক স্তরে যা নিয়ে মানুষের প্রশ্নের ও বিস্ময়ের সীমা থাকে না, অন্য স্তরে পৌঁছে দেখা গেল তা আর বিস্ময়ের নেই। একদিন জগৎ ও জীবন সংবন্ধে যা জ্ঞান ছিল তাতে মনে করতাম—সূর্যই বুঝি স্রষ্টা, নদী

বুঝি দেবী। আবার, পিতৃতান্ত্রিক কোনো কৌমতন্ত্রে হয়তো সকলেই এক সময়ে বুঝতেন—স্ত্রীলোক তুচ্ছ পদার্থ, পুরুষের একখানা হাড় দিয়ে সে গড়া; কিংবা, গাছ-লতার বুঝি প্রাণ নেই। সভ্যতার সেরূপ এক স্তরে তাই সূর্যবন্দনাই ধর্ম, নদীপূজাই ধর্ম। স্ত্রীলোকের যখন রুহ্ নেই তখন সে 'নাপাক' বলেই গণ্য। তেমনি কোনো স্তরে প্রাণী আঁকা বা রূপায়ণ করা যখন হারাম বলে গণ্য তখনো গাছ-লতা-পাতা আঁকাও ইসলামের পক্ষে নিষিদ্ধ হয় না। অর্থাৎ সৃষ্টি ও স্রষ্টার বিষয়ে ধারণা বা 'রিলিজিয়ন' জীবনযাত্রার বা কালচারের এক-একটা স্তরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্পর্কে বাঁধা; এমন কি, বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক ও মানবীয় পরিবেশের দ্বারাও প্রভাবিত। কিন্তু সভ্যতার সে-স্তর উত্তীর্ণ হলে তার ইডিয়লজি বা জগৎ-ও-জীবন-বোধও ক্রমশ বদলে যেতে বাধ্য —কালচারের তা'ই তাগিদ। কিন্তু 'রিলিজিয়ন' চায় সেই বিশেষ এক স্তরের জগৎ-ও-জীবনবোধকে চিরন্তন করে রাখতে। কালচারের এই অংশের ঝোঁকটা হল কালচারেরই গতিকে অস্বীকার করে একটা বিশেষ জগৎ-ও-জীবন-বোধকে 'শাশ্বত', 'সনাতন,' 'ধ্রুব সত্য' বলে আঁকড়ে থাকা। কোনো একটা অতীন্দ্রিয় বা অ-পার্থিব 'সত্যের' নামে রিলিজিয়ন তাই সমসাময়িক কালচারের ধারাকে চায় নিয়ম-কানুন দিয়ে বাঁধতে (codification)।

রিলিজিয়নের লক্ষ্য হল তাই সৃষ্টি নয়, স্থায়িত্ব (conservation); রিলিজিয়ন হল স্থিতিধর্মী (static)। রিলিজিয়ন এই উদ্দেশ্যে জগৎ-চিত্র তৈরী করে, নিয়ম-নীতি রচনা করে, 'কোড' বানায়, সমাজকে সেই বনিয়াদে বেঁধে স্থাণু করতে চায়—যেন কিছুতেই মানুষ 'সনাতন সত্য' থেকে ভ্রষ্ট না হয়। কিন্তু কালচার তার এই প্রয়াসকে অস্বীকার করে এগিয়ে চলে। ফলে, এক যুগের রিলিজিয়ন পরবর্তী যুগের কালচারকে চায় বাধা দিতে, ঠেকিয়ে রাখতে। কিন্তু জীবিকা ও জীবনযাত্রার তাগিদে জগৎ ও জীবন-চেতনা নতুন হয়, কালচার এগিয়ে চলে—খানিকটা হয়তো রিলিজিয়নকে পাশ কাটিয়ে যায়, ফাঁকি দিয়েও চলে। কিন্তু মোটের উপরে সমাজ কোনো স্তরে স্থির হয়ে থাকে না। বরং রিলিজিয়নের পক্ষেই তার সেই বাঁধা কোড্, বাঁধা জগৎ-চিত্র, বাঁধা জীবনযাত্রা বদলাতে হয় বেশি। নানাভাবে জীবন্ত কালের সঙ্গে তাল রেখে রিলিজিয়ন নিজের পুরনো কথাকে ব্যাখ্যার জোরে টিকিয়ে রাখতে চায়—এভাবেই হাদিস্ তৈরী হয়, এইটাই স্মৃতিকারদের কাজ, এতেই তাদের বাহাদুরী—অচল কোড্কে ব্যাখ্যার জোরে টেনেবুনে চালিয়ে-বালিয়ে নেওয়া। বিশেষ করে যে রিলিজিয়ন

যত বেশি স্পষ্ট সে তত বেশিই কোড্-বাঁধা-জিনিস, তার সঙ্গে কালচারেরও তত বাধে দ্বন্দ্ব। তাই যে-ধর্ম আসলে রিলিজিয়ন নয়,—যেমন হিন্দুধর্ম, মূলত তা ভারতবিকশিত বিবিধ ধারার কালচারের একটা সম্মিলিত নাম—তার এদিকে স্থিতি-স্থাপকতা বেশি। কিন্তু তবু তার মধ্যেও যে কতটা গতি-বিমুখিতা আছে তা আমরা বেশ জানি।

যা তাই আমাদের স্মরণীয়, তা এই—রিলিজিয়ন ও কালচারের মধ্যে একটা মৌলিক দ্বন্দ্ব আছে। রিলিজিয়ন অপরিবর্তনীয়, আর কালচার হল বিকাশশীল।

অতএব অস্বীকার করে লাভ নেই, রিলিজিয়ন দিয়ে কোনো কালচারের নামকরণ ঠিক বিজ্ঞানসম্মত নয়।

আরবী কালচারের বিকাশ-ধারা

যে-অর্থেই কালচার কথাটির প্রয়োগ করি, একটা কথা আমরা দেখতে পাব যে, তা আর্থিক, রাষ্ট্রিক প্রভৃতি বাস্তব পরিবেশের তাগিদে চিরদিনই পরিবর্তমান। আরবদেশের কথাই ধরা যাক্। আরবের বিশেষ পরিবেশে ইসলামের উদ্ভব। সেই আরবী সংস্কৃতি ইসলামের প্রেরণায় অভূতপূর্ব বিকাশ লাভ করে। শুধু আরবজাতির অভ্যুদয় দিয়েও যদি ইসলামের প্রাণশক্তির বিচার করা যায়, তা হলেও বিস্ময়ের অবধি থাকে না।

হজরত মহম্মদের মৃত্যুর (৬৩২ খ্রীঃ) একশ বৎসরের মধ্যে পূর্বে ও পশ্চিমে আরব-বিজয়ের ঢেউ যে-ভাবে সমস্ত রাজা, রাজ্য, সভ্যতাকে ভাসিয়ে দেয়, পৃথিবীতে তার তুলনা কম মিলে। নিশ্চয়ই ইসলাম সপ্তম শতাব্দীতে আরবী কৌমগুলোকে একত্র করে নতুন প্রেরণা দেয়, তার সংগঠন জোগায়, প্রগতির দুয়ার আরব-সমাজের পক্ষে উন্মুক্ত করে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে পারে—ইসলামেরও এই উৎপত্তির ও প্রসারেরও যথেষ্ট বাস্তব কারণ সেই সময়কার সেই সমাজের অবস্থাতেই ছিল। অবশ্যই ইসলামের একেশ্বরবাদের উপর আধ্যাত্মিক প্রভাব পড়েছিল আরবের হানিফদের, সেম-জাতীয় য়িহুদীধর্মের আর তখনকার খ্রীস্টধর্মেরও। কিন্তু ইসলামের বাস্তব পরিবেশও স্মরণীয়। স্মরণীয়—দক্ষিণ-আরবের ভৌগোলিক অবস্থান ও বিকাশ। তীর্থযাত্রীর ও বাণিজ্যের কেন্দ্র মক্কা ও মদিনার প্রভাব। নিকট-প্রাচ্যে গ্রীকোরোমক

শাসনপদ্ধতির চরম দুর্বলতা; সেই সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আরব ও অন্যান্য জাতির বিক্ষোভ (আরব-অভ্যুদয়ে তাই এক নিমিষে সেই সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে গেল)। ইত্যাদি। তা ছাড়া, এই ইসলামের ক্রমরূপায়ণের পক্ষে শা'ম ও ফিলিস্তিনের সঙ্গে মক্কা-মদিনার বাণিজ্য-সম্পর্ক; আরব কৌমদের (যেমন কোরেশদের) কৌমী নিয়ম-কানুন, স্বজনবাৎসল্য প্রভৃতিও হজরতের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল। আর যুদ্ধ-বিগ্রহ যখন বাধল তখন উন্নত সামরিক বিদ্যা ও সংগঠন গ্রহণ করতে তিনি একটুও বিলম্ব করেননি—দুর্গ বা কেল্লা গঠন আরবেরাও সেই প্রথম তখন শুরু করে। চীন ও পারস্যের থেকে যুদ্ধে অশ্বারোহী সেনার প্রয়োজন বুঝে তিনি সওয়ার-বাহিনীর উন্নতি করলেন। আর সব থেকে বড় তাঁর দান হল—ইসলামিক সংগঠনের জোরে তিনি এই দুর্ধর্ষ বেদুয়িন দস্যুদের সুশৃঙ্খলিত ও সুগঠিত সৈন্যে পরিণত করতে পারলেন। অর্থাৎ ইসলাম যেমন তার প্রেরণা ছিল, তেমনি he kept his gunpowder dry। [দ্রষ্টব্য: The Material Bases of Islam. The Social Relations of Science—J. G. Crowther.] কিন্তু আমাদের এখানে যা লক্ষণীয় তা এই—এই যে ইসলামের বাস্তব ও আধ্যাত্মিক পরিবেশ, আবর-অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমেই যেমন বদলে যেতে লাগল তখনকার নতুন দীক্ষিত মুসলমান-সমাজেরও সেই পরিবর্তন মেনে নিতে হল, এমন কি ইসলামকেও তদনুযায়ী রীতি-নিয়ম ছেঁটে-কেটে নিতে হল। মরুভূমির বিজেতা আরবেরা শুধু য়িহুদী-খ্রীস্টান ধর্ম নয়, নানা জাতির সম্পর্কে এল; গ্রীক-রোমক সভ্যতার সমৃদ্ধি ও সুসভ্য পৌর জীবন-যাত্রার সৌন্দর্য দেখতে পেল, শহুরে জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের খোঁজ পেল; এসব শহর ও সভ্যতার মারফৎ পেল সেদিনের ঈরানী ও ব্যাবিলনীয় সভ্যতারও দান, এমন কি, পেল ভারতবর্ষেরও শিল্প ও বিজ্ঞানের খোঁজ। ফলে, মরুভূমির সংগ্রামী ইসলাম তেমন উগ্র রইল না, অনেকটা পরমতসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বিজিত বৈভব হাতে পেয়ে আরব রাষ্ট্র নতুন পথঘাট, প্রাসাদ প্রস্তুত করতে লাগল; নতুন বিজয়ের উপযোগী রাষ্ট্র ও শাসন-পদ্ধতিও (Polity) প্রণয়ন করে চলল। হাদিসের ব্যাখ্যায় ইসলামের এরূপ রূপায়ণ বা রূপান্তর তখনই শুরু হয়ে গেছল—কালচারের তাগিদে রিলিজিয়ন নিজের নিয়ম-কানুনও তখনি সংশোধন করতে থাকে। তবু তো তখন পর্যন্ত (৬৬১খ্রীঃ—৭৬১খ্রীঃ) আরব জগতের কেন্দ্র ছিল দামস্কাস্।

৭৬২ থেকে মনসুরের আমলে যখন বোগদাদে আরবী রাজধানী স্থাপিত

হল তখন তো আরবী সভ্যতার আর-এক জীবন আরম্ভ হল। তখন শুরু হয় মুসলমানের-বিজ্ঞান বিজয়। মানে, মুসলমান-ধর্মাবলম্বী আরবদের-ই বিজ্ঞান-অনুশীলন। আব্বাসী আরবদের এই সভ্যতার নিকট পৃথিবী এত ঋণী আর সে-ঋণ এত ভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, আমরা সকলেই তা ইংরেজী লেখার মারফতেও কিছু কিছু জানি (যেমন, The Cambridge Medieval History Vol. II. Chaps. XI-XII; The Legacy of Islam.ed Sir Thomas Arnold, ও Alfred Guillaume; এবং Amir Ali'র History of the Saracens প্রভৃতি)। তখন সেখানে য়িহুদী মশা, আল্লাহ্, ঈরানী জ্যোতির্বিদ নওবক্‌স্ ও ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্ মাম্‌কা প্রভৃতি সাদরে সংবর্ধিত হন। রোজা-নমাজের নিয়ম রাখতে গিয়ে, চান্দ্র মাস ও সৌর বৎসরকে খাপ খাওয়াতে গিয়ে জ্যোতির্বিদ্যা ও মানমন্দিরের প্রসার আরব-জগতে বাড়ে। রোগ-পীড়া, ব্যবসা-বাণিজ্য, জমি-জমা, হিসাব-পত্র এ-সব নিতান্ত বাস্তব কারণেই বিজ্ঞানের উন্নতি হয়—উনানীর (হেকিমীর) ঔষধ, ভেষজ, পীড়া, নিদান, এমনকি, চক্ষু-বিজ্ঞানের পর্যন্ত চর্চা চলল। এলজেব্‌রা বা বীজগণিত প্রণীত হতে লাগল। জ্যামিতি ত্রিকোণমিতি প্রভৃতির প্রসার হল। আলকেমি বা রসায়নের পরীক্ষা চলল (বিশেষ করে স্বর্ণের লোভ ও আয়ুর লোভ Transmutation ও Elixir এ-বিদ্যার পেছনে ছিল বড় তাগিদ)। পূর্তবিদ্যায়, স্থাপত্যে, পুর-নির্মাণে সাম্রাজ্যের সুখস্বাচ্ছন্দ্য ও ঐশ্বর্য ব্যয়িত হতে লাগল। ভূগোল ও ইতিহাসের আদর হল! আর বিস্ময়কর উন্নতি হতে লাগল গণিতের (বোগদাদের প্রধান পণ্ডিত আবুল খোয়াবিজিনি ভারতবর্ষ পর্যন্ত ভ্রমণ করে গিয়েছিলেন—ব্রহ্মগুপ্তের সময়ে ৮৩০ খ্রীঃ কাছাকাছি)। মুসলিম উত্তরাধিকারের বাঁটোয়ারার সমস্যা আর টাকাকড়ি, জমিজমার মাপজোপ ও ব্যবসাবাণিজ্যের হিসাবই ছিল গণিতচর্চার এক প্রধান ব্যবহারিক কারণ। 'অত্যন্ত কাজের কথা' তাদের ভাবতে হত, যেমন, "৩০০ দরহম মূল্যের একটি বাঁদীকে একজন নিজের রোগশয্যায় দান করলে অন্যকে, আরো ১০০ দরহম সে বাঁদীর পণ। গ্রহীতার সঙ্গে বাঁদী সহবাস করে; পরে গ্রহীতার পীড়া হলে গ্রহীতা আবার বাঁদীকে দান করলে দাতার নিকটে। দাতাও তার সঙ্গে সহবাস করছে। কিন্তু এই বাঁদীর সঙ্গে কত দরহম তখন সেই দাতা ফিরে পাবে, কতটা ফিরে পাবে না?" গণিতের সূত্র কষে দেখা গেল—আরবী আইনে দাতা গ্রহীতাকে দেবে ১০২ দরহম, আর গ্রহীতা দাতাকে ২১ দরহম। [এ-রকম প্রয়োজনের স্বীকৃতি

ভাস্করাচার্যের (১২শঃ খ্রীঃ) গণিতেও পাওয়া যায়। যেমন "দাসীর মূল্য ষোড়শ বর্ষেই সর্বাধিক"। তারপর তার বয়স যেমন বৃদ্ধি পায় তার মূল্য সেই অনুপাতে হ্রাস পায়। ষোড়শ বৎসরে তার মূল্য ছিল ২ বৎসরের ৮টি বলদ, সঙ্গে সঙ্গে কষতে হয়েছে খাদ্য ও পারিশ্রমিকের হিসাব; জানা যায় তখন সুদ ছিল শতকরা ২ থেকে ৩॥ গুণ হারে। এভাবেই আরব-সভ্যতায় ব্যবসা-বাণিজ্য ব্যাংক, হুণ্ডি, চেক প্রভৃতি প্রচলিত হয়, যৌথ কারবার দেখা দেয়। এরূপেই আর্থিক প্রয়োজনে আরব-জগতে বিজ্ঞানানুশীলন এগিয়ে যায়।

রিলিজিয়ন হিসাবেও ইসলামের বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, অনেক রিলিজিয়নের মত এরূপ বিজ্ঞানচর্চায়, বাস্তব জীবনের বিকাশে সমাজকে ইস্‌লাম তখন বাধা দেয়নি। তবু ইস্‌লামও বিজ্ঞানের সর্বব্যাপী বিকাশের সহায়ক তখন হয়নি। আরবী কালচার তখনো সেই আরবী রিলিজিয়নের থেকে বাধাও পেয়েছে। ইসলামের 'তাবু' ছিল শরীর-ব্যবচ্ছেদে, প্রাণী-চিত্রাঙ্কনে বা মূর্তি-নির্মাণে। তাই শারীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও প্রকৃতিবিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান ও প্রাণীবিজ্ঞানের গবেষণা আরব সমাজে প্রায় হয়নি। আর চিত্রে স্থাপত্যে আরব জগৎ দরিদ্র হয়ে রইল (ঈরানী, তুর্কী, মুঘল শিল্পীরাই মাত্র তসবির ও পট আঁকতে সাহসী হন)। তা ছাড়া, আরব সাম্রাজ্য পূর্বকার রোমের মত ক্রমেই ক্রীতদাসের উপর বনিয়াদ স্থাপন করলে, আর ক্রমেই সভ্য আরবের বিরাগ জন্মাতে লাগল কায়িক পরিশ্রমের উপর, হাতের কাজের উপর। অন্যদিকে একচ্ছত্র সাম্রাজ্যে ব্যক্তিত্ববিকাশের সুযোগ না থাকায় ব্যবসা-বাণিজ্য ও সৃষ্টিতে উদ্যোগী পুরুষের সমাদর ও স্থান রইল না। এমন কি, মোটের উপর এই কথাটা সত্য যে, সভ্যতার ক্ষেত্রে আরবরা ছিল ব্যবসায়ী মাত্র—পূর্ব ও পশ্চিমের সভ্যতার তারা আড়তদারী করেছে, সৃষ্টি বেশি করেনি; সেদিকে তাদের উদ্যোগ ছিল কম।

মুসলীম জগতে আরবী সভ্যতার প্রভাব

বোগদাদের এই আরব-সভ্যতাও অবশ্য নিছক আরবী নয়—কোনো সভ্যতাই তেমন 'নিছক' কোনো জাতির নয় তা মনে রেখে বলতে পারি, আমরা এই বোগদাদী সভ্যতার ভাবনা-কল্পনার এক ছবি দেখতে পাই 'আরব্য উপন্যাস'

থেকে। তা-ছাড়া নানাদিকে দেখতে পারি, বোগদাদের উপরে প্লেটো বা আফ্লাতুন ও গ্রীকো-রোমক জগৎ, ভারতীয় জগৎ, ঈরান-ব্যাবিলনের দর্শন ও চিন্তার দান কেমন ভীড় করে আসছিল। মুসলমান আরব সভ্যতাও যে স্থাণু ছিল না, তা এসব থেকে আমরা বুঝতে পারি।

প্রধানত এই আরবী কালচারই আরবী ভাষার মারফৎ নানা দেশের মুসলমানদের উপর প্রভাব বিস্তার করে—অবশ্য আরব কালচারের অন্য কেন্দ্র ছিল যে, স্পেনে (কর্দোভা-গ্রানাডা) সীরিয়ায়, মিশরে এবং পরবর্তীকালে নানা ছোট-বড় কেন্দ্রেও তার অন্যান্য রূপ বিকশিত হয়, তা আমরা জানি। এই কথাও আমরা বুঝি, ভারতবর্ষের মুসলমানরা এই নিছক আরবী কালচারের উত্তরাধিকার পাননি, ঈরানী ও তুর্কী জাতিদের সঙ্গে তা মিশে তরঙ্গের পর তরঙ্গে নানা পরিবর্তিত রূপে ভরতবর্ষে এসেছিল। তারপর এ-দেশের বিবিধ ক্ষেত্রে তা বিবিধ স্থানীয় দানকেও গ্রহণ করেছে আবার যুগে যুগেও পরিবর্তিত হয়েছে। ভারতীয় মুসলমানদের দরবারী কাল্‌চারের রূপটিও ছিল এরূপ আরবী-ঈরানী তুর্কী মিশ্রিত ভারতীয় রূপ—প্রধানত তা ফার্সি। আর তার লৌকিক রূপ ছিল আরো সহজ, এবং প্রত্যেক ভাষা ও প্রদেশের ছাঁচে আরো বেশি ঢালা। তার একদিকে ছিল সূফী ও সাধকদের অধ্যাত্ম-প্রভাব, অন্য দিকে জীবনের দশ আনা জুড়েই ছিল গতানুগতিক লোক-জীবনের আচার-নিয়ম-অনুষ্ঠানের চিরাগত ধারা—যাতে পিতৃপূজা হয়ে উঠে স্তূপ-পূজা, আর স্তূপ হয়ে থাকে পীরের দরগা; যাতে সত্যপীর আর সত্যনারায়ণ মিলে যান; কালুরায় ও দক্ষিণারায় পূজা পান; মুসলমান এসে দেয় গাছতলায় তেল-সিঁদুর, আর হিন্দু এসে নেয় মসজিদের জলপড়া; ইত্যাদি, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

কিন্তু বহিরাগত মুসলমানের মারফৎ ভারতীয় সমাজ কি অধ্যাত্ম বা বাস্তব সম্পদ লাভ করে, কিংবা এই বহিরাগত মুসলমানধর্ম ভারতের প্রান্তে প্রান্তে কি নতুন নতুন রূপ গ্রহণ করল, এখানে তার বিশ্লেষণ বা বর্ণন নিষ্প্রয়োজন। আমার বক্তব্য শুধু এই—সেই তথাকথিত 'মুসলমান কালচার' স্থান ও কাল ভেদে নানা দেশে নানারূপে বিকাশ পেয়েছে। আরব জাতিদের মধ্যেও তা পেয়েছে, ভারতীয় জাতিদের মধ্যেও পেয়েছে। আরব জাতিদের মধ্যেও বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন যুগে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়েছে। তবে আরবী ভাষার বন্ধনে তাদের একটা সুদৃঢ় বন্ধন ছিল; তাই মোটামুটি বোগদাদ, কাইরো কি সুদূর মরক্কো বা প্রাচীন স্পেনের কালচারকে

একই আরবী কালচারের বিভিন্ন শাখা ও বিভিন্ন স্তর বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। মুসলিম জগতের পশ্চিমভাগে মোটামুটি এই আরবীমণ্ডলের ছায়া এখনো অটুট আছে।

অবশ্য ইসলামের সূত্রে সেই আরবী কালচারেরই প্রভাব মুসলিম-জগতের অন্যান্য দেশের মুসলমানদের উপর পড়েছে—ইসলামের সঙ্গে সঙ্গে লেগেছে আরবীর ছাপ। তবু বলা উচিত মুসলিম-ঈরানের কালচারই মুসলিম-জগতের মধ্য-এশিয়া ও দক্ষিণাংশে ব্যাপ্ত হয়—সেদিকটা তার ঈরানীমণ্ডল। নিশ্চই মুসলিম ঈরানের কালচার আরবী কালচার থেকে স্বতন্ত্র—তা ফিরদৌসীর পাতা থেকেও বুঝতে পারা যায়; ঈরানমণ্ডলের চিত্রকলার ও ললিতকলার বিকাশ থেকেও উপলব্ধি করা যায়; আর 'সিয়া'ধর্মকে কেন্দ্র করে বা সুফীসাধনাকে আশ্রয় করে যে-ঈরানী সভ্যতা গড়ে উঠে তার থেকেও আমরা বেশ প্রত্যক্ষ করতে পারি। সমস্ত মধ্য-প্রাচ্যের তুর্কিস্থানে তুর্ক-জাতিক পাঠান মুঘলদের মধ্যে এই ঈরানী ভাষার ও ঈরানী কালচারের প্রসারই মধ্যযুগে বাড়ে, তুর্ক আজারবাইজানের নিজামী এই ভাষাতেই লেখেন তাঁর কাব্য। এই মধ্য প্রাচ্যকে সে-যুগের কালচারের ঈরানীমণ্ডল বললেও তাই অন্যায় হবে না। কিন্তু আরবী, ঈরানী এই দুই মণ্ডলেরই অনেকাংশে বাইরে তবু যবদ্বীপের, মালয়ের চীনের মুসলমান-জীবন, তাও স্মরণীয়। বলা বাহুল্য, ইস্তাম্বুলকে কেন্দ্র করে তুর্কীরা আরবী-ছোপানো ঈরানী প্রভাবিত কালচার নিয়ে বহু বৎসরের মত ঘোরপাক খায়। প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগে সেই আরব-ঈরানী কালচারের উত্তরাধিকার গিয়ে পড়েছিল এই তুর্কভাষী ওস্‌মান আলী খলিফাদের হাতে। এই ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন-ভাষাভাষীদের মধ্যে মধ্যযুগীয় আর্থিক-মানসিক গণ্ডির মধ্যে পড়ে সে কালচার স্বভাবতই ক্রমেই স্তিমিত হয়ে এল। যা-কিছু তার বিকাশ একালে ঘটে, তা আরবীর ঘটে, প্রধানত তা ঘটে আরবীভাষী জগতেই—মিশরে এবং আংশিকভাবে সীরিয়ায়। আরবী-ঈরানীর বিকাশ ঘটে ঈরানে তুর্কিস্তানে এমন কি ভারতের মুঘলযুগে।

১ আধুনিক মুসলিম সংস্কৃতি

মধ্যযুগ পর্যন্ত এভাবেই যায়। মধ্যযুগ শেষ হয় জাতীয় চেতনা জাগলে। তখন ধর্মগত কালচার ছেড়ে জাতিগত কালচারেরই বিকাশ আরম্ভ হয়। অথচ তুর্কীতে তুর্কের স্বকীয় কালচার এই ধর্মগত কালচারের আওতায়,—সেই ভাব-সংকটে,—তুর্ক জাতীয় জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে তুর্করা সৃষ্টি করতে বিশেষ পারেনি —ইস্লামের মাধ্যমে তৈরী আরবী-ঈরানী ভাব-নিগড়ে তাদের মন তখনো নিবদ্ধ। মধ্যযুগের সেই 'মুসলিম কালচারের' সেই মোহপাশ কাটিয়ে কামালের নতুন তুর্কী আধুনিক কালের উপযোগী তুর্ক-কালচারের বনিয়াদ প্রতিষ্ঠা করতে আজ চেষ্টা করছে। আধুনিক কালের এই স্তরে প্রায় প্রত্যেক মুসলিম জাতিই-তার স্ব স্ব জাতিগত কালচারের বনিয়াদ নতুন করে স্থাপিত করছে—মিশর-মরক্কো থেকে ঈরান পর্যন্ত এটাই ছিল প্রথম মহাযুদ্ধের পরে মুসলিম-জগতের মুসলিম কালচারের সবচেয়ে বড় লক্ষণ—সচেতনভাবে জাতির বনিয়াদে আরবী-ঈরানী-তুরানী প্রভৃতি জাতিদের নিজ নিজ নতুন সংস্কৃতি সংগঠনের প্রয়াস।

সে লক্ষণ বেশি প্রস্ফুট হতে পেরেছে মধ্য-এশিয়ার তুর্ক ও ফারসীভাষী জাতিদের সোভিয়েট বিপ্লবের ফলে স্বাধীনতালাভে, আত্মপ্রতিষ্ঠায়। তাতার উজবেক- কাজাক, আজারবৈজানী এমন কি তাজিক, তুর্কমেন, কির্ঘিজ, দাগিস্তানী প্রভৃতি মুসলমান জাতিরা নিজেদের ভাষার মারফৎ নিজেদের সাংস্কৃতিক জীবন গঠনের তখন সুযোগ লাভ করলে ; আর নিজ নিজ জাতীয় সংস্কৃতি তারা গড়তে পারলে আধুনিক শিল্প-বিজ্ঞানের বনিয়াদের উপরে, বিজ্ঞান-সম্মত সমাজ-ব্যবস্থার আওতায়। 'মুসলিম কালচারের' সবচেয়ে সম্ভাবনাময় নির্দেশ ও সত্যকার সাক্ষ্য মুসলীম জগৎ দেখতে পায় আজ সোভিয়েট মধ্য এশিয়ার এসব মুসলমান জাতির জীবন ও এদের বিকাশের ধারা থেকে—সে ইঙ্গিত যে মুসলিম জাতিদের চক্ষে বৃথা হয়নি তারই প্রমাণ দেখছি ঈরানের আজরবৈজানী ও মধ্যপ্রাচ্যের কুর্দিস্তানের কুর্দদের বর্তমান জাগরণ থেকে।

রিলিজিয়ন ও কালচারের মূলগত সম্পর্ক ও বিরোধ, মধ্যযুগের বিভিন্ন মুসলিম কেন্দ্রের বিভিন্ন কালচারের সাক্ষ্য, এবং মুসলিম জাতির এই বর্তমান গতি-লক্ষণ, এসব দেখে নিশ্চই আমরা বুঝতে পারি ভারতবর্ষেও বাঙালী মুসলমানের, তাহলে নিজস্ব কালচার কি—তা আরবী কালচারও নয়, উর্দু

কালচারও নয়। তা এই বাঙলা কালচার—তার মধ্য দিয়েই বাঙালী মুসলমান আপনাকে বিকাশ করতে পারবেন, আর তাকে বিকশিত করে তোলাও তাঁর দায়িত্ব—যেমন দায়িত্ব তা বাঙালী হিন্দুরও।

যে-কারণে পৃথিবীর অন্যান্য মুসলমান-দেশের সামাজিক অগ্রগতির দৃষ্টান্ত ভারতীয় মুসলমান-বন্ধুদের উদ্‌বুদ্ধ করলেও এ-দেশে তাঁদের কর্মে সে সামাজিক বিপ্লবী শিক্ষা প্রযোজ্য হয়ে উঠে না, আমি তা বিস্মৃত হইনি। কারণ, ঈরানে, তুর্কীস্থানে, মিশরে মুসলমান-ধর্মীরাই প্রায় শতকরা পঁচানব্বুই জন; কিন্তু ভারতবর্ষে সাত শত বৎসরেও ইসলাম হিন্দুধর্মীদের সংখ্যা বা প্রভাব খর্ব করতে পারেনি। এখানকার মুসলমান বন্ধুরা সেই আশঙ্কার বশেই, "ফিয়ার কম্‌প্লেক্‌স"-এর প্রভাবে হিন্দুদের আর্থিক মানসিক প্রভাব প্রতিপত্তির ভয়ে—ইসলাম বা 'মুসলিম কালচারের' উপর অতটা জোর দেন—নিতান্ত আত্মরক্ষার দায়ে, আশঙ্কার বশে। এজন্যই তাঁদের সংস্কৃতি-সংকট আরো জটিল হয়ে উঠেছে। তাঁরা একই-কালে মধ্যযুগের আরবী-সভ্যতাকে গ্রহণ করতে চান, ঈরানী-সভ্যতাকেও গ্রহণ করতে চান, ভারতবর্ষের বিভিন্ন কেন্দ্রে মুসলমান শাসনে ভারত-সভ্যতা যে বিভিন্ন বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ করেছে তাও গ্রহণ করতে চান—আবার গ্রহণ করতে চান ইউরোপের বুর্জোয়া জ্ঞানবিজ্ঞান। কিন্তু এ-কথাই বা তাঁরা অস্বীকার করবেন কি করে যে,বাঙালী-মুসলমান বাঙালীর কালচারেরই উত্তরাধিকারী, তারই ধারক, তারই বাহক—তারই স্রষ্টা সে ছিল কালও, থাকবে আগামী কালও।

মুসলমান বাঙালীর কালচার

সাতশ' বৎসর হল মুসলমান ধর্ম বাঙলা দেশে এসেছে। তখন থেকেই বাঙলার ইতিহাসে মধ্যযুগ শুরু হয়। এ বিষয়ে সন্দেহ নেই বিজয়ীর ধর্ম হিসাবে এলেও বিজয়ী বিদেশীরা সংখ্যায় নিশ্চয় মুষ্টিমেয় ছিলেন। আসলে বাঙালী মুসলমান বাঙলা দেশেরই মানুষ; যাঁরা মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন, তাঁদের সন্তানসন্ততি। নানা কারণেই বাঙালী জনসাধারণের এক বৃহদংশ এ ধর্ম প্রথমাবধি গ্রহণ করেন। সে সব কারণের কিছু কিছু প্রমাণ আমরা পাই পুরনো পুঁথিপত্র থেকে, যেমন, শূন্য পুরাণে 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'। মোটামুটি বুঝতে পারি—বিজেতার ধর্মের স্বাভাবিক মর্যাদা দরিদ্রদের আকৃষ্ট করেছে; তখনকার হিন্দু অভিজাতদের আধিপত্য ও হিন্দু সমাজের উৎপীড়ন থেকে দরিদ্র নিপীড়িতরা এই রাজধর্ম গ্রহণ করে মুক্তিপথ খুঁজেছেন। বিশেষত, ধর্ম হিসাবে ইস্‌লাম সাম্যের পক্ষপাতি; অন্য দিকে হিন্দুধর্ম বৈষম্য ও অধিকারভেদের উপর গঠিত। কিন্তু তখনকার হিন্দু সামন্ত অভিজাতরা কিছু কিছু মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে থাক্‌বেন। তার প্রমাণও আছে। ইস্‌লাম তখন রাজধর্ম—জায়গীরদার, আমীর-ওমরাহের ধর্ম; মুসলমান অভিজাতদের সঙ্গে হিন্দু অভিজাতদের শ্রেণীগত মিল ও একত্ব ক্রমেই তাদের পরস্পরের নিকট করে তোলে; ধর্মগত ভেদ এই উভয় জাতির অভিজাতদের পরস্পরের নিকট মোটেই দুস্তর মনে হয়নি।

মধ্যযুগের বাঙালী শ্রেণী-বিন্যাস

ইস্‌লাম সেদিন মুসলমান মাত্রকেই কতকগুলো খাওয়া-পরার আচার-বিচারের কড়াকড়ি (টোটেম, তাবু) থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং ধর্মের খাস জমায়েতে সকল মুসলমানকে সমতা দিয়েছে। "সব্বই জুঠ জব্বেই খাই' ('কীর্তিলতা') দেখে বিদ্যাপতি নিশ্চয় ঘৃণা বোধ করেন। "এক রুটি পাইলে হাজার মিঞা খায়" এ দৃশ্য দেখ্‌তে দেখ্‌তে বোধ হয় রূপরাম (১৭শ শতকে) একটু হিংসাই করতেন। কিন্তু ইস্‌লাম সুলতান, জায়গীরদার, আমীর-ওমরাহের ধর্ম; যতই ধর্মক্ষেত্রে সাধারণ মুসলমানকে সমান দেখুক, বৈষয়িক ব্যাপারে দরিদ্র মুসলমানদের রক্ষার বিশেষ উপায় তা করেনি। তাই জীবনযাত্রায় মুসলমান নিম্নশ্রেণী হিন্দু নিম্নশ্রেণীর মতই নিচের তলায় পড়ে থাক্‌ত, মুসলমান অভিজাত যেমন থাকত হিন্দু অভিজাতেরও একধাপ বেশি উপরে উপরতলায়।

আর-একটা কথাও বোধ হয় সত্য। বাঙালী মুসলমান সমাজে একদিকে ছিল এই সামন্ত অভিজাতরা, অন্য দিকে ছিল এই সাধারণ মুসলমানরা। এদের মধ্যখানে মধ্যবিত্ত মুসলমান বোধ হয় বেশি বিস্তারলাভ করতে পারেনি। হয়ত হিন্দু সমাজের মধ্যে সে তুলনায় মধ্যবিত্তের সংখ্যা ও প্রভাব সে যুগেও বেশি ছিল। কারণ, মুসলিম কোনো কারণে (যেমন রাজ কার্যের, বিচার, দপ্তর, ফৌজের ছোট আমলা হয়ে, ব্যবসাসূত্রে) মধ্যবিত্তের কোঠায় উঠ্‌লে সহজেই অভিজাতের পদবীতেও উঠে যেতে পারত। হিন্দু ছোট কর্মচারী বা বৃত্তিধারীরা (দোকানী, পশারী ও কবিরাজ, পণ্ডিত, ছোট মুন্সি, কেরানী 'কায়স্থ' প্রভৃতি) অত সহজে সে পর্যায় উঠ্‌তে পারত না। দ্বিতীয়ত মুসলমান উত্তরাধিকার আইন ও অনেকাংশে মুসলমানী জীবনযাত্রা পদ্ধতি, আয়েসি মনোভাব ও অভ্যাস সহজেই অবস্থাপন্ন মুসলমান মধ্যবিত্তকে টেনে নিচে নামিয়ে আনত। এই মধ্যবিত্ত মুসলমান যাঁরা থাকতেন, তাঁরাও ফার্সী চর্চা করতেন। তাই মধ্যবিত্ত মুসলমানের অভাবেই (মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র, ঘনরাম থেকে কাশীদাশ পর্যন্ত হিন্দুদের মধ্যে যাদের দেখ্‌তে পাই) বাঙালী মুসলমানের মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতিতেও প্রাধান্য লাভ না করার একটি বড় কারণ।

আসল কথা বাঙালী মুসলমান সমাজেরও মোটামুটি রূপটি ছিল এরূপ—প্রধানত অভিজাত ও জনগণ, শাসক ও শাসিত নিয়েই সে সমাজ। মধ্যযুগের

সকল শাসিতের মত মুসলমান জনগণেরও অত্যাচার সইতেই হত। উপরতলার শাসকরা তো ছিলেনই, এমন কি, তাঁদের অনুচর ও সহচররাও ছিল। যেমন দেখি, তুরুক সওয়ার "চলল হাট ভমি ফের মাঙ্গই" ('কীর্তিলতা')—হাটে এসে ঘুরে ঘুরে তোলা তোলে; দরবেশেরা 'দোয়া' জানায়, তার বদলে ভেট না পেলেই গাল দিয়ে যায় ('কীর্তিলতা'), ইত্যাদি।

বাঙালী জীবনযাত্রায় মুসলমানের স্থান

সমাজের আর্থিক কাঠামো তখন এরূপ। জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে উৎপাদক হিসাবে শ্রমসাধ্য অনেক কাজেই তখনো সম্ভবত এই মুসলান জনগণ অগ্রগণ্য ছিলেন। পূর্ববর্তী হিন্দুযুগেও হিন্দু নিম্নবর্ণ বা বৌদ্ধ নিম্নবর্ণ হিসাবে তাঁরাই সমাজের এ ভার বইতেন, মুসলমান আমলেও তাঁরাই সে ভার বহন করতেন। বরং মুসলমানরা কোনো কোনো নতুন কারিগরী কাজ যা প্রচলিত করেন (যেমন দর্জির ? সূক্ষ্ম বস্ত্রশিল্পের ?) তাতে এই পরিশ্রমী সাধারণ মুসলমানই (জোলা, রাজমিস্ত্রী, খালাসী, সূচীশিল্পী ইত্যাদি) নিজেদের শ্রম ও দক্ষতার পরিচয় দিতেন। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, অনেক শিল্প ও কারুকর্ম আবার হিন্দু (যেমন তাঁতী, কামার, মিস্ত্রী, কাঁসারি, শাঁখারি ইত্যাদি) কারিগরদেরই একচেটিয়া থেকে যায়।

তবু বাস্তব ধনসৃষ্টির ক্ষেত্রে, কৃষি ও কারুশিল্পে, শ্রমসাধ্য কর্মে মুসলমান জনগণ এখন বাঙলার জীবনে মুখ্যস্থান জুড়ে আছেন। মধ্যযুগেও সম্ভবত শ্রমসাধ্য কারুশিল্পে তাঁরা প্রধান ছিলেন। কিন্তু মানস-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, সাহিত্য ও চারুশিল্পে বাঙালী হিন্দু যতটা প্রাধান্য অর্জন করেন বাঙালী মুসলমান মধ্যযুগেও ততটা প্রাধান্য অর্জন করতে পারেননি, এরূপই মনে হয়। তার কারণ, তখনকার দিনে মুসলমান জ্ঞানী ও গুণীরা আরবী ফার্সিরই বেশি চর্চা করতেন। আরবীর থেকেও ফার্সিরই চর্চা বেশি হত; বিশেষ করে ফার্সির মারফৎই তাঁরা রসিক সমাজে নিজেদের পরিচয় দিতে চাইতেন। কিন্তু এ-কথা গুণী ও 'দানেশমন্দ' এবং অভিজাত মুসলমানদের সম্বন্ধেই সত্য। পরবর্তী সময়ে উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুরাও ফার্সি চর্চা করতেন, যেমন মালাধর বসু, রূপ সনাতন। তবু তাঁরা যেমন বাঙলা লিখতেন তেমনি আলাওল, দৌলত কাজী প্রভৃতিও বাঙলা লিখেছেন,—তাও স্মরণীয়। তখন জানি ব্রাহ্মণেও দাড়ি রাখছে,

ফারসী পড়ছে, মোজা পায় দেয়, কামান ধরে, কেউ বা মস্‌নবিও আবৃত্তি করে (জয়ানন্দ)। অর্থাৎ অভিজাতদের জীবনযাত্রা যেমন আসলে একই ধরনের হয়ে ওঠে, শাসিত ও শোষিতদের জীবনযাত্রাও তেমনি আবার একই পল্লী সভ্যতায়, কৃষি-জীবনের কারুকর্মে ব্যবসায়ে আসলে একই ধরনের হয়ে উঠ্‌ত। নিশ্চয়ই পীর, কাজী, মওলবী, দরবেশদের চেষ্টায় এরূপ সাধারণ মুসলমানও ইস্‌লামের মূলতত্ত্বে খানিকটা অধিগত হতেন; তাঁরা ক্রমেই বেশি করে সে তত্ত্ব অবগতও হচ্ছিলেন। অবশ্য শিক্ষা-দীক্ষায় ইস্‌লামের যে ভাষ্য তারা বেশি পেত—হানিফী সুন্নী হলেও, সে ভাষ্য হচ্ছে ঈরানী বা ফার্সি ইস্‌লামের ভাষ্য। কিন্তু জীবনযাত্রায়, আগেকার পার্বণের, উৎসবের অনুষ্ঠানের মায়া তাঁরা একেবারে কাটাতে পারেননি; এমন কি মুসলমান অভিজাতরাও তা খানিকটা মানতেন। 'আদর্শ' মুসলমান গ্রামের চিত্র মুকুন্দরাম অঙ্কিত করেছেন, কিন্তু সে হচ্ছে আদর্শ হিন্দু গ্রামের মতই 'আদর্শ'। কারণ, সাধারণ মুসলমান 'অনুদিন কোরান পড়ত' না, সকলেই 'বড়ই দানেশমন্দ' যে ছিল তাও না, তা বলাই বাহুল্য। তাঁরাও সাধারণ হিন্দুর মত ছিলেন নিরক্ষর, অত্যাচারিত; গাইতেন জারি, সারি, ভাসান, কীর্তন প্রভৃতি।

মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতি

মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির মোট রূপটা এখন লক্ষ্য করি। প্রথম কথা, তখনকার বাঙালী সমাজ ছিল কৃষিজীবী, পল্লিসমাজ,—ভারতবর্ষের একটি প্রাদেশিক 'কৃষ্টির' অধিকারিমাত্র। (১) স্থাপত্যে তার দান গৌড়-পাণ্ডুয়ার পরে আর মুসলমান রাজশক্তিও বেশি রেখে যাননি। (২) ভাস্কর্যে, চিত্রকলায় মুসলমানী যুগে ইস্‌লামের প্রতিকূলতায় স্বভাবতই রূপ-অনুশীলনে মন্দা দেখা যায়; (৩) সংগীতে-নৃত্যেও (এক বিষ্ণুপুরে ছাড়া) বাঙলায় কোনো বৃহৎ কিছু গড়ে ওঠেনি। ইস্‌লামের প্রভাব এদিকে বাঙালী সংগীত ও বাঙালী নৃত্যকলার পক্ষে বাধাই হয়ে থাকৃত—যদিও লোক-সংগীত ও লোক-নৃত্য লোকসমাজে চলছিল; কীর্তন বৈষ্ণব সমাজে প্রসারলাভ করছিল। (৪) বাংলা সাহিত্যেই আসলে মধ্যযুগের বাঙালী মানসসৃষ্টির বেশি পরিচয় পাওয়া যায়। সেখানে দেখি যে এ-সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানে বেশি পার্থক্য নেই। সাধারণত এই সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে হিন্দুরাই অগ্রণী। কিন্তু লোক-সাহিত্যে মুসলমানরা প্রধান, আর আউল-বাউলের অধ্যাত্ম সংগীতেও তাঁদের

দান প্রচুর। (৫) জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য চর্চায় বাঙালী জাত তখনো মুখ্য কিছু করেনি—হিন্দুদের মধ্যে সংস্কৃতের মারফৎ ন্যায়ের চর্চা হত, স্মৃতির তর্ক হত, জ্যোতিষ ব্যাকরণও ছিল। মুসলমানদের মধ্যেও আরবী-ফারসীর মারফৎ কোরান, হদিস, ধর্মতত্ত্ব; তাদের দর্শন, তাদের ইতিহাস, এ-সবের চর্চা হত। কিন্তু ফার্সি সভ্যতার ঐতিহ্য নিয়েই যা কিছু চর্চা হত, আরব সভ্যতার সেই বিজ্ঞানানুশীলনের ঐতিহ্য কিংবা ভূগোলের, ইতিহাসের জ্ঞান সংগ্রহের চেষ্টা বাঙলা দেশে তখন কতটা বা কোথায় ছিল?

মধ্যযুগের বাঙলায় মুসলমানের দান

মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধানতম সৃষ্টি পাই সে-যুগের বাঙলা সাহিত্যে। তার প্রধান ক্ষেত্র ছিল তিনটি: (১) স্বভাবতই সে-যুগে ফার্সিনবিশ ও ফার্সি কলাকৌশল ফার্সি-জানা গুণিজনদের আদরণীয় হত। দরবারেও এ সবেরই ছিল প্রসার। কিন্তু মুসলমান দরবারী কেন্দ্র থেকে বাঙলা অনেক দূর; দিল্লী, জৌনপুরের হাওয়াও এখানে অনেক দেরীতে পৌছত। বাঙলার সুলতান আমীর ওমরাহদেরও তাই বাঙালী বনে যেতে হত। তাই গৌড়ের দরবারে, রোসাঙ্গের রাজসভায়, লস্কর পরাগল খাঁর বৈঠকে মুসলমান শাসকও এ দেশের মহাভারত, রামায়ণ ও নানা পুরাণ ইতিহাসের চর্চার উৎসাহ দিতেন। হিন্দু গুণীরা তাতে যোগ দিলেন, মুসলমান গুণীরাও তা উপেক্ষা করলেন না। অবশ্য দু'-এক জনই তেমন গুণী ও দরবারী লোক বাঙলা ভাষারও এরূপ চর্চা করেছেন, যেমন দৌলত কাজী, আলাওল, সৈয়দ সুলতান, মোহম্মদ খান ইত্যাদি। তাঁদের কল্পনা ফার্সি জিন পরীদেরও ক্রমে ক্রমে এদেশের দেবদেবীর মত স্বচ্ছন্দ করে তুলল। এঁরা বাঙলা সাহিত্যের নমস্য লোক। এঁদের কাব্য মধ্যযুগের কাব্যের সুরে বাঁধা—হিন্দু বা মুসলমানী বলে বিশেষ আখ্যা সে মধ্যযুগের কাব্যকে দেওয়া নিরর্থক। তেমনি এই দরবারী সাহিত্যসেবীদের ছাড়াও নানা অদ্ভুত বীরত্ব ও রোমান্স কেন্দ্র করে চলে পুঁথি-সাহিত্য। ক্রমশই তাও বড় হয়েছে। (২) দ্বিতীয়ত কবি সাধকদেরও স্পষ্ট একটা কাব্যধারা ছিল। তাঁরা সুফীবাদ থেকে প্রেরণা নিচ্ছিলেন। আরবী-ফারসী-সুফী কবিতার সঙ্গে তাঁদের পরিচয় থাকার কথা। আবার অনেকদের যে এ-দেশীয় রহস্যবাদের (শৈব ও বৈষ্ণবতন্ত্র সহজিয়া) ও যোগ

রহস্যের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা ছিল তাও স্পষ্ট। যেমন, সৈয়দমুর্তাজা, আলীরাজা প্রভৃতি।

প্রসঙ্গত মনে রাখতে পারি—মধ্যযুগেই ইউরোপ-এশিয়ার বহু দেশের শ্রেষ্ঠ মানুষরা পৃথিবীর অত্যাচার-নিপীড়নের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে স্বভাবতই এই আধ্যাত্মিক পথে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার সন্ধান করতেন। সেদিনের বাস্তব দুঃখের বিরুদ্ধে এই ছিল মানব-চিত্তের একমাত্র পরিচিত ও স্বাভাবিক প্রতিবাদ-প্রতিরোধের পথ। খ্রীস্টান মিস্টিক, মুসলমান স্ফী আর ভারতের নানক, কবীর থেকে বৈষ্ণব আউল, বাউল, দরবেশ প্রভৃতি সকলে আসলে সমস্ত মধ্যযুগের ভেতরকার বিপ্লবী চেতনার প্রকাশ। এঁরা প্রত্যেক 'অর্থোডক্স্' রিলিজিয়ন-এরই বিরুদ্ধেও বিদ্রোহী—আধ্যাত্মিকতার কারণেই। স্ফীবাদ সেই ইস্‌লাম-বিদ্রোহী মানুষেরই দান। তাঁদের এই ঈরানী-হিন্দী ধারা এসে মেশে এ-দেশের পুরনো সহজিয়া (বৌদ্ধ, শাক্ত ও বৈষ্ণব) ঐতিহ্যের সঙ্গে। বাঙলার মধ্যযুগের কবিতায় একটি প্রধান দানই এঁদের—আর এঁদেরও অনেকেই মুসলমান, লালনসাহ থেকে মদন বাউল পর্যন্ত। মধ্যযুগের এই কবি-সাধকদের ধারায়ও হিন্দু মুসলমান ভেদ করতে যাওয়া অসম্ভব। (৩) এ ছাড়াও বাঙলা সাহিত্যের একটি ক্ষেত্র ছিল লৌকিক গান, কবিতা, ছড়া। বলা বাহুল্য, এই হিন্দু মুসলমান জনগণ লৌকিক জীবন-যাত্রায় এতই অভিন্ন ছিলেন যে, এ সব ব্যালাড, বা সারি, জারি, ভাটিয়ালী প্রভৃতি রচনার ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান বলে কোনো তফাৎ করা যায় না। বরং যতদুর মনে হয়—জনসাধারণ যখন প্রধানত মুসলমানই ছিলেন (হঠাৎ উনবিংশ শতাব্দের শেষে বাঙলায় মুসলমান সংখ্যায় বেড়ে যায়নি নিশ্চয়ই) তখন এই লোক-কাব্য, লোক-সংগীত ও লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই তাঁদেরই হাত থাকত বেশি—এখনো তাই আছে অনেকখানে, অনেক দিকে।

মধ্যযুগের ত্রিধারা

মধ্যযুগের বাঙলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি হিন্দু মুসলমানের দানে মোটামুটি যে রূপ গ্রহণ করেছিল এবার তা স্মরণ করতে পারি : (১) হিন্দু-মুসলমানের যৌথ স্বষ্টিতে বাঙলা সংস্কৃতি গঠিত, বিকশিত ; মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধানাংশ তাই যৌথ স্বষ্টি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এরই ছ'টি গৌণ ধারাও আছে ; (২) যেমন, একদিকে

"মুস্‌লিম ঐতিহ্যের" ধারা। কোরান ও হাদিস নিয়ে এবং আরবী-ঈরানী-তুরানী প্রভৃতি মিশ্রিত ধর্মকাহিনী নিয়ে এই ঐতিহ্য। তবে বিশেষ করে ইস্‌লাম, শরিয়ৎ তার আচার-বিচার সম্পর্কিত কথাই তাতে প্রধান। (৩) আবার যৌথ সংস্কৃতির অন্ত পার্শ্বে তেমনি ছিল "হিন্দু ঐতিহ্যের ধারা"ও। হিন্দু দর্শন, পুরাণ, আচার-বিচার প্রভৃতি নিয়ে এই ঐতিহ্য গঠিত। কিন্তু প্রধান কথা এই : মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রধান ও প্রশস্ত কোঠাটি সমস্ত বাঙালীর যৌথ সৃষ্টি ; তার বনিয়াদ সমস্ত বাঙালী জনতার যৌথ-জীবন।

বাঙলার এই মধ্যযুগ শেষ হয়ে গেল ইংরেজ বিজয়ে ; সঙ্গে সঙ্গে এই বাঙালী সংস্কৃতিরও প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে গেল। এই যৌথ-সংস্কৃতির উত্তরাধিকার যা, তা অবজ্ঞাত হল ; বৃদ্ধি পেল আপাতদৃষ্টিতে শুধুমাত্র হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্কীর্ণ ধারা। আসলে বিচার করলে দেখব, তাও সত্যই বৃদ্ধি পায়নি। কিন্তু তার পূর্বে বুঝা দরকার—ইংজের বিজয়ে ও ইংরেজ শাসনের সময়ে বাঙলার সমাজ-যাত্রায় কি পরিবর্তন ঘট্‌ল। তা'ই আধুনিক বাঙালী কালচারের জন্ম-বিচার। এখানে সংক্ষেপে তার জন্মপত্রিকার চিত্রটুকু দিলেই যথেষ্ট হবে।

ইংরেজ শাসন ও মুসলমান বিক্ষোভ

প্রথমত, নবাবী আমল যখন শেষ হয়ে গেল তখন মুসলমান-মাত্রই আহত হয়েছেন ও ইংরেজের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পোষণ করেছেন। সে-ক্ষোভের বৈষয়িক কারণও ছিল ; নবাবী আমলের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান অভিজাতের এক বৃহদংশের সৌভাগ্য শেষ হল ; মুসলমান কাজী-মোল্লা প্রভৃতি ধর্ম-নেতাদেরও প্রভাব-প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হল। ১৭৯৩ সালে যখন চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত সুস্থির হল তখন পুরনো মুসলমান অভিজাত প্রায় দেউলে হয়ে গেল। হিন্দু দেওয়ান-মুন্সীরা তখন নতুন জমিদার হয়ে বসলেন। ১৮৩৩ (?) সালে আয়মা সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ঐতিহ্যের ভার বহন করবার মত বৈষয়িক বনিয়াদ আর মুসলমান সমাজের রইল না। ভাগ্যবানদের এই ভাগ্যবিপর্যয়ে মুসলমান জনগণও এই সব কারণে ক্ষুব্ধ হল। অবশ্য মধ্যযুগের জমিদার জায়গীরদারের হাতে বিশেষ কোনো সুবিধাই তারা পায়নি ; তবু নবাবী আমলকে তারা কোম্পানির আমলের থেকে নিজেদের বেশি আপনার বলে ভাবতে লাগল। যতই কোম্পানির শোষণ বাড়ল—আর 'নবাবী আমল'

অতীত হয়ে গেল—আর ইংরেজের কৃপায় হিন্দুর সৌভাগ্য বাড়ল, ততই এই নবাবী আমলের সম্বন্ধে মোহ তাদের বৃদ্ধি পেল। অর্থাৎ ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ ছিল সমস্ত বাঙালী মুসলমান সমাজেই পরিব্যাপ্ত।

অপরপক্ষে হিন্দু অভিজাত বা নবাবের ফার্সিনবিশ হিন্দু আমলা মুন্সীরা ইংরেজ আমলে ততটা ক্ষুব্ধ হল না; তারা ইংরেজকেও পাঠান-মোগলের মতই মেনে নিলে। ইংরেজ বণিকের দেওয়ান মুন্সি হিসাবে সৌভাগ্যলাভ করে, পরে তার তৈরী জমিদার হয়ে, তারা বরং ইংরেজ আমলের ভক্তই হল। হিন্দু মধ্যবিত্ত তাই এ সময়ে বৈষয়িক কারণেই ইংরেজি শিখতে গেল; শিখতে গিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার শক্তি ও ইংরেজের শক্তিরও মূল কারণ বুঝতে পারল। তখন উনবিংশ শতকে ইংরেজের ভাষা ও জীবনকে আশ্রয় করে বুর্জোয়া সভ্যতা দ্রুতগতিতে মধ্যাহ্ন দীপ্তিতে বিকশিত হচ্ছে—কী আশ্চর্য তার তেজ, দীপ্তি, মহিমা! বাঙালী হিন্দু এই ইংরেজ শাসন ও শিক্ষার মধ্য দিয়ে মানব সভ্যতার সৌন্দর্য ও শক্তিরও সন্ধানলাভ করলে। এক নতুন শক্তি, নতুর কল্পনায় সে উদ্‌বুদ্ধ হল, মাতাল হয়ে উঠ্‌ল। উনিশ শতকের বাঙালী জীবন তার এই নতুন জাগরণে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। শিক্ষিত হিন্দু বাঙালী তখন শুধু ইংরেজের চাকুরি ও ইংরেজের জমিদারী পেয়েই খুশি রইল না—নতুন কিছু সৃষ্টি করতে কোমর বেঁধে লাগল।

উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমান

কিন্তু উনিশ শতকের মুসলমান বাঙালীর অবস্থা কি? একমাত্র ওদিকে শেষ দিকে নবাব আব্দুল লতিফের নাম চোখে পড়ে। তার পূর্বে কি হয়েছিল তা জানতে হলে জানতে হবে হাণ্টারের "দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্" থেকে; আর বুঝতে হবে বিংশ শতকের বাঙালী মুসলমান সমাজের অবস্থার দিকে তাকিয়ে। সেই যে মুসলমান সমাজ রাজ্য হারিয়ে আহত ক্ষুব্ধ হয়ে রইল তারপরে সে হল বিদ্রোহী—শুধু বিধর্মীর শাসনের বিরুদ্ধে নয়, সমস্ত পরধর্মের বিরুদ্ধেও শুধু নয়—একেবারে কালধর্মের বিরুদ্ধেই সে বিদ্রোহী হল। পরাজিত মুসলমান নেতারা ভাবলেন, পরাজয়ের কারণ—তাঁরা সত্যকার ইসলামকে জীবনে যথার্থভাবে রূপ দেননি, তাই তাঁদের পতন ঘটেছে। অতএব, বিশুদ্ধ ইস্‌লাম, বিশেষ করে, ওহাবি

পিউরিটানিক মতবাদ হল তাঁদের তখনকার জীবনের আদর্শ। এই দৃষ্টিতে দেখ্‌লে শুধু প্রথম দিক্‌কার উম্‌মাইয়া আরবদের ইসলামই ইস্‌লাম। অন্য সব হচ্ছে ভ্রষ্টাচার। বিশেষ করে ফার্সি সংস্কৃতির মারফৎ পাওয়া ইস্‌লাম অগ্রাহ্য। ওহাবি প্রেরণা রাজনীতি ক্ষেত্রে কি ঝড় তুলল তার প্রমাণ হাণ্টারের রিপোর্টে আছে। বিদ্রোহ হিসাবে সে এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সম্প্রদায়ের গৌরবের কথা। পরবর্তী সময়ে আমিন খাঁর ওহাবি মামলা সেদিনকার ইংরেজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদেরও স্বাধীনতা স্পৃহাকেও প্রেরণা দেয়, হিন্দুর মনেও ইংরেজ-বিরোধ বাড়িয়ে তোলে। আর্থিক ক্ষেত্রেও বাঙলার ওহাবি আন্দোলন দেশের অত্যাচারিত প্রজা-রায়তের, সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সহায়তা পেয়েছিল। কিন্তু কথা হচ্ছে তার সামাজিক সাংস্কৃতিক ফলাফল নিয়ে। এদিকে বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ওহাবি মনোভাব মারাত্মক দুর্ভাগ্যের কারণ হল—আর আরও দুর্ভাগ্যের কারণ হল সমস্ত বাঙালীর ও বাঙলার সংস্কৃতির পক্ষে। কি করে, তা বলছি।

ওহাবি জীবনাদর্শ সপ্তম শতাব্দীর ইস্‌লামকে উনিশ শতকের বাঙালী মুসলমানের জীবনে মূর্ত করতে চাইল। এমনিতেই আমরা জানি তা কত অসম্ভব। রিলিজিয়ন-এর ঝোঁক স্থানুত্বের দিকে, প্রতিক্রিয়া-পরায়ণতার দিকে। কালচারের প্রকৃতি গতিশীলতা ও সৃষ্টিশীলতা। কাজেই ধর্মের পুনরুজ্জীবনে অনেক ক্ষেত্রে কালচারের গতি বন্ধ হয়। এই ওহাবি দৃষ্টিভঙ্গীতে আবার শুধু সপ্তম শতাব্দীর আরব ঐতিহ্যই পবিত্র ও গ্রাহ্য; অন্য সব প্রায় দাহ্য—ইংরেজি সভ্যতা শাসন তো নিশ্চয়ই, প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিও, এমন কি, ফার্সি-সভ্যতা এবং ভারতীয় মুসলমানের অনেক সৃষ্টিও অগ্রাহ্য। এই দৃষ্টিতে মধ্যযুগের বাঙালী 'হিন্দু ঐতিহ্যের' কোঠা তো অপবিত্রই, এমন কি, বাঙালীর যৌথ-সংস্কৃতিও বর্জনীয় হল। যেটুকু বাঙালীর 'মুসলিম ঐতিহ্যের' ক্ষেত্র তাও অনেকাংশে পরিত্যাজ্য হয়ে থাকে; তার উপরে চাপানো দরকার হল ওহাবি-পরিশোধিত সেই বিশুদ্ধ ইসলামের তত্ত্ব, নিয়ম-কানুন, আচার-বিচার।

এ কথা ঠিক, বাঙলার ওহাবি-নেতা হাজি শরিয়তুল্লা (ফরিদপুরের) বা তাঁর ছেলে দুধু মিয়া কিংবা ওহাবি বিদ্রোহী তিতু মিয়া (২৪ পরগণার) বাঙালী মুসলমান সমাজের ধর্মগত নেতৃত্ব লাভ করতে পারেননি—'ফরাজীদের' সঙ্গে পুরনো মওলবী মোল্লার ফতোয়া মত সাধারণ মুসলমান একসঙ্গে নমাজ

পড়তেও অস্বীকার করতেন। কাজেই মতবাদ হিসাবে ওহাবি মতবাদ বাঙলায় মোটেই সর্বগ্রাহ্য হয়নি। কিন্তু এই মতবাদকে ঠেকাতে গিয়েও পুরাতন মওলবী মোল্লাদের পক্ষে কোরান, হাদিস ও শরিয়তী বিধি-বিধানের উপরই জোর দিতে হয়, মুসলমান সাধারণকে বল্‌তে হয়—শরিয়তী ইসলাম থেকে বিচ্যুতিই এ-দেশের ও সকল দেশের মুসলমানের পতনের কারণ। অতএব, কার্যক্ষেত্রে আসলে ওহাবি মতবাদ যে-মনোভাবকে বাড়িয়ে তোলে ওহাবি-বিরোধী মওলবীরাও সাধারণ মুসলমানের সেই মনোভাবকেই প্রশ্রয় দেয়—'ফিরে চল বিশুদ্ধ ইসলামে'—পাশ্চাত্য সভ্যতা ও স্কুল কলেজ, শিক্ষা-দীক্ষা নয়; ভারতীয় বা বাঙালী যৌথ উত্তরাধিকার (common inheritance) বা সংস্কৃতির অনুশীলনও আর নয়; এমন কি, সংশোধন করে না নিলে বাঙালী মুসলিম ঐতিহ্যও' (typical Muslim tradition) নিয়ো না।' বলা বাহুল্য মধ্যযুগের বাঙালী সংস্কৃতির প্রায় বারো আনা উত্তরাধিকারই এভাবে অবহেলিত হল। আর অন্য দিকে বাঙলার মুসলমান সমাজের তখন থেকেই আসলে শরিয়তী ইসলামের উপর ঝোঁক বাড়ল। এখানে-ওখানে মাদ্রাসা-মক্তব পত্তন হল, ইসলামী নিয়মকানুন আদব-কায়দার সঙ্গে সাধারণ মুসলমানের পরিচয় সাধিত হতে লাগল। উনিশ শতকে বাঙালী মুসলমান প্রথম "খাঁটি মুসলমান" হয়ে উঠ্‌তে লাগলেন। কিন্তু তা হয়ে উঠ্‌তে লাগলেন বাঙালীর ধারাবাহিক যৌথ সংস্কৃতিকে পাশে সরিয়ে রেখে, নতুন কালের বুর্জোয়া সংস্কৃতিকেও একেবারে অস্বীকার করে।

অবশ্য দুটি অত্যন্ত বাস্তব কারণও সাধারণ মুসলমানের ইংরেজি শিক্ষা বর্জনের কারণ হয়েছিল। বাঙলা দেশে মুসলমান পল্লীবাসী। প্রথম যুগে ইংরেজি বিদ্যালয় কলেজ পশ্চিম বাঙলার বড় বড় শহরেই আবদ্ধ ছিল—কাজেই পল্লীবাসীর পক্ষে এ-শিক্ষা দুর্ঘট ছিল। তাই আবদুল লতিফ বা আমীর আলী যদি বা সুযোগ পেলেন মুসলমান সাধারণের পক্ষে এ-সুযোগ দুর্লভ হত। তা ছাড়া, অধিকাংশ মুসলমান বরাবরই আবার দরিদ্র ও শোষিত শ্রেণীর; মধ্যবিত্ত মুসলমানও ছিলেন প্রায় নগণ্য। অথচ ইংরেজি শিক্ষা ব্যয়সাধ্য। এই সব কারণে মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষিতরা ইংরেজি শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রচারে আরও বেশি সুযোগলাভ করলেন।

একই কালে বাঙালী মুসলমান এসব কারণে মিলে বিদ্রোহ করলেন তার অতীতের বিরুদ্ধে আর সমাগত যুগধর্মের বিরুদ্ধে, গ্রহণ করতে গেলেন সপ্তম শতকের আরবী প্রেরণা ও ব্যবস্থাকে—যার অনেকাংশই একালের সৃষ্টির পক্ষে আর তাকে উজ্জীবিত করতে পারে না। কাজেই উনিশ শতকের মুসলমান-

জীবন অভিমানে বিক্ষুব্ধ, বিদ্রোহে উদ্দীপ্ত, ধর্মান্দোলনে আলোড়িত—আর সৃষ্টি-চেতনায় তা এমন বন্ধ্যা হয়ে রইল। সমস্ত বাঙলা দেশে উনিশ শতকের জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সামাজিক সংস্কারে, আর প্রগতিমূলক জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানের তাই কোনো দান নেই। উত্তর ভারতে স্যার সৈয়দ আহমেদের অভ্যুত্থানে যে "মুসলিম জাগরণ" এল তার বাহন হয় উর্দু, তার সৃষ্টি-কেন্দ্র উত্তর-ভারত। বাঙালী মুসলমান প্রত্যক্ষভাবে সেই "জাগরণেরও" সুযোগ পায়নি।

হিন্দুর সৃষ্টি ও হিন্দুর ভুল

মুসলিম-জীবনের এই বিদ্রোহী ধারা হিন্দু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সাধারণের নিকট পর্যন্ত দুর্জ্ঞেয় দুর্বোধ্য হয়ে রইল। মুসলমান কোনো নেতা তা ইংরাজি বা বাঙলায় ব্যাখ্যাও করলেন না। তাই হিন্দু ইংরেজি শিক্ষা গ্রহণ করলে; জমিদারী প্রথা চাকরি-বাকরির মারফৎ হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ জীবনযাত্রায় একটা বড় স্থান অধিকার করলে; আর এই শিক্ষিত হিন্দু-সাধারণই নূতন জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হতে হতে উনিশ শতকে ধরে নেন—ভারতীয় মুসলমান এদেশের শিক্ষা-সভ্যতা ও অতীতকে শ্রদ্ধা করেন না; এদেশের সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানকে আপনার বলে মনে করেন না; এ দেশকেই তাঁরা মনে করেন না নিজেদের 'স্বদেশ'। কাজেই মুসলমান ধর্ম যেমন বিদেশীয়, মুসলমানকেও হিন্দুরা মনে করে নিলেন বিদেশীয়; এবং হিন্দুত্ব ও হিন্দু রীতিনীতিকে সহজভাবে মনে হল "জাতীয়" ধারা। এ এক শোচনীয় ভুল। মধ্যবিত্ত হিন্দু বাঙালীরা হিন্দু মুসলমান জনগণের থেকে অনেকটা বিচ্ছিন্ন বলেই এ ভুল হল। সমস্ত উনিশ শতকের নব জাগ্রত প্রগতি আন্দোলন এই মারাত্মক ভুলের বশে এক 'হিন্দু জাতীয়তাবাদের' আশ্রয় গ্রহণ করলে। আর হিন্দু শিক্ষিত সাধারণ, আমাদেরই কবি,ঔপন্যাসিক সকলেই তখন "হিন্দু ঐতিহ্যের" কাঠামোকে আশ্রয় করে সৃষ্টিতে অগ্রসর হলেন—তাঁদের নিকটেও হিন্দু মুসললান-বাঙালীর যৌথ সংস্কৃতি বেশি মর্যাদা পেল না। মর্যাদা পেল বরং তাঁর পার্শ্ববর্তী সেই "হিন্দু ঐতিহ্যের" অংশ। বাঙালী হিন্দুর সেই সঙ্কীর্ণ কাঠামোকে অবশ্য ভারতীয় দর্শন চিন্তা জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিসরে ফেলে তাঁরা এ সময়ে বড় করে নিলেন—নতুন বেদ-বেদান্ত উপনিষদ চর্চায়, দর্শনের অনুশীলনে, সংস্কৃত শাস্ত্র প্রকাশে স্মার্ত ও নৈয়ায়িক বাঙালী হিন্দুর মনের কাঠামো প্রশস্ত হল। রামমোহন

রায় থেকে রাজনারায়ণ, বঙ্কিম বিবেকানন্দ পর্যন্ত সকলেই সর্ব ভারতীয় হিন্দু ঐতিহ্যের প্রবল ধারাকে বাঙালী হিন্দু ঐতিহ্যের খাতে বহাতে সাহায্য করেছেন, তাও উল্লেখযোগ্য।

অবশ্য একটি বিশেষ সত্য লক্ষণীয়। এই উনিশ শতকের বাঙলা সংস্কৃতির কাঠামোই হিন্দু, তার প্রাণ কিন্তু বুর্জোয়া সংস্কৃতির। মাইকেলের তো কথাই নেই, বঙ্কিমও দেখি প্রাণপণে চাইছেন মিল, স্পেন্‌সার, কোঁৎ-এর বাণীকে এই স্বদেশীয় কাঠামোতে রূপ দিতে। এই বুর্জোয়া সভ্যতার মূল সত্য হল মানবতাবাদ—হিউম্যানিজম্; অনুশীলন ও ধর্মতত্ত্বের তাই লক্ষ্য। বঙ্কিম উপন্যাসে, প্রবন্ধে চেয়েছেন এই সত্যকে—বুর্জোয়া প্রাণশক্তিকে এই "হিন্দু কাঠামোতে" পুরতে। ব্রাহ্ম ও "উদারনৈতিক" সংস্কারবাদীরা এ-কাঠামোকেও এতটা গুরুত্ব দিতেন না। তাঁদের ধর্মান্দোলনে ও কর্মান্দোলনে তা স্পষ্ট। কিন্তু "জাতীয়তা-বাদীরা" চাইতেন সেই জাতীয় আধারে অর্থাৎ হিন্দু আধারে, নতুন প্রাণ সঞ্জীবিত করতে।

কিন্তু যা প্রধান কথা তা এই:—বাঙালীর যৌথ-সংস্কৃতি ইংরেজ শাসনের কালে মুসলমানের দ্বারাও অবহেলিত হয়, হিন্দুর দ্বারাও অবহেলিত হয়। আর এইটিই এ কালের বাঙালী জীবনের ও সংস্কৃতির ট্র্যাজিডি। তারই জন্য বর্তমান বাঙলার সংস্কৃতিকে মুসলমান বাঙালী আপনার বলে মানতে এত ইতস্তত করেন। কারণ, তাঁর চক্ষে এ যে শুধু 'হিন্দু ঐতিহ্যে'র উপর গঠিত বাঙালী সংস্কৃতি।

বাঙালী কালচারের ভাবী ভিত্তি

অপর পক্ষে এ কথাও সত্য যে, সেই উনিশ শতকের হিন্দু জাগরণের হিন্দু কাঠামো তখনি ভেঙে চৌচির হয়ে যাচ্ছিল। কারণ মানবতাবাদ হিন্দুত্বের কাঠামোয় বাঁধা পড়ে না; এবং "মুসলমান-সন্দেহের" আবহাওয়ায়ও নিশ্বাস টানতে পারে না। এমন কি এই "বাবু কাল্‌চারের" বাবুদের চক্ষেও তার সঙ্কীর্ণতা ও দুর্বলতা গোপন রইল না। দিনের পর দিন বাঙালী সংস্কৃতি তাই সচেতন হচ্ছে তার সেই উনিশ শতকের ত্রুটি সম্বন্ধে,বুঝছে দুটিসত্য—এই সংস্কৃতি সমস্ত বাঙালীর সংস্কৃতি নয়, শুধু মাত্র শতকরা পাঁচ জন বাবুর সংস্কৃতি হয়েছে—"ভদ্র সংস্কৃতি" হয়েছে, বাঙালীর লোক-জীবনের থেকে তা বিচ্ছিন্ন। বাঙালী সংস্কৃতির আসল কাঠামো (form) হওয়া চাই বাঙালী হিন্দু মুসলমানের সেই যৌথ সংস্কৃতি; বাঙালী হিন্দু-মুসলমান জনগণের সমসূত্রে গাঁথা লোক-

জীবন ও লোক-সংস্কৃতি হওয়া চাই তার ভিত্তি; আধুনিক কালের জাগ্রত জীবন হবে তার উপকরণ(content); আর এই নতুন বাঙলা সংস্কৃতির প্রাণ হবে—শুধু বুর্জোয়া মানবতাবাদ নয়—আধুনিক বিপ্লবী মানবতাবাদের নতুন প্রেরণা ও সত্য।

এখানেই বাঙালী মুসলমানের দানের সে প্রতীক্ষা করবে। আবার সমস্ত বাঙালীর যৌথ সংস্কৃতি গঠন করতে হবে, নতুন মানবতার সাধনায় হিন্দু মুসলমান একত্র হতে হবে। বাঙালী মুসলমানেরও সেই সাধনায় সে-দান আজ জোগাতে হবে। উনবিংশ শতকের উগ্র ও সঙ্কীর্ণ ওহাবি প্রেরণায় তার সৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ হয়ে রয়েছে। বিংশ শতকে এখনো তার জের চলেছে। যেমন দেখি—মুসলমান বাঙালী তার আপন সংস্কৃতি ক্ষেত্রের সন্ধান না পেয়ে, শক্তিকেন্দ্র না বুঝে, বাঙলার মুসলমান জনগণের লোক-গীতি, লোক-নৃত্য প্রভৃতি অনেক প্রয়াসকে "অনৈসলামিক" বলে এই শতকেও চাপা দিচ্ছেন। সেই ওহাবি ঝোঁক তার কেটে যায়নি; হিন্দুর সাংস্কৃতিক প্রতিপত্তি দেখে বরং তা বেড়েছে। এবং অকস্মাৎ রাজনৈতিক শক্তির সহায়তা লাভে এই দেশের আজ বাঙালী মুসলমান সমাজেও "শিক্ষিত মধ্যবিত্তের" উদয় হচ্ছে। তাল-কানা হয়ে উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দুর মত তারা "মুসলিম ঐতিহ্যের" কাঠামোতে আরবী ফারসীর ধারায় নতুন সংস্কৃতি গড়বারও কল্পনা করছেন। "বাবু কালচারের" পাণ্টা তাঁরা গড়তে চান "মিঞা কালচার"। বলা বাহুল্য, উনিশ শতকেই যা হিন্দুর ভুল ছিল বিংশ শতকে তা মুসলমানের পক্ষে হবে আরও মারাত্মক। হিন্দুর সেই ভুল দেখে বরং বাঙালী মুসলমানের বোঝা উচিত—তাঁকে আপনার সংস্কৃতি গড়তে হলে গড়তে হবে বাঙালী যৌথ-সংস্কৃতির কাঠামো নিয়ে (form), বাঙলা গণ-জীবনের ভিত্তিতে (base), আর তা গড়তে হবে বিপ্লবী মানবতার বাণী ও প্রেরণাকে প্রাণ স্বরূপ ভাববস্তু-রূপে (content) গ্রহণ করে।

তা হলেই বাঙালী কালচার—হিন্দু মুসলমান বাঙালীর সাংস্কৃতিক স্বরাজ লাভ সম্ভব। *

* ১৯৪৬ সনের ২রা মার্চ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজের মুসলমান ছাত্রদের ছাত্রনিবাস জিন্নাহ্ হলে, তাদের একটি সম্মেলনে 'মুস্লিম কালচার' বিষয়ক বক্তৃতা থেকে 'বাঙালী মুসলমান ও মুস্লিম কালচার' ও 'মুসলমান বাঙালীর কালচার'—এই প্রবন্ধ দু'টি ১৯৪৬এর জুলাই মাসে লিখিত হয়।

বাঙালী মুসলমানের কাব্য সাধনা

বাঙালী জাতির মধ্যে মুসলমানেরাই সংখ্যায় বেশি, হিন্দুরা সংখ্যায় তাদের তুলনায় কম। একথা হয়ত ভারতবর্ষের অন্য আরও কয়েকটি জাতির সম্বন্ধেও খাটে। কিন্তু তাদের সম্বন্ধে আর-একটি কথা এত বেশি খাটবে না। তা এই : বাঙলা—বাঙালী হিন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা, নিজের ভাষা। গুজ্‌রাতী মুসলমানও হয়ত গুজ্‌রাতী পড়েন, পাঞ্জাবী মুসলমানও হয়ত পাঞ্জাবীর চর্চা করেন। কিন্তু সাধারণ ভাবে তাঁরা আবার উর্দুকে বা হিন্দুস্তানীকে নিজেদের ভাষা বলে মনে করেন। বাঙালী মুসলমানের তা মনে করা দুঃসাধ্য। বাঙলাই সাধারণভাবে তাঁদের মাতৃভাষা, নিজেদের ভাষা। আশ্চর্য এই যে, বাঙলা সাহিত্যে তবু বাঙালী মুসলমানের দান এখনো তত বেশি নয়।

তর্কের অবকাশ থাকবে, তবু মোটামুটি বল্‌তে পারি তার কারণ পূর্ব যুগে ছিল এরূপ : বাঙালী মুসলমানের মধ্যে পূর্বযুগে শিক্ষিত মধ্যস্তর বোধ হয় বিশেষ ছিল না। বাঙালী মুসলমানের প্রধান স্তর ছিল দুটি : একটা উপরকার শাসক স্তর—কেউ বা তাঁরা ছিলেন মূলত অবাঙালী কেউ বা আধা-বাঙালী। দ্বিতীয়টি নিচেকার স্তরের গরীব বাঙালী—যাঁরা নানা কারণে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু সে-সূত্রে কতকগুলো অসুবিধা ও অবিচার থেকে মুক্তি পেলেও মোটের উপর তাঁরা দরিদ্রই থেকে যান। উন্নত রকমের জীবন যাত্রার ও সংস্কৃতি-চর্চার সুযোগ দরিদ্র ও নিম্নস্তরের হিন্দুমুসলমান কারো ছিল না। সে সুযোগ মধ্যযুগে স্বভাবতই থাকে সম্ভ্রান্তদের হাতে ও জোটে তাদেরই আশ্রিত গুণীদের ভাগ্যে। উপর স্তরের

কলিকাতার দাঙ্গার পরে (১৬ই আগস্ট্ ১৯৪৬) গত (১৩৫২-এর) শারদীয় সংখ্যা 'বসুমতী' ও 'যুগান্তরে' বর্তমানাকারে লেখা দুটি প্রকাশিত হয় এবং নোয়াখালির শোচনীয় ঘটনাবলীর পরে 'শনিবারের চিঠির' সুযোগ্য সম্পাদকের কাছ থেকে অপ্রাসঙ্গিকভাবেই এই মন্তব্যটুকু লাভ করে : যখন অবাধ তাণ্ডব চলিয়াছে "তখন নোয়াখালির শ্রীযুক্ত গোপাল হালদারের মত মন এমন শক্ত করিতে পারি নাই যে, মুস্‌লিম্ কালচার ও সংস্কৃতি লইয়া পাঁচ ঘাটে পাঁচটি প্রবন্ধের তরণী ভাসাইব।" সুযোগ্য সম্পাদকের অবশ্য অজানা ছিল না যে, দেহ শক্ত করিতে না পারায় নোয়াখালির-ফেরৎ "নোয়াখালির গোপাল হালদার" তখন নিতান্তই অশক্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কাব্য মালঞ্চ। আবদুল কাদের ও রেজাউল করীম সম্পাদিত। (নুর লাইব্রেরী, দাম ৩৲)। এই সংগ্রহ গ্রন্থের সমালোচনায় এ প্রবন্ধটি 'পরিচয়ে' প্রকাশিত হয়।

মুসলমানেরাও সেদিন দেশী কবিতা, গান, পাঁচালি শুনতেন, তা আমরা ভালো করেই জানি। না শুনে উপায় ছিল না। কারণ ঈরান-তুরান কেন, তখনকার দিনে জৌনপুর-দিল্লীও সত্যই দূর ছিল। আরাকানের দরবারে তাই বাঙলা কবিতার আসর বসে ; বঙ্গে পরাগল্ খাঁ, ছুটি খাঁ মহাভারত শুনতে থাকেন, গৌড়ে ইউসুফ্ শাহ, হোসেন শাহের উৎসাহে বাঙলায় কাব্য চর্চা জেঁকে ওঠে। কিন্তু নিশ্চয়ই তাঁদের কাজেকর্মে দরবারে দফ্তরে ফার্সিও কম চল্‌ত না, আর ফার্সি চর্চায়ও শাসক-শ্রেণীর উৎসাহ কম ছিল না। তখনকার গুণী ও শিক্ষিত মুসলমানরা সে ভাষার দিকেই আকৃষ্ট হয়ে থাকবেন, তাতে আশ্চর্য কি ? অবশ্য আলাওল বা দৌলৎ কাজীর মত কবিও থাক্‌তেন, কিন্তু মধ্যযুগে উঁচুস্তরের মুসলমান বাঙলা কবিতা বিশেষ লিখ্‌তেন কি ?

মধ্যস্তরের মুসলমান তখনো কিছু ছিলেন যাঁরা কাজী মুন্সি হতেন ; তাঁরা ছিলেন ফার্সি-নবিস। ফার্সি-নবিসের পক্ষে আবার বাঙলা কাব্যে নিজেদের কথা, ভাব ও চিন্তাকে পরিবেশন করা সম্ভবত অপেক্ষাকৃত কষ্টসাধ্য ছিল। হিন্দু বাঙালীর হাতে বাঙলা কাব্যের পদ্ধতি তাঁর আগেই সংস্কৃতের ঢঙ্ অনুসরণ করে একটা বিশেষ রূপ (প্যাটার্ন) পেতে শুরু করেছিল। তাই দেখি, যেসব মুসলমান কবি নিজের দেশের ভাষায়, নিজের জীবন ও ভাবনার কথা লিখ্‌ছেন তাঁদের কবিতা হিন্দু বাঙালীর কবিতার থেকে ভাষায় এবং ভাবে তত ভিন্ন প্রকৃতির নয়। প্রথম থেকেই বাঙলা মুসলমান কবির কবিতায় এর প্রমাণ মেলে। সে কবিতার বিষয়বস্তু যদি বা "রসুল বিজয়ের" (শেখ চান্দের) বা "জঙ্গনামার" (মোহাম্মদ এয়াকুবের) মত জিনিস হয় তবু দেখি তার মোট রূপটি (প্যাটার্ন) যে কোনো হিন্দুকবির কবিতার থেকে আসলে স্বতন্ত্র নয়। অবশ্য বিষয়বস্তুর দায়েই শরা-শরিয়ৎ, মারফৎ-হকিকতের কথা যথা নিয়মে আস্‌বেই, না এলেই তা অস্বাভাবিক হত। কিন্তু তবু মোহাম্মদ খানের "ছহি:সক্তাল হোসেনের" মত 'মর্সিয়া কাব্যের' মধ্যেও বাঙলা কবিতার সেই রূপ যথেষ্ট পরিষ্কার।

অবশ্য যেখানে বিষয়বস্তু—মানে, কথাবস্তু ও ভাববস্তু—এ দেশীয়, সেখানে লেখক অনেক স্বচ্ছন্দ। গাথা, ভাটিয়ালী, বাউল বা মুর্শেদীগান, এমন কি, গাজীর গান, মাণিকপীর, সত্যপীর প্রভৃতির বিষয়ে গান রচনা সেজন্যই অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। আর সাধারণ স্তরের হিন্দু মুসলমানের পক্ষে যেমন উচ্চ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায় সমান বাধা ছিল, তেমনি লোক-কাব্যে, গাথায়

গানে দু'এরই সমান আকর্ষণ ছিল—বাঙালার লোক-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমান উভয় শ্রেণীর গরীবদের তফাৎ ছিল না। তা ছাড়া, অনেক মুসলমানই সেদিনে সৈয়দ মুর্তজার মত কৃষ্ণলীলায় আকৃষ্ট হতেন, আলী রাজার মত সূফী ও বৈষ্ণব সাধনায় তন্ময় হতেন, আর মদন বাউল বা লালন শাহ্'র মত বাউলের সাধনায় মজ্‌তেন। এ সব জানা কথা। কিন্তু, একটি কথা: এ সব কথা ও ভাবের প্রকাশ-পদ্ধতিটা সুপরিচিত বলেই কি কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুসলমান কবি সে-সব কথাবস্তু ও সে-সব ভাববস্তু অবলম্বন করতেন না?

মোটের উপর কথা এই: সমস্ত মধ্যযুগের বাঙালী মুসলমান কবির ও বাঙালী হিন্দু কবির লেখার মধ্যে একটা অচ্ছেদ্য আত্মীয়তা রয়েছে, তা অস্বীকার করা যায় না। পার্থক্য যা আছে তা গৌণ, মিল যা আছে তাই প্রধান।

রেজাউল করীম সাহেবের রাজনীতিক ইঙ্গিত না মানলেও তাঁর এ-কথা মানা উচিত। অবশ্য এ মিল একদিকে মধ্য যুগের চিন্তা-ভাবনার সাধারণ মিল, এবং মধ্যযুগের জীবনযাত্রায় মোটামুটি দু'সম্প্রদায়ের নৈকট্যের প্রমাণ। তবু তা প্রমাণ এই সত্যেরও যে, বাঙলার হিন্দু মুসলমান একই "নেশন", এবং বাঙলার লোক-সংস্কৃতি শিল্প-সাহিত্য দুইই ছিল হিন্দু মুসলমানের তখন পর্যন্ত সম্মিলিত সম্পদ—যদিও সেই সাহিত্যে শিল্পে সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুসলমানের দান কম পড়ছিল। কেন কম পড়ছিল, তার একটা অনুমান আমরা উপরে উল্লেখ করেছি—মুসলমান মধ্যবিত্ত বিশেষ ছিল না বলে।

কিন্তু প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের সাধনায় বাঙালী মুসলমানের কি তবু বিশিষ্ট কোনো দান নেই? নিশ্চয়ই আছে; আর সে দানের তুলনা নেই। প্রথমত, "বাঙলার মুসলমান কবিগণই প্রত্যক্ষভাবে মানবীয় প্রেমকে আদর্শ করে কাব্য প্রণয়নের নূতন ধারা প্রবর্তন করেন।" কারণ হিন্দুর থেকে মুসলমান বাঙালী কবিতায় চিন্তায় অধিকতর জীবননিষ্ঠ। দ্বিতীয়ত, "সূফী চিত্তের আগ্নেয় অনুভূতি মারফতী গানের সুরে সঞ্চারিত করিয়াছে আশ্চর্য্য তীব্রতা।" —"কাব্য মালঞ্চের" অন্যতম সম্পাদক কাদের সাহেবের এ-দুটি কথাই মূলত সত্য। অবশ্য তিনিও মানেন, ব্রিটিশ-পূর্ব যুগের বাঙলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মোটামুটি হিন্দু-মুসলমান এক ও অবিচ্ছেদ্য। "কাব্য মালঞ্চের" এই মুসলমান কবিদের চমৎকার কাব্য সংকলন থেকেও তা'ই দেখ্‌তে পাই।

কিন্তু ব্রিটিশ যুগে বাঙলা সাহিত্যের একেবারে নবজন্ম হল, তা আমরা

জানি। বাঙলার সে-সাহিত্যে মুসলমান বাঙালীর দান আরও কমে গেল। কেন এমন হল, এ-প্রশ্নের উত্তর আজ আমরা মোটামুটি জানি—"ওহাবী-প্রতিবাদ, আমিরী আয়েস, দারিদ্র্য ও গ্রামীণতার ফলে বাঙালী মুসলমানের মধ্য হইতে তেমন (হিন্দুদের মত) 'মধ্যবিত্ত শিক্ষিত শ্রেণী' তখন (উনবিংশ শতকে) উঠিতে পারে নাই। আজ (১৯২০-এর পরে) তাহার উত্থান ঘটিতেছে, নানা সুবিধালাভে তাড়াতাড়িই এই উত্থান ঘটিতেছে।" ('সংস্কৃতির রূপান্তর' বাঙলার কালচার)। "কাব্য মালঞ্চের" কবিতা সংগ্রহ, এজন্য আরও উল্লেখযোগ্য ; নতুন কবিদের কবিতা পাঠে এ বিষয়ে সংশয় থাকে না যে, বাঙালী মুসলমান কাব্যজগতে প্রবেশ করছেন। আবদুল কাদের সাহেব যথেষ্ট দরদ ও বিশ্লেষণ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের প্রত্যেকের শক্তির পরিমাপে। তবু তাঁর সঙ্গে একমত না হয়ে উপায় নেই, "শেখ ফয়জুল্লাহ্ হইতে ফররুখ আহম্মদ পর্যন্ত আমাদের যে কাব্য সাহিত্য তাহাতে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বেশি নাই।" তাই তাঁর সঙ্গেই আবার দ্বিধাভরে প্রশ্ন করতে হয়, "বাঙালী মুসলমানদের সমাজ গঠন কি শিল্প প্রতিভার আবির্ভাবের পক্ষে বাস্তবিকই প্রতিকূল ?"

অনধিকার না হলে এ-সম্বন্ধে আমরা সাধারণ দু-একটি কথা বলতে চাই। প্রথমত, শিল্প-সাহিত্যে নিজেকে প্রকাশিত করতে হলে নিশ্চয়ই বাঙালী মুসলমানের পক্ষে ওহাবী-উগ্রতার মায়া কাটিয়ে উঠতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেমন করে অন্যত্র জাগ্রত সংস্কৃতির স্রষ্টারা আধুনিক কালের জীবন-সত্যকে স্বীকার করছেন তেমনি করে বাঙালী হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্ত স্রষ্টাদেরও জন-জীবনকে স্বীকার করতে হবে। নইলে যে নিজস্ব বাঙালী ঐতিহ্য নিয়ে বাঙলার মুসলমান সমাজ গর্ব করতে পারেন তাও তাঁরা এই ওহাবী-ঝোঁকে ও নতুন মধ্যবিত্ত"মিশ্র কালচারের" মোহে অবজ্ঞা করতে শিখবেন। এদিকে মুসলমান সমাজের ভুল সম্ভাবনা যথেষ্ট। চিত্রবিদ্যা ও নৃত্যবিদ্যা মুসলমান সমাজে কোনো দিনই বিশেষ প্রশ্রয় পায়নি; যদিবা সাধারণ মুসলমান গান গাইতেন, ছবি আঁকতেন তাঁরা কম। আর গত কয়েক বছরের মধ্যে বাঙালী মুসলমান পালা গান, বাউল গান, প্রভৃতি বাঙলার লোক-সংস্কৃতির অনেকগুলো নিজস্ব পথকেই নব্য ওহাবী-উগ্রতায় বর্জন করতে উৎসাহী হয়েছেন। এমন কি, সেই "সূফী চিত্তের আগ্নেয় অনুভূতি" ও দৌলৎ কাজীর নিছক "নর" ও "মানবীয় প্রেমও" তেমনি স্বচ্ছন্দভাবে আর বাঙালী মুসলমানের লেখায় প্রকাশ লাভ করছে না। অবশ্য একথা বুঝতে পারি যে, বাঙালী মুসলমান উত্থিত হচ্ছে আজ অনেক বিক্ষোভ বুকে নিয়ে। সংখ্যায় সে-ই বাঙালী হিসাবে মুখ্য

অথচ বাঙালীর সাংস্কৃতিক জীবনে সে গৌণ। সর্বদাই নিজের এই আপেক্ষিক খর্বতায় সে ভীত, শংকিত এবং সেই কারণেই উগ্র ও বিক্ষুব্ধ। স্বাভাবিক ও সবল আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি না পেলে হয়ত সে সুস্থ হতে পারবে না। একটা আত্মপ্রত্যয়ের অভাব পরাধীন হিসাবে বাঙালী মাত্রেরই আছে,— বাঙলা সাহিত্যিকেরও আছে। সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার জন্য সেই আত্মপ্রত্যয়ের অভাব আরও বেশি আছে বাঙালী মুসলমান সাহিত্যিকের; আধুনিক বাঙালী মুসলমান কবিদের লেখায়ও এরই স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। আর ঠিক এই কারণেই ওহাবী মনোভাব হয়ে উঠেছে বাঙালী মুসলমানের আত্মরক্ষার কবচ। কিন্তু এই মনোভাবই তার সাংস্কৃতিক আত্মপ্রতিষ্ঠার পরিপন্থী নয় কি? অথচ, এ সত্য কি বাঙালী মুসলমান বোঝেন না—তার ভবিষ্যৎ তো আজ বাধামুক্ত; তা উজ্জ্বল হতে পারে তার চিন্তার, ভাবনার ও জীবন-যাত্রার স্বচ্ছন্দ দানের শক্তিতে; জনতার জীবনের সঙ্গে তার সহজতর যোগাযোগর ফলে?

"কাব্য মালঞ্চের" মারফৎ তাঁর সুযোগ্য ও সুবিদ্বান সম্পাদকদ্বয় হিন্দু-মুসলমান সকল বাঙালীর নিকট বাঙালী মুসলমান কবিদের কাব্যসাধনার ধারার যে-পরিচয় উপস্থিত করেছেন আমাদের মনে হয় তাতে এই কথা কয়টিই পরিষ্কার হয়ে ওঠে: বাঙালী জাতি হিসাবে মোটের উপর এক; বাঙলার প্রাচীন সংস্কৃতিও মোটের উপর হিন্দু-মুসলমানের দানে এক হয়ে উঠেছে; বাঙলার বর্তমান সংস্কৃতিতে মুসলমানের দানে যে ঘাটতি পড়েছে তার কারণ ঐতিহাসিক; সে ঘাটতি পূরণের জন্য আজ নতুন মুসলমান কবিরা উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন; কিন্তু সমসাময়িক ইতিহাসের নানা বিক্ষোভে এদিকে তাঁরা সুস্থ সবল আত্মবিকাশের সুযোগ লাভ করছেন না; আর তা না করাতে বাঙলার বর্তমান সংস্কৃতিও সুস্থ ও সবল হয়ে উঠতে পারছে না। কারণ, হিন্দু-মুসলমান দুই মধ্যবিত্তই তাদের "বাবু কালচার' ও 'মিঞা-কালচারে'র মোহ ছাড়িয়ে, জন-জীবনের বৃহত্তর সত্যকে গ্রহণ করতে না পারলে বাঙালীর সংস্কৃতি কি সত্যই সবল বা সম্পূর্ণ হতে পারে? আর এ বোধও কি হিন্দু-মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে আজও জন্মেনি?

পরাধীনের দৃষ্টিবিভ্রম

শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক। কিন্তু আমরা সকলেই জানি—শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম, পুরাতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব,—এক কথায় মানব সংস্কৃতির এমন দিক নেই যাতে তাঁর আগ্রহ নেই, তাঁর জিজ্ঞাসা জাগে না। তাঁর মন অসম্ভব রকমে তথ্য-সমৃদ্ধ; তাঁর স্বভাবও অকপট বা sincere; আর লেখায় বক্তৃতায় আলাপ-আলোচনায় তিনি অকৃপণ। তাঁর সম্প্রতি প্রকাশিত গ্রন্থ কয়খানিও সেই সাক্ষ্য অজস্র বহন করছে।* এই গ্রন্থ তিনখানিতে পাঠক পরিচয় পাবেন প্রকাশিত গ্রন্থ কয়খানি ও একজন সবল মানুষের, দেখ্‌তে পাবেন তাঁর বহুমুখীন চিত্তকে, আর লাভ করবেন দেশ-বিদেশের সংস্কৃতির অজস্র সংবাদ।

এখানেই পাঠকের একটি দুঃখও থেকে যাবে। কারণ, সমস্ত গ্রন্থ কয়খানিতে যত তথ্য, তত্ত্ব ও আলোচনা আছে সম্ভবত তা দু'এক মাস বসে পড়া, ভাবা, আর আলোচনা করা চলে। এখানে অবশ্য দু' পাতায় তার আভাস দেওয়াও সম্ভব হবে না। কিন্তু মোট প্রায় সোয়া পাঁচশ পৃষ্ঠার এই ছোট অক্ষরের তিনখানি বই পড়েও পাঠকের আফশোষ থেকে যায়—আরও বিস্তারিতভাবে এ-সব বিষয়ে না শুন্‌লে এ-সব কথার সম্পূর্ণ মূল্য সে মনে মনে গ্রহণ করতে পারে না। মনে হয়, এসব বই 'বিশ্বকোষের' মত তথ্যবহুল। কিন্তু বিশ্বকোষের মত যে তা ক্লান্তিকর বা ভারী হয়ে উঠ্‌ল না তার কারণ—এ সবের মধ্য দিয়ে সাক্ষাৎ পাওয়া যায় একটি মানুষেরও। এত তথ্যবহুল গ্রন্থও বিশ্বকোষের মত নৈর্ব্যক্তিক নয়, তাই নীরস

* বৈদেশিকী—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বেঙ্গল পাব্‌লিশার্স, ২৷৷৹
ইউরোপ, ১৯৩৮, প্রথম খণ্ড—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মিত্রালয়, ৪৷৷৹
ভারত-সংস্কৃতি—শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, গুপ্ত প্রকাশিকা, ২৷৹

হয়নি। এই কথা কয়টি মনে রেখে আমরা বই ক'খানির পরিচয় ও সে প্রসঙ্গে যে প্রশ্ন মনে জাগে তা এখানে উপস্থিত করছি। কারণ, এই গ্রন্থ তিনখানিকে আমরা এ-যুগের কৃতবিদ্য ও অকপট বাঙালী পণ্ডিতদের জীবন-দৃষ্টিরও একরূপ পরিচয় পত্র হিসাবে গণ্য করতে পারি। সকল শিক্ষিত বাঙালী যে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মত বিদ্বান্, বহুদর্শী ও উদ্যমশীল নন, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু মোটের উপর এ-যুগের অনেক কাল্‌চারড্ বাঙালীই যে তাঁর অনুরূপ ভাবনার ভাবুক, তা বলা চলে। অর্থাৎ আমরা সকলেই বিদেশের শিক্ষা-দীক্ষাকে সাদরে গ্রহণ করি, সম্ভব হলে বিলাতকে "গুরুকুল" করি (অনেকেই সেই কৌশলে আমাদের সমাজে ও রাষ্ট্রে কালচার-কৌলিন্য লাভ করতে চাই); সকলেই 'বিদেশীয় ভাববাদে' পুষ্ট হয়ে স্বদেশীয় সংস্কৃতিকে নতুন করে নিই, তারপর হই—হিন্দু সভার বা মুসলিম্ লীগের সমর্থক। এই হিসাবেই শ্রীযুক্ত সুনীতিবাবুর এই তিনখানা বই বুঝে দেখবার মত। তাতে বাঙালী মনীষার উৎকর্ষেরও পরিচয় আছে, আবার বাঙালী কালচারের অসঙ্গতি ও অসম্পূর্ণতার সম্বন্ধেও প্রশ্ন মনে জাগে।

প্রথমেই দেখছি: "বৈদেশিকী"তে আটটি বিদেশী জাতির মর্মমূল সুনীতিবাবু উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন। সে জন্য বিবৃত করেছেন তাদের আদিম গাথা, কাহিনী, পুরাণ প্রভৃতি, কিংবা তাদের শিল্পকলা ও সংস্কৃতির কাহিনী। যেমন, আইরিশ জাতিকে বুঝবার জন্য তিনি দের্‌দ্রিউর কাহিনী বলেছেন; ব্রুন্‌হিল্‌ডের কাহিনীতে তিনি জার্মানদের মর্মমূলের সন্ধান পাচ্ছেন; 'আরব্য উপন্যাসে' পাচ্ছেন সাত শত বৎসরের আরব নাগরিক সভ্যতার রূপ; চীনাদের দেবতার কাহিনীতে চীনজাতির, রাজা গেসরের কাহিনীতে বর্মীদের; নানা শিল্প ও পুরাণ থেকে পশ্চিম আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ য়োরুবা জাতির; আর সমসাময়িক কালের মেক্‌সিকোর 'জাতীয় পুনরুজ্জীবনের' চেষ্টায় সে দেশের চার শত বৎসর পূর্বেকার তোল্‌তেক-আস্তেক জাতির মূল প্রেরণার পুনঃ প্রতিষ্ঠার তিনি পরিচয় পাচ্ছেন। এর মধ্যে য়োরুবাদের, মেক্‌সিকোর ও আরব্য উপন্যাসের প্রসঙ্গ পাঠককে যতটা তৃপ্তি দান করে অন্য দু'একটি প্রসঙ্গ তা করে না। তার কারণ, সেখানে অনুবাদাংশ প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু এই আটটি প্রসঙ্গের যে কোনো একটি নিয়ে নানা দিক থেকে আলোচনা করা চলে; আর তা করা উচিতও। তবু এই আটটির মধ্য দিয়েই যে একটি কথা সুনীতিবাবু বলতে চান তারই অর্থ স্পষ্ট করে বোঝা আরও বেশি প্রয়োজন।

'রক্ত' ও 'জল'

কথাটা এই, Blood is thicker than water, বা Old gods never die. মানে, 'জাতির' একটা 'সনাতন' প্রবৃত্তি আছে। কি অর্থে এই কথাটা বুঝব, তা'ই প্রশ্ন। 'রক্ত জলের থেকে ভারী', এখানে 'রক্ত' শব্দটিরই বা অর্থ কি, 'জল' শব্দটিরই বা অর্থ কি ? 'রক্ত' বল্‌তে যদি বায়লোজিকাল বা জৈব সংস্কার বুঝায়, তা হলে তাতো সকল জাতের মানুষেরই এক,—কোনো বিশেষ জাতের মানুষের কোনো বিশেষ 'জৈব প্রবৃত্তি' নেই, তা বলাই বাহুল্য। 'জল' বলতে কি বুঝব ? 'কালচারাল' রূপ বা সংস্কৃতি—শিক্ষা দীক্ষা, কালক্রমে লব্ধ মানব-সম্পদ ? তা হলেও তার নানা ভঙ্গি আছে, সে ভঙ্গিমা বদলায়, এবং জৈব সংস্কারের থেকে দুর্বল হলেও এই সংস্কৃতি আবার জৈব প্রবৃত্তিরও প্রকাশ ভঙ্গিমা কিছু না কিছু স্থির করে। এই অর্থ ঠিক না হলে 'ব্লাড' মানে কি, বিশেষ জাতির কোনো 'রক্তগত বৈশিষ্ট্য' ? বৈজ্ঞানিকরাও তা মানেন না ; ডাক্তাররা তো আরও তা নাকচ করে দেবেন। কোনো জাতিরই বৈশিষ্ট্য রক্তগত নয়, কারণ রক্ত বিশুদ্ধি কোনো জাতির কোনো কালে ছিল না! ব্লাড্‌ ট্রেনসফিউশন স্বাভাবিক ভাবেই চলেছে চিরকাল জাতিতে জাতিতে। তবু রক্তের দোহাই আমাদের সনাতন সমাজে আমরা দিই ; আর আধুনিক কালে আমাদের সে দোহাই পুষ্ট করেছে সাম্রাজ্যবাদী পণ্ডিতেরা। তারা বোঝাতে চেয়েছে—রক্তের গুণে তারা শাসক, রক্তের দোষে আমরা শাসিত। এই কথাটাকে একটু আঁচড়ালেই এই সনাতনী মতবাদ থেকে বেরিয়ে আসে 'Race Theory,' তারই পরিণতি হিটলারী 'Blood Theory'-তে। সভ্যতা মান্‌লে মানতে হবে সংস্কৃতি বিকাশধর্মী। কিন্তু 'রেস্‌' বা 'ব্লাড্‌'-এর সনাতনী ব্যাখ্যা করলে বলতে হবে—বিকাশ নেই, সংস্কৃতিও নেই, আছে সনাতন ধর্ম, আছে শাশ্বত সংস্কার, বড় জোর, চক্রাকারে ঘোরা। যতদূর বুঝি, ভাষা-বিজ্ঞানের অধ্যাপক সুনীতিবাবু ওরকম অবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার মোটেই সমর্থন করেন না। অথচ সনাতন-বাদে বিশ্বাসের বশে সুনীতিবাবু Old gods never die এবং Blood is thicker than water প্রভৃতি অস্পষ্ট সূত্র দ্বারা তেমনিতর অস্পষ্ট ও অবৈজ্ঞানিক মনোভাবের প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেন। 'বৈদেশিকী'র আটটি কাহিনী থেকেও তা প্রশ্রয় পায়। অতএব, সুনীতিবাবুর পক্ষে পরিষ্কার করে বলা দরকার—এই সব জেনারেলিজেশন বা মোটা কথা কি অর্থে সত্য, আর

কি অর্থে মিথ্যা; ইতিহাস শুধু চক্রাকারে আবর্তন নয়; তা স্পাইরেলের গতিতে অভ্যুদয়, অগ্রগতি। তাই মেক্সিকোর নতুন জাগরণও শুধু পুরাতনে প্রত্যাবর্তন নয়, এক নতুন জীবনাদর্শ ও জীবনবিন্যাসের পরিচায়ক, যার পরিচয় পাওয়া যাবে প্রেসিডেণ্ট কার্ডেনাসের রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক সংগঠন দেখলে; এবং তারও আদর্শস্থানীয় সোভিয়েট রাষ্ট্রের সংস্কৃতি-বিষয়ক দৃষ্টি ও প্রচেষ্টা থেকে।

কিন্তু সমসাময়িক কালের এই রাজনৈতিক সাক্ষ্যই সুনীতিবাবু যেন দেখতে চান না—পাশ কাটিয়ে যেতে চান বর্তমান ইতিহাসের এই প্রধান রাষ্ট্রীয় সত্যের। 'ইউরোপ, ১৯৩৮' প্রথম খণ্ড পড়ে এই সংশয় মনে জেগে ওঠে।

রাজনীতি-বিমুখিতা

১৯৩৮ সালের ইউরোপ। সুনীতিবাবু আন্তর্জাতিক ধ্বনিতত্ত্বের সম্মেলনে চলেছেন বেলজিয়ামের গেন্‌টে (১৮ই-২২শে জুলাই)। কলকাতা ছাড়েন তিনি ২৬শে জুন। আর ঝড়ের বেগে ইতালি, ফ্রান্সের উপর দিয়ে ইংলণ্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক হয়ে দেখি নরওয়ে সুইডেন শেষ করে তিনি ১২ই আগস্ট চলেছেন ফিনল্যাণ্ডের দিকে। তাঁর ইচ্ছা ছিল—পরে যাবেন রুশ দেশে। কিন্তু সে দেশ থেকে অনুমতি পাওয়া যায়নি, তাই তিনি ফিরে আসেন তখন আবার ইউরোপের পথে—সে-সব কথা জানা যাবে পরবর্তী খণ্ডে। কিন্তু তবু ১৯৩৮-এর ইউরোপ—একটু পরেই "মিউনিকের" অধ্যায় সংঘটিত হবে, ইউরোপে হিটলার তখনি তার উদ্যোগ আয়োজন সম্পূর্ণ করছেন। ইউরোপের পথে পথে সুনীতিবাবুর জাগ্রত দৃষ্টি তা লক্ষ্য না করে পারছে না—ইতালি দেখছেন, ১৪ই জুলাইর প্যারিসের ছায়াচ্ছন্ন উৎসব দেখছেন; কিন্তু আরও অনেক বেশি দেখছেন তিনি ইউরোপের স্থাপত্য, ভাস্কর্য, শিল্পকলা—তার লোক-শিল্প, তার লোক-জীবন। আর দেখেও দেখেন না—১৯৩৮-এর ইউরোপ, মানে, সভ্যতার সংকট সমাগত। ইউরোপীয় সমাজ এক সংগ্রামের মুখে এসে ঠেকেছে—ইউরোপের সংস্কৃতি বাঁচবে কি মরবে তারই ঠিক নেই। যিনি এই সংস্কৃতিকে অত ভালোবাসেন তিনি যেন তার সে মুহূর্তের মৃত্যুর সংকট দেখতে পাচ্ছেন না—অন্তত তাকে শুধু একটা রাজনীতির সংকট বলেই পাশ কাটিয়ে যেতে চান, সংস্কৃতির সংকট বলে সম্পূর্ণ

বুঝতে চান না। হয়ত মনে করেন—সংস্কৃতি অমর, 'পুরানো দেবতারা মরেন না।' রাজনীতিকে এমন সঙ্কীর্ণ করে দেখলে সংস্কৃতি-বোধই অসম্পূর্ণ থাকে। আর শিল্প, সাহিত্য, লোককলা এমন কি, লোক-জীবনকেও শুধু এভাবে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে সে-দৃষ্টিকেও সীমাবদ্ধই বলতে হবে। 'ইউরোপ ১৯৩৮-'এর অসংখ্য কৌতূহলজনক কাহিনী পড়তে পড়তে আর অসংখ্য তথ্যে ব্যাকুল হতে হতে এই কথাই মনে পড়ে—এমন বহুমুখী বাঙালী মনস্বীও যেন রাজনীতিক দৃষ্টির অধিকারী নন, বুঝতে চান না এ ইউরোপ ১৯৩৮-এর ইউরোপ—১৯৩৮-এর—যে-কালে তাঁর মত পণ্ডিতকেও সোভিয়েট রাষ্ট্র নিজ দেশে প্রবেশের অনুমতি দেয় না (কেন, সাধারণভাবে তা Mission to Moscow থেকে বুঝতে পারি), যে-কালে দেশে দেশে ঘুরছে গোয়েবল্‌স্‌-গোয়েরিং ও জাপানের নানা রকম চর, অনুচর, গুপ্তচর অধ্যাপকরূপে ও ভ্রমণকারী বা টুরিস্টবেশে, এমন কি প্রাচ্য দেশে পর্যন্ত সে জাল ছড়িয়ে ফেলছে জার্মান আর্যামি ও জাপানী 'সহার্যের' (Honorary Aryans) চক্রান্ত।

"ভারত-সংস্কৃতির" অন্য দিক

কিন্তু 'আর্যামি'ও সুনীতিবাবুর চক্ষুশূল। তিনি যাকে সংস্কৃতি বলে মনে করেন তা আসলে শুধু কোনো জাত বিশেষের 'প্রভুত্ব' নয়; এমন কি সভ্যতার বিশেষ একটা রূপকে আঁকড়ে থাকা মাত্র নয়। তাঁর মতে মানুষের আত্ম-বিকাশের পথ বিচিত্র ; আর ভারত-সংস্কৃতির আসল কথাই হল 'যত জীব তত শিব'—'যত মত তত পথ।' বহুদিন যাবৎ অধ্যাপক সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় হিন্দু আদর্শ ও হিন্দু সংস্কৃতির এরূপ অর্থই করে আসছেন। সে-সময়ে অবশ্য হিন্দু মহাসভার বর্তমান কর্ণধারগণ অনেকে তাঁর লেখায় বা কাজে কৌতুক অনুভব করতেন। কারণ তখনো বাঙলায় নতুন শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়নি, শতকরা ৫৩ জনের প্রতিনিধিরা মন্ত্রিত্ব কবলিত করে বসেন নি, বিশেষত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও কলকাতা কর্পোরেশনের দিকে তাঁরা হাত বাড়াননি—আর তাই বর্তমান শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত বাঙালী হিন্দুর মাথায় টনক নড়েনি। সুনীতিবাবু তখনো হিন্দু সভার সভ্য ছিলেন—এ-থেকেই তাঁর অকপটতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ভারত-সংস্কৃতি বিষয়ে দৃষ্টি

যে আর্যামি বা নব্য-সনাতনী,—মানে, ব্যাক্তিগত ও পলিটিকাল চাল মাত্র নয়, তা মানতে বাধা নেই। কিন্তু তাঁর মতবাদের মধ্যে যে সত্যটি আছে, তা আংশিক—সে কথাই তাঁর মত বিজ্ঞানবিদ মনস্বীর অবজ্ঞা করা আশ্চর্যজনক।

সত্য সত্যই যতই বড় বড় কথায় হিন্দুশাস্ত্র মানুষের সমতা ঘোষণা করে থাকুক, আপামর সাধারণ সত্যই কি এদেশে জীবনযাত্রায় তেমন মর্যাদা পেয়েছিল কোনো দিন? এখনি কি পায়? সুনীতিবাবুর কথিত মোটা মোটা আধ্যাত্মিকতার কথাগুলো মিথ্যা নয়। এ সব ভালো ভালো কথা যে তবু কত অবাস্তব তা বুঝতে পারি এখনো যখন দেখি—এই বাঙলা দেশেই বর্তমান সময়ে ভারত-সংস্কৃতির সেই চিরদিনকার মার-খাওয়া অন্ত্যজেরা পথে ঘাটে ঘরে দুয়ারে কেমন করে মরল, কেমন করে মরছে। কোনো কালে পেয়েছে তারা হিন্দুধর্মের স্বরূপের খোঁজ? কিংবা পেয়েছিল এই ভারত-সংস্কৃতির আস্বাদন? না, তাদের জন্য ভারত-সংস্কৃতির প্রবক্তারা এখনো অনুভব করেন কোনো মানবীয় মমতা? আসল কথাটা মানতেই হবে,—অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতির মত এই ভারত-সংস্কৃতিও সমাজের অল্প লোকের সংস্কৃতি ছিল, সমাজের অধিকাংশই ছিল তা থেকে বঞ্চিত। এমন কি, আজ পর্যন্ত ভারত-সমাজের সেই নিম্নস্তর যে তিমিরে সে তিমিরে রয়েছে।

মুসলিম ভারতের ভীতি

দ্বিতীয় কথা: ভারত-সংস্কৃতি কি শুধুই বিশেষ করে ভারতীয় হিন্দু বা বড় জোর বৌদ্ধদের সংস্কৃতি? ভারতীয় ইস্‌লামেরও কি কোনো স্থান নেই এই ভারত-সংস্কৃতির মধ্যে? তর্কটা জটিল, তার অনেক উত্তর আছে, তাও জানি। সুনীতিবাবু ভারতীয় ইস্‌লামের নানা রূপে মুগ্ধ, ঈরানের সূফীবাদের রসগ্রাহী, আরব্য সভ্যতার রোমাঞ্চকর দিকও তাঁকে বিমুগ্ধ করে, এসব জানি। কিন্তু আটটি নিবন্ধে তিনি ভারত-সংস্কৃতির ব্যাখ্যা করলেন, তবু ইস্‌লামের 'ভারতীয়' নিদর্শনকে 'ভারতীয়' বলে গণ্য করলেন কিনা, এ সংশয় নিশ্চয়ই মুসলমান পাঠকের থাকবে। আর, যতই তর্ক করি না কেন, তখন নিশ্চয়ই তাঁরা মনে করবেন—আসলে অখণ্ড ভারত মানে এমনিতর এক ভারতীয় সংস্কৃতির সাম্রাজ্য, যাতে ইস্‌লাম-অবলম্বী ভারতবাসীর সংস্কৃতি নগণ্য হয়ে যাবে, ডুবে

যাবে, তলিয়ে যাবে। বলা বাহুল্য, এরূপেই জানা-অজানায় 'অখণ্ড ভারত'-বাদই পাকিস্তানবাদকে জাগিয়ে ও পুষ্ট করে তুলেছে। এ বিষয়ে আজ তর্কেও লাভ হবে না। ঈরানী, তুর্কী, মিশরী প্রভৃতি জাতিদের বর্তমান জাতীয়তাবাদের নজির তুলে ফল নেই। মনে রাখা দরকার—সে-সব দেশে মুসলমানরা প্রায় সর্বজয়ী, সংস্কৃতিতে বা আর্থিক ক্ষেত্রে কোনো প্রতিযোগীর ভয় তাদের নেই। ভারতবর্ষে ইস্‌লামধর্মীদের সে-সৌভাগ্য লাভ হয়নি, এদেশে তাঁদের পরাজয়ের ভয় অত্যন্ত বেশি ও বাস্তব। তাই, তাঁরা স্পেনের কথা তোলেন; প্যালেস্টাইনের কথা বলেন। তাঁরাও সুনীতিবাবুর ভারত-সংস্কৃতির ব্যাখ্যায় আশ্বস্ত বোধ করতে পারতেন—গৌরব বোধও করতেন—যদি আজ ইসলামই ভারতের জনসাধারণের একমাত্র ধর্ম হত—ঈরানের মত, মিশরের মত এ-দেশের মুসলমানরাও তখন অজন্তা-মোহেঞ্জোদরো নিয়ে গর্ব করতেন। সে অবস্থা তাঁদের এদেশে নয়, অতএব তাঁরাও ভারতীয়তা-বর্জিত ইসলামকীর্তি নিয়েই বাড়াবাড়ি করেন। এটি তাঁদের ভয় ব্যর্থতারই, fear and frustration বোধেরই মুখোশ-পরা রূপ। অবশ্য পাকিস্তান যখন ভারতভূমিরই অন্তর্গত ভূভাগ বলে তাঁদের ধারণা, তখন ভারতীয় মুসলমানদের ঐ দাবীতেই প্রয়োজন—ভারত-ইতিহাসে ও ভারত-সংস্কৃতিতে ভারতীয় মুসলমান কি ঐশ্বর্য দান করেছেন, তা ব্যাখ্যা করা, এদেশের হিন্দু-মুসলমান সকলকে তা বুঝানো।

এটি অবশ্য প্রধানত হবে ভারতীয় মুসলমান মনস্বীদের কাজ। কিন্তু এভাবে এই তিন খানা বই পড়তে পড়তে যে-কথা মনে জেগে ওঠে তা এই—এমন অকপট ও জ্ঞানবান্ পণ্ডিতের পক্ষেও এরূপ বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না কেন? কেন যিনি মেক্‌সিকোর পুরানো দেবতার পুনর্জন্মে উচ্ছ্বসিত হচ্ছেন তিনি কার্ডেনাস্-এর রাষ্ট্র-নীতি ও রাষ্ট্র-দর্শনের কথা একবারও স্মরণ করলেন না, উল্লেখও করলেন না? কেন তিনি ১৯৩৮-এর ইউরোপের উপর দিয়ে এমন নিরপেক্ষ চিত্তে চলে যেতে পারেন—সমাগত রাষ্ট্রীয় সংকটকে গৌণ বলে জ্ঞান করেন? কেন আবার ভারত-সংস্কৃতির আলোচনায় অগ্রসর হয়ে তিনি বুঝতে চান না এই সহজ সত্য যে, প্রশ্নটা শুধু বিশুদ্ধ সংস্কৃতিগত প্রমাণপত্রের প্রশ্ন নয়, প্রশ্নটা আজ প্রধানত ভারতীয় মুসলমান সাধারণের ভয়-ভরসার প্রশ্ন, অধিকার ও ক্ষমতার প্রশ্ন?—যে দেশ বহু-জাতিক দেশ সে-দেশে ঈরান, তুর্কীর নজির খাটে না; মিশর মেক্‌সিকোর নজিরে সেখানকার সংখ্যাল্প ও মর্যাদাবান্ জাতি

আশ্বস্ত হবে না ; রাষ্ট্রীয় চেতনা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে তারা বরং ক্রমেই বুঝবে যে, মূলত রাষ্ট্রগত আত্ম-স্বাতন্ত্র্য না থাকলে সংস্কৃতিগত স্বরাজও রক্ষা করা যায় না। এই সহজ ও বাস্তব সত্যও এমন মনস্বীরা বুঝবেন না কেন ?

কলোনির বর্ণান্ধতা

এই তিনখানা বই থেকে তাই মনে উদিত হল এই প্রশ্ন কেন আমাদের মনস্বীরাও রাষ্ট্রবিষয়ে উদাসীন হন, বর্ণান্ধ হন ? গত কয় বছরের যুদ্ধ সম্বন্ধে ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে আমাদের অন্যান্য পণ্ডিতদের যা কথাবার্তা শুনেছি তাতেও এ-প্রশ্নই বারবার মনে উদিত হয়েছে। তাঁরা কেউ রাজনীতির অধ্যাপক, কেউ বৈজ্ঞানিক, কেউ ব্যারিস্টার, কেউ সাংবাদিক,—সকলেই বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান্। তাঁদের যুদ্ধ বা রাজনীতি সম্বন্ধে আলাপ-আলোচনা শুনে অবাক হয়ে গিয়েছি, কৌতুকও অনুভব করেছি। সে-মনোভাবের একটা সহজ উত্তরও শেষে খুঁজে পেয়েছি। উত্তরটা সহজ হলেও সত্য ; তবে বিশদ করে না বললে তা ভুল বুঝবার কারণ থাকবে জানি। আমার বিবেচনায় এ-জন্য দায়ী—সাম্রাজ্যবাদী অভিশাপ। এই "কলোনির কেরানী জীবনে" আমরা বিশেষ সচেতন না হলে রাষ্ট্রীয়দৃষ্টিতে খাটো ও রাষ্ট্রীয়চিন্তায় পঙ্গু হতে বাধ্য। এদেশে আমরা শাসক নই, শাসনযন্ত্র চালাই না ; আমরা শাসন-যন্ত্রের কলকব্জা হই ;—যন্ত্র চালায় শাসকেরা, রাষ্ট্রের নীতি তারাই প্রণয়ন করে ; তারাই পলিটিক্‌স ভাবে। দুনিয়ার দশদিকের কথা ভেবে তারা পলিসি ঠিক করে, আমরা তাদের হুকুম তামিল করি ; কেন কি করি, জানি না, জানতে হয় না—জানা কেরানীর পক্ষে নিষ্প্রোয়োজন ; এমন কি তা জানা কেরানীর পক্ষে বিপজ্জনক। সরকারী ও সওদাগরী অফিসে আমরা এই একই কাজ করি। শাসনকার্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় দপ্তরখানায়, অক্ষর ও সংখ্যার মধ্য দিয়ে ;—ব্যবসায়ের বা রাজ্যের পলিসি ও পলিটিক্‌স দুইই ভাবনা কর্তৃপক্ষের, মানে, সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের তা চিন্তনীয়। বিশেষ করে এই কথাটা আবার বাঙালী সাংস্কৃতিক নেতাদের সম্বন্ধে বেশি প্রযোজ্য। শুধু মাত্র এক মুষ্টিমেয় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে আবদ্ধ থাকাতে আমাদের দৃষ্টি ও সৃষ্টি যেমনই কল্পনা-কুশল তেমনি বাস্তব-বিমুখ। আমরা সাহিত্য শিল্পে যে-কৃতিত্ব দেখাই বিজ্ঞানে সে-কৃতিত্ব দেখাতে

পারি না—জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্র আর মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু থাকা সত্ত্বেও আমরা জীবনে, চিন্তায়, সমাজবিন্যাসে, এমন কি আধুনিক কালের ইন্‌ডাস্‌ট্রিয়াল গবেষণা-মূলক নানা দিকে অগ্রসর হই—আমাদের অধিকাংশ বৈজ্ঞানিকই ভুল গবেষণার পাদটীকা রচনা করেন, ঘর-ভরতি করেন। ভারতবর্ষে অর্থনীতিক চিন্তার সূত্রপাত করেন, এদিকে রমেশচন্দ্র দত্ত, ওদিকে রাণাডে-দাদাভাই নৌরোজী প্রভৃতি। পশ্চিম উপকূলে দেশী শিল্পপতিদের অভ্যুদয়ে আজ তাঁদের চাহিদা মেটাতে একদল জাতীয়তাবাদী অর্থনীতিবিদ গড়ে উঠছেন; মাদ্রাসীদের মধ্যেও গড়ে উঠছেন বস্তুনিষ্ঠ গবেষক। কিন্তু রমেশচন্দ্রের পরে বাঙলায় অর্থনৈতিক গবেষণা প্রকৃতপক্ষে বানচাল হয়েছে। কারণটা এই—জমিদারীতন্ত্রের দেশে কৃষির উৎপাদনের জন্য জমিদার বা মধ্যস্বত্ব ভোগী শিক্ষিত শ্রেণী, কারও মাথা ব্যথা নেই। তারা খাজনা পাবেন, সরকারেরও রাজস্ব বাঁধা, তাই তারও মাথা ব্যথা নেই। অতএব, কৃষি সম্পর্কিত আর্থিক গবেষণা বাঙালী পণ্ডিতেরাও করেন না। আর, বাঙলার শিল্প বিদেশীদের দখলে। সেই শোষণের স্বার্থে—সে দিকে যতটুকু গবেষণা দরকার বিদেশীয় পত্রিকা (ক্যাপিটেল) ও পণ্ডিতদের মারফৎ শোষকগণ তা সমাধা করান। বাঙালী পণ্ডিতরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের এসব বস্তু-প্রধান ক্ষেত্রে করেন ফাইল তৈরী, মানে কেরানীগিরি। একেই রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'নকলের নাকাল।'

তাই আমাদের রাষ্ট্রীয় কর্মীদেরও প্রয়াস ও চিন্তাও অনেক সময় বড় জোর এরূপ 'বড় সাহেবের' সমালোচনা হয়ে দাঁড়ায়—আমেরি কি বল্‌লে, কিংবা চার্চিল কি করলে, এই হয় আমাদের আলোচ্য। তবু জীবনে তো পলিটিক্‌স্ থাকবেই,—তবে সে পলিটিক্‌স্ প্রধানত হয় অন্য রকমের। যেমন, 'বড়বাবু তার শ্যালাকে কেমন করে আমাদের উপরে প্রমোশন পাইয়ে দিয়েছে'; অথবা 'মেজ গিন্নী আজ কেমন নতুন গয়না গড়িয়ে ছোট গিন্নীকে দেমাক দেখিয়ে গেল।' এই প্রমোশনের পলিটিক্‌স্ হচ্ছে চাকরির পলিটিকস্—যথা,—রেশনের দোকান কত পার্সেন্ট কে পেল; এবং 'গিন্নী-গয়নার পলিটিক্‌স্' হচ্ছে গ্রামের ঘোঁটপাকানো 'হিন্দুকোড্' বা 'শ্রী-পদ্মের' পলিটিক্‌স্।

আমাদের সমস্ত পলিটিক্‌স্ই প্রায় সেই দুই ধরনের দৃষ্টি-বিভ্রমের পলিটিক্‌স্। 'কলোনির কেরানী রক্তে' যে-গঞ্জনা মিশিয়ে থাকে, আমাদের শ্রেষ্ঠ মনস্বীরাও তার থেকে মুক্ত হতে পারছেন না—এইটাই সাম্রাজ্যবাদের বড় অভিশাপ।*

* 'পরিচয়' ফাল্গুন ১৩৫১তে প্রকাশিত।

বাঙালীত্বের ভাঙা বনিয়াদ

পঞ্চাশে বাঙলায় মন্বন্তর গিয়েছে। একান্ন শেষ হল, যুদ্ধও শেষ হচ্ছে, ভাঙা বাঙলা যুদ্ধ, মন্বন্তর ও মহামারীর এ ক'বৎসরে কোথায় গিয়ে ঠেক্‌ল? আর, কোথায় গিয়ে ঠেক্‌ছে আমাদের এ-কালের বাঙলার সংস্কৃতি?

পঞ্চাশ তখনো শেষ হয়নি, কর্তৃপক্ষ বললেন 'বাঙলা মোড় ঘুরেছে।' আগেও বহুবার শুনেছি, তখনো আবার শুনলাম—'অবস্থা মুঠোর ভিতর এসেছে', 'আয়ত্তের মধ্যেই আছে।' তারপর একান্ন এগিয়ে চলল। কর্তৃপক্ষ সগর্বে শোনালেন, 'কই, দুর্ভিক্ষ কই এবার? দ্যাখো, অবস্থার উন্নতি হয়েছে।'

মন্বন্তর আর নেই। একান্নতে মন্বন্তর আসেনি। অবস্থার উন্নতি হয়েছে, তা স্পষ্ট। কলকাতার পথে পথে মানুষ মরে পড়ে নেই, পায়ে পায়ে জীবন্ত নর-নারীর কঙ্কাল ফুটপাথে, পার্কে, ঠেকে না; লঙ্গরখানা বন্ধ হয়েছে, ফ্যান ফ্যান করে কেউ দুয়ারে হানা দেয় না; যারা ছিল তারা চোখের আড়ালে 'শ্রমকেন্দ্রে' ঠাঁই পেয়েছে; ডাষ্টবিনে কুকুরে মানুষে মারামারি নেই; দেশী বিদেশী কারো আর সেই 'অসহ্য' দৃশ্য চোখে পড়ে না; খবরের কাগজে তাদের ছবি দেখেও কাউকে বারে বারে শিউরে উঠতে হয় না; তার এক কোণে লেখা থাকে সামান্য ক'জন দুস্থ হাসপাতালে কবে মরেছে। মফঃস্বলেও অবস্থার উন্নতি হয়েছে—বাজারে-বন্দরে পথে ঘাটে আর গ্রাম ছাড়া ও ঘর-ছাড়া লোক মরে পড়ে নেই, ঘাটে পথে স্টেশনে আর তাদের ভিড় নেই, মাঠে প্রান্তরে মড়ার উপর শকুনি পড়ছে না,—দাহ করবার লোক জোটে, কবর দেওয়া হয়, ঘর থেকে মৃতকল্প মানুষকে শেয়াল টেনে বের করে না; গ্রামের মানুষ গ্রামে ফিরে গিয়েছে—শহরে ফিরে আসেনি। এখানে ওখানে সরকারী 'শ্রমকেন্দ্রে' হাসপাতালে যা থাক্‌বার

তা আছে, নইলে "দুঃস্থ" আর নেই। বে-সরকারী রিলিফ সমিতিগুলোও তাদের কেন্দ্র বন্ধ করেছেন—দরকার নেই, অবস্থার উন্নতি হয়েছে। চালের দর কমেছে, কলকাতায় ও তার আশে পাশে ৪০ লক্ষ লোকের রেশনিং হয়েছে —চাল ডাল তারা পায়, চিনিও পায়। বাইরেও অনেক স্থানে বাঁধা দরে চাল পাওয়া যায়, দর নামছে। ধানের দর তো মাঝখানে অগ্রহায়ণ মাসে এত নামল যে, মনে হল আগেকার দিন বুঝি ফিরে আসছে। সত্যই তাই কর্তৃপক্ষ গর্ব করতে পারেন—কই? একান্নতে দুর্ভিক্ষ এল কই?

পঞ্চাশের পরে

একান্নতে দুর্ভিক্ষ ঠেকানো গিয়েছে। কি করে তা সম্ভব হল তা বোঝা দরকার। প্রথমত, পঞ্চাশে আমন ফসল অপর্যাপ্ত ফলেছিল; তা উধাও না হলে একান্নতে বাঙলার দুর্ভিক্ষ হবার কারণ ছিল না। দ্বিতীয়ত, কলকাতা আর তার চারদিক্‌কার শিল্পকেন্দ্রের ৪০ লক্ষ নর নারীকে এ বৎসর খাইয়ে রাখে ভারত সরকার; এজন্য বাঙলার বাইরে থেকে তারা ৬ লক্ষ ৪৬ হাজার টন আরও খাদ্য-দ্রব্য বাঙলায় আমদানী করেছিল। তৃতীয়ত, কলকাতা ও এই শিল্পকেন্দ্রে পঞ্চাশের শেষভাগ থেকেই রেশনিং চালু হয়—তাতে চাউল নিয়ে 'ফটকাবাজী'র সবচেয়ে বড় একটা সুবিধা মুনাফাদাররা হারায়। একান্নতে তখন তাদের একমাত্র ভরসা থাকে মফঃস্বলের বাজার—সেখানে রেশনিং চালু হয়নি। বাঙলা সরকার সেখানকার বাজারে 'বাঁধাদর' চালু রাখবার জন্য সামান্যই খাদ্য সংগ্রহ করবে (procurement) ঠিক করে; বাজার মোটের উপর ছেড়ে দেয় 'স্বাধীন ব্যবসায়ের' হাতে—মানে, যাদের হাতে ছিল তা পঞ্চাশেও। আবার, সরকারের পক্ষে কিনবার জন্য যে এজেন্ট ও কর্মচারিদল নিয়োগ করা হয় তাতে মফঃস্বলের বাজারে সেই ফটকাবাজারী মুনাফাদারদের দুয়ার খোলাই থাকে। এজন্যই একান্নতেও মফঃস্বলে চালের বাজার ঠিক 'বাঁধা' থাকেনি—বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে চট্টগ্রামের মত অনেক জায়গায় তা আগুন হয়ে ওঠে; আবার কার্তিক অগ্রহায়ণে বহু জায়গায় সাধারণ কৃষক সস্তায় ৩৲—৪৲ দরে ধান বিক্রি করতে বাধ্য হয়। তারপরে যেই ভারত সরকার কলকাতাকে আর খাওয়াবে না জানা যায় অমনি ফড়েরা চালের দর খানিকটা বাড়িয়েও ফেলে। মোটের উপর, কলকাতায়

রেশনিং থাকতে চালের মুনাফাদারদের অসুবিধা ঘটে এবং মফঃস্বলে রেশনিং না থাকতে তাদের বাঙলা দেশে যথেষ্ট ফাঁকও থাকে—চালের বাজার তাই স্থির হতে পায়নি।

একটা কথা তাহলে মনে রাখতে পারি : 'রেশনিং এদেশে চলে না'—এই ছিল গোটা উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ জুড়ে সরকারের বুলি। আমরাও অনেকে তাতে অপরোক্ষে সায় দিয়েছি; কারণ, 'রেশনিং' মানে সরকারের কর্তৃত্ব; আর এ সরকার বিদেশী, আমাদের বিশ্বাস-ভাজন নয়। তবু রেশনিং কলকাতায় চালানো শেষ পর্যন্ত সরকার স্থির করে। বাঙলা দেশে ৩৫ লক্ষ লোকের মৃত্যুর বিনিময়ে, কলকাতার পথে ঘাটে অনেক 'অসহ্য' দৃশ্য দেখে—রেশনিং মেনে নিতে হয়। ৪০ লক্ষ লোকের রেশনিং চালু হতেও চলল। বোঝা গেল—যুদ্ধের এই অস্বাভাবিক অবস্থায় 'রেশনিং' ছাড়া অন্য পথ নেই; যতক্ষণ অস্বাভাবিক অবস্থা থাকবে ততক্ষণ রেশনিংকে চালু রাখাই হবে সাধারণের বাঁচবার উপায়। তবু এখনো মফঃস্বলে তা সরকার চালু করতে চায় না। সেই পুরানো কথা—"হয় না।" ৪০ লক্ষ লোকের জন্য তা হয়েছে, ৭৭টি শহরের ২০ লক্ষ লোকের জন্য 'রেশনিং' হবে না কেন তবে? হয়ত, আরও কয়েক লক্ষ না মরলে তা হবে না।

একান্নর মহামারী

একান্নতে দুর্ভিক্ষ আসেনি কিন্তু আমরা বেশ জানতাম—দুর্ভিক্ষ গেলেও তার জের চল্‌বে কিছুদিন। পঞ্চাশে পথে বেরিয়ে পড়েছিল যারা তারা সবাই বেঁচে নেই। যারা বেঁচে আছে তারা সবাই ঘরে ফিরে যেতে পারেনি,—ঘরই তাদের অনেকের নেই। অনেকেই ঘর পরিবার বন্ধনের মমতা আর রাখে নি। অনেকে না খেয়ে আর অখাদ্য খেয়ে কর্মশক্তি হারিয়েছে; তাদের খেটে খাবার সামর্থ্যও নেই; জমি নেই, হালের গরু মরে গেছে, লাঙ্গলের ফাল নেই, লোহা নেই, বীজ নেই, ইত্যাদি। অর্থাৎ বাঙলার গ্রাম-জীবনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা দরকার, জীবনে এদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্য একান্নতে সরকার ঠিক করে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা খরচ করবে। তাতে সারা বাঙলায় চলে ২৬৮টি'র মত এদের 'শ্রমকেন্দ্র', ৬৭টির মত 'দুঃস্থ নিবাস', ৮৮টি

'শিশু-হাসপাতাল'। তারপর সরকারের নতুন স্কিম হয়—এসবের স্থলে ৬০টি 'কেন্দ্রীয় শ্রমশালা' খোলা হবে, তাতে ৬ হাজার দুঃস্থ খেটে খাবে। মনে রাখবার মতো কথা এই—'দুঃস্থেরা' চোখের আড়ালে গিয়েছে, কিন্তু বাঙলা দেশে একান্নতে দুঃস্থের সংখ্যা ৬ হাজার ছিল না, ছিল প্রায় ৬০ লক্ষ ; আর যাও বা টাকা সরকার এই 'পুনঃপ্রতিষ্ঠার' (Rehabilitation) কাজে খরচ করছে তার অনেকটাই যাচ্ছে নৌকা-তৈরীর ঠিকাদারী যারা পেয়েছে, 'শ্রমকেন্দ্রের' ভার যারা নিয়েছে, সে-সব লোকের উদরে। মন্বন্তরের শেষে আসে মহামারী। তার জন্য সরকার খোলে ১০০-করে রোগীর হাসপাতাল ৫২টি, ৫০-করে রোগীর হাসপাতালে ৫০টি ; ২০ করে রোগীর হাসপাতাল ৪৪১টি। মোট, ২৯,৬২০টি রোগীর চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে। ডাক্তার বিধান রায় থেকে সবাই বলছিলেন রোগীর সংখ্যা আজ হাজার বা লক্ষ নয়, ২ কোটি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরাও বল্‌লেন—তা'ই। একান্ন-র বাঙলা হল মহামারীর বাঙলা।

চোরাবাজারের রাজত্ব

'পঞ্চাশের শেষেই মহামারী এসেছিল—'একান্ন জুড়ে তার ধ্বংসলীলা চলে। পঞ্চাশেই মানুষ মরবার পথে এগিয়েছিল—তবু মন্বন্তরে যা মরেছে, মহামারীতে, শোথে, আমাশায়, কলেরায়, বসন্তে আর ম্যালেরিয়ায় তার চেয়েও অনেক বেশি মানুষ মরল একান্নতে। 'অবস্থার উন্নতি হয়েছে' যখন কর্তৃপক্ষ বলছিলেন, তখনই না-খাওয়া এবং অখাদ্য-খাওয়া মানুষ মরছিল। এরূপে পঞ্চাশ মন্বন্তরে গিয়েছে একান্ন মহামারীতে কালো হয়ে। উঠেছিল। একান্নর প্রারম্ভেই মনে হয়েছিল এরূপ হবে। তখনই যা পরিষ্কার হয়ে উঠল তা এই—ঔষধপত্র নেই, কুইনাইন কম কিন্তু তা অদৃশ্য হল ; তার যত রকমের নূতন রূপ বের হল, যা-কিছু বিতরিত হল কিছুই রোগীর হাতে পৌছল না ; এমন কি, কুইনাইন মিষ্টি হয়ে উঠল। এক কথায় যা, চালের ব্যাপারে পঞ্চাশে ঘটেছিল তা'ই ঔষধপথ্যের ব্যাপারে একান্নতে ঘটল—ঔষধ নেই, কোনো ঔষধই নেই, যত ঔষধই বাজারে ছাড়ুন, তা আর পাওয়া যাবে না।

কিন্তু শুধু ঔষধও নয়, একটার পর একটা জিনিস বাজার থেকে পালাতে লাগল। কাগজ, কয়লা, চিনি, সর্ষের তেল, কেরোসিন, এ সব আগেই দুষ্প্রাপ্য

হয়েছিল, একান্নতে বাজার থেকে সব ক্রমে ক্রমে মিলিয়ে যেতে লাগল। সুতোর কনট্রোল হল, সূতা আর বাজারে নেই। লবণ ক'মাসের মত মানুষ-গরুর ভাগ্যে জুটল না, অথচ কাস্টমস বিভাগের হিসাবে বলবে—এসময়ে বাঙলাদেশে যত লবণ আস্‌ছিল আগে কোনো সময়েই তত লবণ আসেনি। তাদের মতে তার কারণ —কেনা-দরের উপরে বিক্রয়ের যে দর সরকার বেঁধে দেয়, তাতে ব্যবসায়ীদের প্রচুর লাভ হচ্ছিল, তাই এত লবণ তারা আমদানী করছিল। কিন্তু তবু সে দরে—এবং তার দ্বিগুণ দরেও—লবণ বাজারে মিলছিল না মানুষের। অর্থাৎ যা বাঁধা দরের লাভ তার অপেক্ষাও বহুগুণ মুনাফার নেশা তখন পেয়ে বসেছে ব্যবসায়ীদের, লবণ তাই যাচ্ছিল চোরাবাজারে। পঞ্চাশে চোরাবাজারের প্রধান আশ্রয় ছিল চাল; চিনি, কাগজ, কয়লা, কেরোসিন ছিল তার অন্যান্য গৌণ উপকরণ। এখন দেখছি কাপড়েও সূতার চোরা-কারবারীর লুণ্ঠনোৎসব। একান্নতে চোরাবাজার ভাত-কাপড় ছাড়াও বাঙলার সমস্ত পণ্যদ্রব্যের উপরে রাজত্ব বিস্তার করলে—লাঙলের ধূর, ঘরের বাঁশ খড়, তাঁতীর সূতা, কামারের লোহা, কুমোরের মাটি পর্যন্ত ক্রমে চোরাকারবারীরা হাত করে বসেছে! একান্নর প্রধানতম সত্য এই—বাঙলাদেশে অন্য বাজারই আর নেই—চোরাকারবারী তার কবলে নিয়ে এসেছে অন্য সমস্ত বাজার; এমন একটি জিনিস আর বাঙলায় নেই যা সহজ পথে ন্যায্য দামে কিনতে পাবে কেউ।

'ন্যায্য দাম' মানে আগেকার দাম বল্‌ছি না—সে দাম তো বাঙলাদেশ থেকে বিদায় নিয়েছে। চোরাকারবারীর চাপে সরকার ধাপে ধাপে দাম বাড়িয়ে গিয়েছে; অর্থাৎ চোরাকারবারীর স্পর্ধাকে বাড়িয়ে তুলেছে, আগেকার সাধু কারবারীকে চোরা-বাজারে ভর্তি হতে বাধ্য করেছে, সাধারণকে বাধ্য করেছে সেই অন্যায় দামকে 'ন্যায্য দাম' বলে মেনে নিতে। এক মাসে যা ছিল চোরাবাজারের দাম, পর মাসে সরকার থেকে তাকেই করা হল 'বাঁধা দর' 'কণ্ট্রোলের দর'; তা'ই তখন 'ন্যায্য দর'। তাই পঞ্চাশে যা ছিল চোরা-বাজারের দর একান্নতে তা'ই হল বাঁধা দর, কন্‌ট্রোলের দর—তাকেই তখন বলি 'ন্যায্য দর।'

জিনিসপত্রের দুর্মূল্যতা

একান্নতে জিনিসপত্রের এই অসম্ভব দর, চোরাকারবারীর total victory বা সর্বগ্রাসী বিজয়ের প্রধান সাক্ষ্য ও তার স্বরূপ বোঝা দরকার। গরীব বা মধ্যবিত্ত বাঙলাদেশে এমন কেউ নেই আজ যারা এই বিক্রয় দরের দাপটে ওষ্ঠাগত প্রাণ নয়। কলকাতায় মাস ছয় আগে "স্টেটস্‌ম্যান" এই খাদ্য ও আবশ্যকীয় দ্রব্যের দরের তুলনামূলক হিসাব বের করে। তাতে আমরা দেখি—কাপড়ের হিসাব বাদ দিয়েই দেখি—পঞ্চাশের তুলনায় একান্নতে মাছের দর বেড়েছে শতকরা ১১১ হারে, দুধের দর বেড়েছে ৮৫ হারে, আর তরকারী ১১৮ হারে, মোটামুটি খাদ্যদ্রব্যের দর দুর্ভিক্ষের সময়কার তুলনায়ও বেড়েছে শতকরা ১০৪ হারে—যদিও রেশনিংএর ফলে শহরে চাল-ডাল চিনির দর তখনকার দর থেকে কম।

গরীবেরা দুধ, মাছ ছেড়েছে অনেক দিন, কাপড়ও পরতে পায় না। যুদ্ধের আগে তাদের চাল কিনতে হত ৩৲মণ, সে চালের বাঁধা দর একান্নতে হল ১২।/০ ডাল কিনতে হত /১৫ সের বাঁধা দর হল ||৫ ; তেল ছিল ।৶১০ সের, বাঁধা দর হল ১||/১৫ ; লবণ ছিল /৫ সের, বাঁধা দর হল ।৫ ; গুড় ছিল ৶১০ সের, হল ||/৫। দেখা গেল যুদ্ধের আগে যে সব জিনিসের দর ছিল ১০০৲ এখন সেখানে তাদের দর হয়েছে ৩৯৭৲। গ্রামের গরীবেরা আগে যেখানে ১০৲ সংসার চালাত, আজ সেখানে সংসার চালাতে হলে চাই অন্তত ৭৫৲ টাকা!

সত্য কথা, আগে দেশে চল্‌ত ২০০ কোটি টাকার নোট, আজ সেখানে চল্‌ছে ৮০০ কোটি কাগজের টাকা। অথচ জিনিসপত্র যে চারগুণ তৈরী হচ্ছে, উৎপন্ন বেশি হচ্ছে, মোটেই তা নয়। আমরা চোখে দেখছি কৃষিদ্রব্যের উৎপাদন বাড়েনি, পাটের ধান চালেরও উৎপাদন বাড়েনি। নতুন নতুন জমি আবাদী হয়েছে সামান্য, বরং পুরানো জমিও এবার অনেকখানে অনাবাদী পড়ে রয়েছে—কোনো ফসলই বেশি বাড়েনি। শিল্পজাতের অবস্থাও তা'ই। চোখে অবশ্য দেখছি যুদ্ধের জন্য কত নূতন জিনিসের চাহিদা। কিন্তু লক্ষ্য করছি না কত আগেকার শিল্প নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাই, সত্য কথা এই যে কোনো কোনো বিশেষ শিল্পে উৎপাদন বাড়ছে, কিন্তু মোটামুটি এখন যুদ্ধের আগের তুলনায় জিনিস দেশে কম উৎপন্ন হচ্ছে অর্থাৎ জিনিসের তুলনায় বাজারে টাকা চল্‌ছে চতুর্গুণ। তাই জিনিসপত্রের দরও বাড়তে বাধ্য—"মুদ্রাস্ফীতির" অবশ্যম্ভাবী ফল তা'ই। কিন্তু তার ফলে জনসাধারণ

জিনিসপত্র বিক্রি করে বেশি দাম পায় না। কারণ মুনাফা করে ঠিকাদার, ব্যবসাদার, মালদার প্রভৃতি তারাই, যারা সরকারের সঙ্গে সরাসরি কারবার করে, যারা যুদ্ধের সরবরাহে সংযুক্ত। এসব মুনাফাদারদের হাত থেকে কিছু মুনাফা বিশেষত গড়িয়ে পড়ে মাঝখানকার ব্যবসায়ী কারবারীদের হাতে। কিন্তু এই মধ্য ব্যবসায়ীর ঘাঁটির পর ঘাঁটি পেরিয়ে গরীব মজুর, গরীব কৃষক, গরীব কারিগর, মাস্টার, কেরানী এদের হাতে সেই কাগজের টাকা পৌঁছতে বেশি পায় না। এ কৌশলে গরীবের আয় তাই বাড়ে না, অথচ জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায়। তাদের ভাগ্য আরও খারাপ হয়, বাঙলা দেশের মত প্রদেশে—যেখানে যুদ্ধের চাহিদায় এরূপ টাকার কাগজের স্রোত বইয়ে দেওয়া হয়েছে, অথচ উৎপন্ন ফসল বা শ্রমজাত বাড়েনি। এসবের ফলে জিনিসের দর বাড়ে, কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় সে-তুলনায় বাড়ে না। এমন কি, সামরিক কাজে গেলেও যে মাইনে তারা পায় তা-ও হয় জীবনধারণের পক্ষে ক্রমে অপর্যাপ্ত। এই কথারই প্রমাণ দেখা গেল একান্নতে। সুস্থ-দেহ লোকেরা যে কেউ পারে সমস্ত বৃত্তি ছেড়ে দিয়ে গিয়েছে যুদ্ধের কাজে—সেখানে মাইনে বেশি। কিন্তু সে মাইনের তুলনায়ও জিনিসপত্রের দর বেড়ে গিয়েছে আরও বেশি। কাজেই তাদের সংসারের অভাব ঘোচেনি, তাদের পরিবারের অনাহার শেষ হয়নি। এদিকে শ্রমিকদের মাগ্‌গী ভাতা এ বছরে আর বাড়েনি। গ্রামের পাঠশালার শিক্ষক তেমনি আছে। হাই স্কুলের শিক্ষকেরা এ-আর-পি'তে এখানে সেখানে পালিয়েছে। যুদ্ধ থামলেই এসব লক্ষ লক্ষ লোক আবার বেকার হবে। অন্য দিকে কেরানীরা ধুঁকছে, ডাক্তার, কবিরাজ, উকিল, মোক্তার—নিজের পায়ে আর দাঁড়াতে পারে না। কৃষক চাষীর কথা, গ্রামের কারিগরের কথা আর বলা নিরর্থক ; এ দরে জিনিসপত্র কেনবার মত আয় এদের কারো নেই।

মুনাফার ফাঁস

এ সময়ে তাই গরীবেরা আরও গরীব হয়েছে। অথচ দেশে টাকার জোয়ারও চলেছে—তাতেই ধনীরা আরও ধনী হয়েছে। হিসাব করলে দেখব—যুদ্ধের পূর্বে যেখানে মালিক বছরে ১০০৲ লাভ করেছে, আজ সেখানে চটকলের মালিক লাভ করেছে ৯২৬৲, বস্ত্র শিল্পে ৬৪৫৲, চা-এ ৩৯২৲, চিনিতে ২১৮৲, কয়লায় ১২৪৲—

অতিরিক্ত মুনাফা-কর ফাঁকি দিতেও আজ তাদের ভাবতে হয় বেশি। [দ্রষ্টব্য যুদ্ধ থামতেই (১৯৪৫-৬) অতিরিক্ত মুনাফা উঠে গিয়েছে, কিন্তু অতিরিক্ত মুনাফা ও চড়া দর ঠিকই রয়েছে। লেখক, ২০।২।৪৬] এ মুনাফা অবশ্য উৎপাদন বাড়িয়ে তারা করেনি—উৎপাদন কমিয়েই বরং তারা করছে। কাপড়ের মতো কোনো কোনো জিনিসে উৎপাদন কমিয়ে তারা চোরাবাজার ফাঁপিয়ে তুলেছে—তাতে মাল তৈরী করতে হচ্ছে কম, অথচ মুনাফা হচ্ছে বেশি। যেমন, কাপড়ে গজ পিছু সুতার পরিমাণ কমিয়ে দিলে আরও লাভ বাড়ে। এসব চোরা-কারবার থেকে বাঙালী-অবাঙালী কোনো মালিক আজ বাইরে নেই। সকলেই ভাবে, টাকার জোয়র চলেছে, সবাই বেরিয়ে পড়েছে—"এ বেলা যা পারি করে নিই।"

তাই যে গরীবদের আয় বাড়েনি—'একান্নতে যাদের ১০৲ টাকার সংসার খরচ ৭৫৲ টাকায় উঠেছে—তারা সহজভাবে সেই "ন্যায্য দামেও" কোনো জিনিস এখন কিনতে পারে না। চোরাবাজারে ছাড়া জিনিস নেই—সমস্ত ব্যবসাপত্র আজ চোরাকারবারীর কবলে; আর, যারা এই চোরাকারবারীর সঙ্গে কোনোরূপে জুটতে পারছে না—তারা অসহায়, জীবনযাত্রায় আজ অক্ষম,—তারা মনে করছে —চোরাকারবারীই রাজা, তারই নিয়মকানুন সরকারও মেনে নেয়।

যুদ্ধের মধ্য দিয়ে এভাবে সাম্রাজ্যবাদের বিকৃত পরিবেশে চোরাবাজারে গড়ে উঠেছে এক বিকৃত ধনতন্ত্র।

চোরা-কর্মচারীর দৌরাত্ম্য

চোরাবাজার রাজাবাজার হল—তা দেখেছি। তার দরই হয় বারে বারে বাঁধা দর। কিন্তু কেন চোরাবাজার দমন হয়নি, তা বোঝা দরকার।

এমনিতেই বিদেশী শাসন কোনো দিন জনসাধারণের মুখ চেয়ে কাজ করে না। তাদের দ্রষ্টব্য হয় প্রথমত সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ, দ্বিতীয়ত সাম্রাজ্যবাদের দেশী তাঁবেদারদের তুষ্টি। কায়েমী দেশীস্বার্থকে তাই এই শাসনতন্ত্র একটু পথ ছেড়ে দেয় —রাজা, উজীর, জমিদার এবং বস্ত্র-মালিক, কয়লা-মালিক, চিনির-মালিক, চালের-রাজা প্রভৃতির মুনাফা বাড়িয়ে তাদের তুষ্ট করে; শ্রমিক, কৃষক, গরীব কারিগর, এমন কি, মাস্টার, কেরানী, চিকিৎসক প্রভৃতি উৎসন্ন গেলেও ফিরে তাকায় না। তৃতীয়ত, সাধারণ সময়েও এই আমলাতন্ত্র বেশি কর্মপটু ছিল না, তার অব্যবস্থা ছিল সুপরিচিত। চতুর্থত, তাদের সাধুতার

সুনাম বিচার-বিভাগ ও ডাক-বিভাগ ছাড়া অন্যত্র কোথাও ছিল না। এই পচ-ধরা বিদেশী আমলাতন্ত্র সম্পূর্ণরূপে এ-সব কারণে দুর্বিপাকে পড়লে একেবারে দেউলে হয়ে পড়ে, তার শাসনতন্ত্র শুধু শোষণযন্ত্রেই পরিণত হয়, হয়ে পড়ে নতুন-ধনী 'চোরা কারবারীর' হাতের অস্ত্র। পঞ্চাশের মন্বন্তরেই তা স্পষ্ট হয়েছিল। দিল্লীর এ্যাসেমব্লিতে আজ সেই 'ভিটে-ছাড়াবার' দিনের হিসাব-শূন্য চুরি নিয়ে কথা কাটাকাটি হচ্ছে। একান্নতে আত্মসমর্থনের গরজে এই শাসক সমাজের দুর্নীতির কথা লাট সাহেব স্বীকার করলেন। দুর্ভিক্ষ কমিশনের কাছে বারে বারে তা উল্লেখিত হল। এমন কি, বাঙলা সরকারও আভ্যন্তরীণ তদন্ত কমিশন বসিয়ে তা মেনে নিয়েছে। চোরাকারবারীর জন্ম বা প্রসার এতটা সম্ভবই হত না—যদি বাঙলার শাসনকার্যে কিছুমাত্র কর্মিষ্ঠ বা সৎ কর্মচারী থাকত। তাদের অকর্মণ্যতার কথা বলে লাভ নেই—মন্বন্তরের পরেও 'খাদ্য ফসল বাড়ানোর' আন্দোলন তাদের কৃপায় এতদূর এগিয়েছে যে, সাধারণ বছরের ফসলের তুলনায় একান্নতে আমন ফসল উৎপন্ন হয়েছে শতকরা ১০ ভাগ কম—অথচ তামাক, সুপারি, সব জিনিসের উপর ট্যাক্স বসেছে, তা আদায়ও হচ্ছে। কিন্তু বলদের জন্য বাজেটে ধরা হয়েছিল ২ কোটি টাকা; তার দু দশ লক্ষও কৃষকেরা চেয়ে চেয়ে পেল না—টাকা খরচও হল না। সেচ বিভাগের জন্য খরচ বরাদ্দ হয়েছিল ১০ কোটি (?) টাকা। তার ৪০ লক্ষও খরচ হয়নি—কৃষকেরা ছোট বড় যে-কোনো স্কিম করলে সরকারের তা মনঃপুত হল না; সরকারের নিজেদের স্কিমও তৈরী হয় না। পঞ্চাশের অভিজ্ঞতার পরেও গুদামে গুদামে লক্ষ লক্ষ টন খাদ্য দ্রব্য পচে শেষ হল—কারো কোনো দায়িত্ব নেই। 'বাঁধা দরের' জন্য চাউল কিনে একান্ন সালে বাঙলা সরকার সাড়ে একুশ কোটি টাকা ঘাটতি দিলেন। এই ঘাটতির টাকাটাও এসেছে দেশের গরীবের দেওয়া রাজস্ব থেকে—টাকাটা গেল অবশ্য ন্যায়বান এজেন্ট সাব এজেন্ট প্রভৃতির পেটে—চোরা কারবারীর তহবিলেই তা জমা হল। এসব শুধু অকর্মণ্যতা ও অপদার্থতা নয়—তার থেকেও বেশি কিছু। প্রত্যেক বড় আমলাই এই অবস্থার পিছনে ও সঙ্গে জড়িত। ঘুষ ছাড়াও আবার আছে কুব্যবস্থা—আত্মীয় পোষণ। চাল থেকে কাপড় পর্যন্ত সমস্ত ব্যবসায়ী নিয়োগের মধ্যে লাইসেন্স দানের পিছনে এই নীতি রয়েছে। খাদ্য সমিতিগুলো সাধারণের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ইউনিয়ন বোর্ডের চোর প্রেসিডেন্ট ও চোর সরকারী কর্মচারীর অস্ত্রে পরিণত করা হচ্ছে। সরকারী কর্মচারীরাও মনে করছে—স্বনামে,

বেনামে এ বেলা করে নিই যা পারি—তারও কি দৃষ্টান্ত দিতে হবে আর? তৃতীয় লক্ষণও এমনি স্পষ্ট। এমন ঘুষের রাজত্ব—অন্যায়ের, উৎকোচের, চরিত্রহীনতার উৎকটতা বোধ হয় নবাবী আমলে বা কোম্পানীর আমলের প্রথম যুগে ছাড়া দেখা যায়নি। ব্যাপার এতদূর গড়িয়েছে যে, নিজের গরজেই কর্তাদের এখানে ওখানে দু'একটি ছোট বড় কর্মচারীকে অভিযুক্ত করতে হয়েছে। কিন্তু সে নামে মাত্র—'পুকুর চুরি' বন্ধ করবারও ইচ্ছা নেই তাদের। থাকলে যারা চোরা কারবারের রাজা তারাই কি করে স্বনামে বেনামে সরকারের নানা বোর্ডে আসন পায়, সরকারের নানা অর্ডার ও লাইসেন্স পায়, সাজা পেলেও তাঁরাই থাকেন কাপড়ের, কাগজের, চাউলের, কয়লার ভাগ্য-বিধাতা? দুর্নীতি দলনের কিছুমাত্র ইচ্ছা থাকলে—কেন এমন আইন পাস হয় না যে, হাইকোর্ট থেকে একটা বিচার কমিশন বসুক—তাঁরা যে কোনো মন্ত্রী, সেক্রেটারী, সরকারী কর্মচারীর স্বনাম বেনামী জমা-খরচ তলব করবেন, তারপর বিচার বিবেচনা করবেন, যে-কোনো কর্মচারী বা মন্ত্রী মরলে বা পেন্সন নিলেও তার দশ বৎসরের মধ্যে তাদের ওয়ারিশদের সম্পত্তি ওরূপভাবে হাইকোর্টের কমিশনে বিচার করে দেখতে পারবে?

আসলে দমন করবার ইচ্ছা থাকলে নানারূপে সে-পথে কর্তৃপক্ষ অগ্রসর হতে পারেন। কিন্তু আমরা বুঝি—সে সাধ্যও তাদের খর্ব হয়েছে। বাঙলার মন্ত্রি-পক্ষও যেমন চোরা কারবারীর প্রভাবে আচ্ছন্ন, বাঙলার মন্ত্রি-বিরোধী পক্ষও তেমনি চোরাকারবারীর দ্বারা কবলিত। তারা একত্র হতে পারে চোরাকারবারের স্বপক্ষে—কন্ট্রোলের বিরুদ্ধে, রেশনিংএর বিরুদ্ধে, তাদের সাধ্য নেই দমন করে চোরা কর্মচারীদের। আর চোরা কারবারীর সর্বাপেক্ষা শক্তিমান সহকারী আজ এই চোরা কর্মচারী। মিলিটারি সাপ্লাইর নাম করা বোধ হয় নিষ্প্রয়োজন; সিভিল সাপ্লাই ও পুলিস বিভাগ আজ সমপর্যায়ে পড়ে; বাঙলা দেশে এমন বিভাগই কম যেখানে আজ ঘুষ ছাড়া কাজ হতে পারে—ঘুষ ছাড়া রেলের লইনে দাঁড়িয়ে টিকেট পাওয়া যায় না, গাড়িতে চাপতে পারা যায় না, স্টেশন থেকে সদর রাস্তায় বেরুনো যায় না, রিলিফের মাল নিয়ে চলা যায় না, ঘুষ ছাড়া গরীবেরা রেশন পায় না, রেশন কার্ড পর্যন্ত পায় না।

একান্নর সবচেয়ে বড় সত্য তাই এই যে, বাঙলার আর্থিক ও সামাজিক জীবন এক নূতন শক্তির দ্বারা কবলিত হয়েছে। সে-শক্তি চোরাকারবারী আর তার সহকারী চোরা কর্মচারী।

নৈতিক ও মানসিক পরাজয়

এই কথার অর্থ যে কি আমরা এখনো সম্পূর্ণ বুঝি না। কিন্তু পঞ্চাশের পরে একান্ন থেকে তা ক্রমে স্পষ্ট হল। এই নূতন কুগ্রহের উদ্ভবে বাঙলার নৈতিক মানসিক রূপও পরিবর্তিত হচ্ছে,—তার উপরে চেপে বসছে চোরা কারবারীর নৈতিক মানসিক আদর্শ—মানে তাদের আদর্শহীন, হৃদয়হীন আত্মসর্বস্ব বর্বরতা।

কথাটা সংক্ষেপেই বলি :—প্রথমত এই চোরা কারবারী বাঙলার সমাজে এল কোথা থেকে? যুদ্ধের ঠিকাদার, নানা ব্যবসায়ী আড়ৎদার, মালিক যুদ্ধের মধ্যে এসে জুটেছেন টাকা লুঠবার লোভে। তারা পূর্বের মতো কোনো একটা বিশেষ শ্রেণীর নয়—তাই বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর যা চিরদিনকার আদর্শ ছিল, যেমন, ব্যবসায়ে ন্যায়নিষ্ঠা, ইষ্টানিষ্টবোধ, স্বজাতির জন্য মমতা, দেবদ্বিজে ভক্তি, দরিদ্র-সেবা, জাকাৎ ইমান,—এসব কোনো বালাই তাদের রইল না। তারা এসেছে শুধু একটি মন্ত্র নিয়ে—'যা পারি করে নিই এ বেলা।' এ-মন্ত্রের সামনে দয়া নেই, মায়া নেই, মমতা নেই, পারিবারিক পবিত্রতা নেই; কোনো মানবধর্মই নেই; আছে শুধু লোভ ও আত্মসর্বস্বতা—'যা পারি করে নিই এ বেলা'। তাই পঞ্চাশে তারা মানুষকে মরতে দেখেছে, পরিবার সংসার ছারখার হতে দেখেছে, স্ত্রী-লোকের দেহ-বিক্রয় হতে দেখেছে—কিন্তু চালের মুনাফা ছাড়ল না। বরং জমি-জমা যেখানে পারল কিনতে লাগল, যেখানে দরকার নারীবিক্রয়ের ব্যবসাও চালাল। সেই নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিপর্যয়ের শেষে একান্নতে বাঙলার সমাজে যখন চোরাকারবার ও চোরা কর্মচারীর রাজত্ব স্থাপিত ছিল তখন কি দেখছি?—ক্ষুধার জ্বালায় যারা একদিন আপন প্রাণ বাঁচাবার জন্য মানমর্যাদা, স্নেহ মমতা ভুলে পথে বেরিয়ে ছিল তারা আর অনেকে সংসার ধর্মে, পারিবারিক আদর্শে ফিরে যেতে পায়নি—চায়ও না। অভাব রয়েছে—কিন্তু স্বভাবও নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারা দেখছে সব জিনিসের দাম আছে, দাম নেই শুধু মানুষের, মনুষ্যত্বের, মায়া মমতার, মান ইজ্জতের। তারা বুঝল—সমাজে রাজা আজ চোরা কারবারী—তারই দুর্নীতি তাই "ভদ্রলোকদেরও" ক্রমে গা-সহা হয়ে উঠেছে, অভাবে অনটনে তারা চোরা-কারবারীকেই এখন 'বাহাদুর' মনে করেন।

দেড়শ বছর ধরে চেষ্টায় বাঙালী ভদ্রলোক একটা জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছিল। তার বনিয়াদ খুব পাকা নয়। তবু তার সৃষ্টি ও আদর্শ ও ঐতিহ্য গৌরব করবার মত। কিন্তু সেই ভদ্রতাবোধ, ভদ্রলোকের আদর্শ—সেই স্বজাতি

প্রীতি, দেশপ্রেম, সেবাধর্ম, নর-নারায়ণের সেবা—সব কিছুতে সে আজ আস্থা হারাচ্ছে। মাস্টার, কেরানী, শিক্ষিত ভদ্রলোক—কোথায় তাদের আজ সম্মান বা বাঁচবার শক্তি? চোরা কারবারীর দিকে কে না তাকায় সহিংস ও সপ্রশংস দৃষ্টিতে? আর হৃতভাগ্য নিম্নবর্ণেরা—জেলেরা, যোগীরা, কামারেরা কুমরেরা, ঋষিরা, বাস্ত-কররা, গ্রামের মালী, গ্রামের মুচি, গ্রামের ডোম, হাড়ি?—যাদের মেয়েরা পঞ্চাশে শতে শতে আত্মবিক্রয় করেছে আজ কি বলতে হবে তাদের কথা? কে না জানে লেবারকোরের কথা, তার অর্থ? "শ্রমকেন্দ্রে" যে সরকারী-বেসরকারী কর্তাদের পাপ-ব্যবসা চলেছে, কে জানে না তার কথা? গ্রামে গ্রামে যে জঘন্য বৃত্তি আজ চোখ সওয়া হয়ে গিয়েছে, কে শোনেনি সে সংবাদ? এক এক জেলায় আজ শতকরা ৫ থেকে ১০ জন যৌনব্যাধিতে ভুগছে, বেশ্যালয় ছড়িয়ে পড়ছে যেখানে সেখানে, প্রকাশ্যে দেহ-বিক্রয় চলছে, 'অবাধ মিলন' শুধু একটা কথার কথা নেই, জারজ সন্তান শুধু একটা ব্যতিক্রম নয়— আর মনে করতে পারি কি—এ শুধু অঞ্চল বিশেষে বা নিম্নবর্ণের মধ্যে সীমাবদ্ধ? আমরা কি কলকাতায় কিছু দেখি না? জানি না—এই ভ্রষ্টাদর্শ বাঙালী "ভদ্রসমাজে" কি নীতি প্রশ্রয় পাচ্ছে?

এই নীতিই চোরা কারবারীর দান—তার মন্ত্রই পেয়ে বসেছে বড় ছোট সকলকে—'যা পারি করে নিই এ বেলা'; 'নিজে তো বাঁচি আগে।' প্রথম তাদের নীতি দেখে আমরা ভদ্রলোকেরা চম্‌কে উঠেছি, ঘৃণাও করেছি। তারপরে আমাদের ভদ্রলোকদের তা গা-সহা হয়ে উঠল। তারও পরে আমরা ভাবছি—'এই তো নিয়ম'—কিংবা 'সত্যিই বাহাদুর এরা।' আর সঙ্গে সঙ্গে ভাবছি—'যে করে পারি করে নিই এ বেলা; যে করে পারি নিজে তো বাঁচি।' এইখানেই বাঙলা দেশের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরাজয় সঙ্ঘটিত হল— চোরাকারবারীর ও চোরাব্যবসায়ীর আদর্শ এবার জয়ী হচ্ছে। বাঙালী ভদ্রলোকের ঐতিহ্য তলিয়ে যাচ্ছে।

ভাঙন-ধরা বাঙলা

তার বাস্তব ফল যে কত ভয়াবহ—এই একান্নতে আমরা তারও আভাস পেয়েছি। দেখলাম সমাজে সবাই ভাবছে 'করে নিই এ বেলা যা পারি' তার ফলে সমাজে যে-ভাঙন পঞ্চাশে ধরে আজ তা বেড়েই গেছে। 'যৌনব্যাধি' বেশ্যাবৃত্তি দয়া মায়ার অভাব, পারিবারিক টানের লোপ—এসব দেখছি।

দেখছি, ভাঙন-ধারা বাঙলাদেশে সমাজ থেকে নিম্নবর্ণের জেলে, মালো প্রভৃতিরা লোপ পেতে বসেছে। মধ্যবিত্তের একাংশ একেবারে নিঃস্ব হয়েছে, তারা কেউ কেউ বাদুড়-ঝোলা ঝুলছে যুদ্ধের নানা বিভাগে—কারিগরী ও কেরানী বৃত্তি করে। অন্য একাংশ উঠে গেছে উচ্চ স্তরে—চোরা কারবারের ফলে। বাঙলায় মধ্যবিত্ত রইল না। দেখছি ভাঙন ধরা সমাজে স্তরে স্তরে বিরোধ এবার ছড়িয়ে পড়ছে। পঞ্চাশে জোতদার-মহাজন কৃষকের জমি কিনে নেয়, এখনো সে তা ফেরৎ দিলে না। কিন্তু মন্বন্তরে, মহামারীতে আজ জনমজুর কম। তাই ক্ষেত মজুর হাঁকল—'মজুরী চাই দিনে ৫৲।' ফলে জোতদার আর জমি চাষও করালে না। আবার সাধারণ কৃষকও এ কারণেই পেল না ক্ষেতে খাটবার মুনিষ—তারও ক্ষেত প্রায় অনাবাদী যায়। অন্যদিকে আবার বড় জোতদার মহাজন জমি-শূন্য চাষীকে কিনে নেয় অগ্রিম ধান চাল দিয়ে। শর্ত এই—ফসলের দিনে চাষীকে মজুর খাটতে হবে এক আনা মজুরীতে। কিংবা এ কর্জ শোধ করতে না পারলে তার বিক্রী করতে হবে স্ত্রীকে। মানে "ভূমি দাসের" দিন ফিরে এল—কৃষক আর কৃষক রইবে না। কাপড় খাদ্য দ্রব্য, লবণ, কেরোসিন, কাঠখড়—এমনি করে জেলায় জেলায় দেখা গেল গুটিকয় চোরা কারবারী, জোতদার, ঠিকাদার ব্যবসাপত্র, জমিজমা সব একচেটিয়া করে নিচ্ছে। অথচ ছোট কৃষকে বড় কৃষকে, তাঁতীতে, কামারে, কুমোরে—পরস্পরে সকলেই লড়াই করছে, সকলেই ভাবছে—'নিজেতো বাঁচি'। ভাঙন ধরেছে সমাজের মূলে। এক জাতের মধ্যেও আর স্বজনবোধ নেই। দু'ঘর তাঁতী হয়ত ভালো করে খাচ্ছে এখন—যেখানে ছিল আগে পনের ঘর তাঁতী—আট ঘর মরে গেছে। বাকী সর্বস্বান্ত পাঁচ ঘর তাঁতীকে সেখানে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হল। অমনি পূর্বের দু'ঘরের আপত্তি—তাদের লাভের অঙ্কে ভাগ বস্‌বে আবার। তারা ভাবছে—আগে নিজেরা বাঁচি। এক একটা অঞ্চলে দেখা গেল—দলবদ্ধ হয়ে শেষ পর্যন্ত ডাকাতি করে ফিরছে আগেকার কারিগর ও কৃষকেরা। সে দলও আবার চালায় এক এক চোরাকারবারের কর্তা। মানে আমাদের গ্রামের আর্থিক বিন্যাস ভেঙে গেছে, শত খণ্ডে টুক্‌রো টুকরো হয়ে গেছে—সেই জীবনযাত্রা আর সমাজবোধ। এরই আর এক অংশে দেখতে পাই—গ্রামের লোকেরা লবণ পাচ্ছে না বলে তারা মাছ দুধ সরবরাহ করতে অস্বীকার করছে শহরে। শহরের কারবারীরা গ্রামের লোকের কাপড়, কেরোসিন, লবণ আটকে রেখে ভাবছে মুনাফার ভাবনা। মানে, শহর ও গ্রামে বেধে গেছে কলহ—

ভাঙন-ধরা বাঙলার জীবন এ-ভাবে আরও ভাঙতে শুরু করছে। পরিবার-প্রধান জাতি আমরা বাঙালী। শুধু স্ত্রী-পুত্র নয়, অনেক সময়েই একান্নবর্তী পরিবারে দশজনকে নিয়ে থাকি—ভাই, বোন, ভ্রাতৃবধূ, পিসী, মাসীও থাকেন। সেই পরিবার ভাঙছে। একান্নবর্তী পরিবারের স্থানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার যে স্থাপিত হচ্ছে, তাও নয়। আর্থিক ও নৈতিক বিপর্যয়ে মূল পরিবার বোধই ধ্বংস হচ্ছে---স্বামী, স্ত্রী, মাতা, কন্যা, পুত্রবধূ, শাশুড়ী—প্রত্যেকেই ভাবছে—'আগে নিজেত বাঁচি।' প্রত্যেকেই আত্মসর্বস্ব হতে চলেছে।—আর্থিক অভাব আছে, সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক আধ্যাত্মিক সংস্কারও ক্ষয়ে যাচ্ছে—স্বভাব নষ্ট হতে চলেছে।

এই ভাঙনের দাগ আরও স্পষ্ট আমাদের রাষ্ট্রআন্দোলনে ও রাষ্ট্রচিন্তায়। কি কংগ্রেস, কি মোসলেম লীগ—সবতাতেই তা সুস্পষ্ট। চোরা নেতৃত্ব কেমন করে সেখানে জাতীয় আন্দোলনকে নিঃশেষিত করছে এখানে তার বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন—তার উল্লেখই যথেষ্ট। তেমনি উল্লেখই কি যথেষ্ট নয়, এই ভাঙনের আঘাতে বাঙলার সংস্কৃতি আজ ফেটে পড়ছে নানা খণ্ডে?

তবু আমরা দেখেছি—পঞ্চাশের কঠিন সত্যকে রূপ দেবার জন্য অগ্রসর হন কতকাংশে পঞ্চাশ একান্নতে বাঙলার সাহিত্যিক ও শিল্পীরা। অভিশাপের সমস্ত রূপ তাঁরাও তখন পর্যন্ত সচেতন দৃষ্টিতে দেখে উঠতে পারেননি। তবু তাঁরা অনেকেই সাড়া দিয়েছেন প্রাণ দিয়ে, আবেগ দিয়ে। একান্নতেও তাঁদের প্রয়াস নিঃশেষ হয়নি। কিন্তু তবু দেখছি ঠিক এই সৃষ্টিক্ষেত্রেও ভাঙন সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের ও সাংবাদিকের ব্যবসায়ে চোরা-কারবারের ছায়া পড়েছে। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাঙন ধরা বাঙলার জীবনের পট—চোরা-কারবারের দুর্নীতি ও ছলনা—নানা বড় বড় বুলির মারফৎ সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও বিস্তার লাভ করেছে। বাঙলার সংবাদপত্র জগতে তাকালেও এই কথার সমর্থন পাই না কি? কোনো সংবাদপত্র একালের চোরা কারবারী ও চোরা কর্মচারী, দেশী বিদেশী সামরিক ও বেসামরিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলল না। ইতিহাসের কাছে এই লজ্জা কি আমাদের রাখবার মত? অথচ বাঙ্গলার সংবাদপত্রের ঐতিহ্য কত অসাধারণ। রামমোহন থেকে মতিলাল ঘোষ ও দেশবন্ধুর নাম তার সঙ্গে জড়িত। একটা কাগজও কি আজ দু-দশ হাজার টাকার সরকারী বেসরকারী বিজ্ঞাপন হারাতে স্বীকৃত

নয়? দু' এক হাজার টাকা জরিমানা দিতে পারত না তারা কেউ এই অভিশাপের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলে?

হয়ত দিত—কিন্তু পঞ্চাশের পরে একান্নতে যে-শক্তি বাঙলার জীবনকে কবলিত করছে তার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন হতে আমরা পারিনি। তাই সংস্কৃতির বাহকদেরও এই আত্মত্যাগ ও কর্তব্য পালনের সঙ্কল্প জাগেনি। আসলে, এটাও সেই ভদ্রলোকের নৈতিক আধ্যাত্মিক পরাজয়েরই আর এক দিক। এই পরাজয়ক্ষণেও—ভাঙনের মুখেও—বাঙলার ভদ্রসমাজ, শিক্ষিত সমাজ,—বাঙালী সাধনার যারা বাহক, ঐতিহ্যের রক্ষক— তারা কঠিন বাস্তব সত্যকে গ্রহণ করতে চায় না, জীবনসত্যকে অঙ্গীকার করতে সঙ্কুচিত, আত্মসমর্পণেই আত্মরক্ষার পথ সন্ধান করছে। আমরা দেখছি না—বাঙলার ভদ্রলোক ডুবছে—ডুবছে তার ভদ্রতা, শিক্ষা, দীক্ষা, সংস্কার, সংস্কৃতি। আর্থিক জীবনে যে চোরা বালির উপর কর্ণওয়ালিস্ বাঙালী ভাগ্যের পত্তন করে সেই জমিদারীতন্ত্রের সৌভাগ্য দেড়শ' বৎসরে আজ দেউলে হয়ে গিয়েছে—জমির উপস্বত্ব থেকে আজ মধ্যবিত্তের জীবন চলে না, সরকারী বা বেসরকারী চাকরিও আর মিলে না; অথচ এই আধা-সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে তার ভাগ্য বাঁধা; তাই কৃষির অধোগতি হয়েছে, দেনায় ডুবেছে কৃষক, নতুন যুগের কল-কারখানায় বাঙলা দেশে বাঙালী মালিকও নয়, শ্রমিকও নয়, তারা হয়েছে জনকয় কেরানী ফড়ে দালাল। জমিদারীতন্ত্রের পতন-ফলেই বাঙলার জীবনক্ষেত্রে পঞ্চাশ-একান্ন থেকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে চোরাকারবারী আর চোরা কর্মচারী—আর তাদের চোরা নীতি।

এই বাস্তব চেতনা নিয়েও যদি আজ আমরা পা বাড়াই—তা হলেও হয়ত এই ভাঙন রোধের চেষ্টা আমরা করতে পারি—নূতন আর্থিক বনিয়াদ স্থাপন করে, জমিদারীতন্ত্রের মূলোচ্ছেদ করে আর শ্রমশিল্পের গোড়াপত্তন করে, বিজ্ঞানের ও শিল্পের নূতন সংগঠন করে—বাঙালী সংস্কৃতির রূপান্তর করে।

বাঙালী সংস্কৃতির সংকট

শিল্পকর্মের একটা আভ্যন্তরীণ সমস্যা বরাবরই আছে। খাঁটি সৃষ্টিতে শিল্পের বস্তু (কথাবস্তু theme বা ভাববস্তু idea) এবং রূপায়ণকলা, (form) এ দু'য়ের সম্পূর্ণ সমন্বয় (synthesis) ঘটে। তা'হলেই সব শুদ্ধ লেখা, গান বা নৃত্য একটা অখণ্ড রূপ লাভ করে। এরূপ সমন্বয় লাভ না করলে কোনো শিল্পনিদর্শনই শিল্প হিসাবে সত্য হয় না, অর্থাৎ তা 'সৃষ্টি' হয় না। তাই শিল্পের বরাবরকার সমস্যা ও সাধনা হ'ল এই বিষয়বস্তু ও রূপায়ণকলার দ্বন্দ্ব ও তার সমন্বয়।

সংকট কালের সংস্কৃতি

এ-দ্বন্দ্ব আরও জটিল হয় যখন সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব তীব্র হয় তখন শিল্পীর নিকট বিষয়বস্তু রূপায়ণকলা সব অনিশ্চিত হয়ে ওঠে। কারণ, শ্রেণী-বিভক্ত সমাজে শিল্প শাসক শ্রেণীর মত ও রুচি মত' কথা বলতে অভ্যস্ত হয়েছে। শিল্পী তাঁর বিষয়বস্তু, তাঁর রচনাপদ্ধতি সবই সেই উচ্চশ্রেণীর দাবী মত' গ্রহণ করেছেন, গড়ে তুলেছেন। অবশ্য সে শাসক শ্রেণী যখন সমাজে সৃষ্টির অগ্রদূত ছিল তখন তাদের দানে শিল্পেরও প্রসার ঘটেছে; তাতে রচনারীতির ও রূপায়ণকলারও অনেক উন্নতি হয়েছে। যেমন ধনিকতন্ত্র বাস্তব সৃষ্টির ক্ষেত্রেও অনেক কল-কারখানার উন্নতি করেছে, মানসসৃষ্টির ক্ষেত্রেও গত এক শতাব্দীতে শিল্পীরা রূপায়ণকলায় অনেক বৈচিত্র্য এনেছেন।

কিন্তু এখন সেই ধনিক শাসকশ্রেণী সমাজে সৃষ্টিশক্তি হারিয়েছে, অথচ

তারা শিল্পকে ছাড়বে না। শিল্পও এ অবস্থায় বাস্তব নূতন শক্তিকে, বিপ্লবী গণ-শক্তিকে কি ভাবে গ্রহণ করবে, তা বুঝতে পারছে না। শিল্পীরা দিশাহারা হয়ে তাই নানাভাবে 'পলায়নী বৃত্তির' আশ্রয় নেন। এজন্য দুদিকেই তাদের সংকট দেখা দেয়। প্রথমত, শিল্পীরা এই নতুন বাস্তব স্রষ্টাদের জীবন ও জীবনবস্তু চেনেন না। দ্বিতীয়ত, নতুন বিষয়বস্তু বলবার মত নতুন ভাষা বা কলাকৌশল দরকার, শিল্পীরা তাও হাতের কাছে তৈরী পান না। এযুগে মুশকিল হয়েছে তাই এই যে, এযুগের শিল্পের বিষয়বস্তু (content) ও তার রূপায়ণকলার (form) সম্পূর্ণ খোঁজ শিল্পীরা এখনো পাননি। তাই দুয়ের সমন্বয়ও তাঁরা প্রায়ই করে উঠতে পারেন না। Tradition বা পুরোনো নজিরও এদিকে তাঁদের বেশি কাজ দেয় না। তাই নতুন বস্তু ও নতুন কলাকৌশল নিয়ে তাঁরা পরীক্ষা করতে থাকেন। এ জন্যই তাঁদের সৃষ্টি অনেক সময় সার্থক হয় না, আর এজন্যই তাঁদের প্রয়াসে পরীক্ষা এত বেশি দেখা যায় ; আর সে পরীক্ষা অনেক সময়ই উদ্ভট হয়।

অবশ্য তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। প্রকৃতির জগতেও অধিকাংশ পরীক্ষাই নিষ্ফল ও উদ্ভট। কিন্তু সেই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই নূতন সৃষ্টি বিকাশ লাভ করে, নূতন জীব জন্মে, জীবজগতে বিবর্তন ঘটে। অনেক পরীক্ষা, অনেক ঝাড়াই-বাছাই করে এরূপে এক-একটি নূতন ধারা আবিষ্কৃত হয়। আজ শিল্পের জগতেও সেইরূপ পরীক্ষা, ঝাড়াই-বাছাই চল্‌ছে। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়েই নূতন সমাধান, নূতন সমন্বয়ের দিকে শিল্পীরা অগ্রসর হচ্ছেন—এইটাও ভুলবার কথা নয়।

সংস্কৃতি বিভেদ

যে সমাজে শ্রেণীতে শ্রেণীতে জীবনযাত্রায় ও জীবনবোধে যত বেশি তফাৎ সে সমাজে শিল্পীদের পক্ষেও তাই আভ্যন্তরীণ সমস্যা তত বেশি। শিল্পের মূলস্থ অভ্যন্তরীণ সমস্যা সেখানে জটিলতর হয়ে ওঠে সমাজের অভ্যন্তরীণ বিভেদের জন্য। কারণ, শাসকের ও শাসিতের জীবনযাত্রা একরূপ নয়, দু' শ্রেণীর আদর্শে, ধ্যান-ধারণায়, আশা-আকাঙ্ক্ষায়ও তফাৎ থাকে প্রচুর। শাসকের সংস্কৃতি চায় শাসকশ্রেণীর সেই জীবনের ও ভাবনার প্রয়োজন মেটাতে ; উচ্চস্তরের লোকদের এ দাবীকে জেনে না-জেনে মেনে নিয়ে তা গড়ে উঠে উচ্চাঙ্গের সংস্কৃতি রূপে। তার বিষয়বস্তুও প্রায়ই উচ্চশ্রেণীর ;

তার রূপায়ণও উচ্চকলার। শাসিতদের জীবনযাত্রা কিন্তু থাকে তার থেকে দূরে। শাসিতদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছাপ "শাসক-সংস্কৃতি"তে প্রায়ই পড়ে না, কিংবা পড়লেও পড়ে পরোক্ষে। তবু শাসিতেরও জীবনযাত্রা আছে, তারও প্রাণ খোঁজে আনন্দ। আর তার জীবনবস্তু ও সেই প্রেরণার তাগিদে সৃষ্টি হয় শাসিতেরও গাথা, গান, নৃত্য, চিত্র, নানা কারুকলা। অবশ্য তার রূপায়ণে সূক্ষ্ম অলঙ্করণের চিহ্ন থাকে না প্রায়ই, কিন্তু থাকে প্রাণের সরস ছাপ, সহজ চেতনার সবল প্রকাশ, এমন কি, অনেক সময়ে স্থূল মোটা মোটা দাগ। কিন্তু কথাটা এই, যে-সমাজে শ্রেণীভেদ যত বেশি সে-সমাজে তার এ দু'সংস্কৃতির মধ্যেও বিভেদ তত অনিবার্য হয়। সমাজ যখন বিভক্ত সংস্কৃতিও তখন বিভক্ত হওয়াই স্বাভাবিক। মোটামুটি শ্রেণী বিভক্ত সমাজে এরকমের একটা সংস্কৃতি-বিভেদ (dichotomy) দেখা যায় ; যেমন, শাসকের সংস্কৃতি ও শাসিতের সংস্কৃতি বা লোক-সংস্কৃতি।

এ যুগে লোকজীবন (folk) ও শাসকজীবনে (ruling class) এই তফাৎ আমাদের দেশে বাঙলায় নানা কারণে খুব বেশি বড় হয়ে পড়েছে,— ভারতবর্ষের অন্যত্র কিন্তু ততটা হয়নি। বাঙলার সংস্কৃতি-সংকটের ও শিল্প-সংকটের মূলে আছে বাঙলার এই অদ্ভুত সমাজ-সংকট।

ভারতবর্ষ ও বাঙলার বিভিন্নতা

ভারতবর্ষেও বরাবরই শাসকে শাসিতে তফাৎ ছিল। সামন্ত যুগের আসল রূপ ভারতবর্ষের মধ্যে বাঙলার বাইরেই অন্যত্র বেশি প্রকট হয়। সে সব দেশে তাই একদিকে একটা ছিল রাজসভা, আর একদিকে লোকজীবন। একদিকে দরবারী আর্ট বা courtly-art, আর দিকে লোক-শিল্প বা folk art। দু'এতে অবশ্য কিছু কিছু যোগাযোগ ছিল ; কিন্তু দু'এর পার্থক্যও ছিল সুস্পষ্ট। মুসলমান যুগে সেই দরবারী আর্ট শহুরে (urban) ব্যাপার হয়ে পড়ল। কিন্তু লোক-শিল্প তাতে বাধা পেল না—পল্লীতে তার স্থান পল্লী-শিল্পরূপে (rural) অব্যাহত রইল। বাঙলাদেশে দরবারী আর্ট ততদিন পর্যন্ত খুব বেশি বিকাশ লাভ করে নি। ভারতচন্দ্রের মত একআধজন শেষ দিকে আবির্ভূত হয়েছেন, এক-আধটুকু ওস্তাদি গানের আসর হয়েছে বিষ্ণুপুরের মত কোথাও কিংবা বারেন্দ্র

জমিদারদের আশ্রয়ে। কিন্তু বাঙলার জমিদাররাও থাক্‌তেন পল্লীতে। মোটের উপর তাই জমিদার বা Patron-এর পোষিত বাঙালী শিল্পীদের সঙ্গে বাঙলার পল্লীর ও লোক-শিল্পীরও যোগাযোগ নিকটতর ছিল। বাঙলার মুসলমানও প্রধানত শহুরে নন, পল্লীবাসী; আর বাঙলার সভ্যতা ছিল মোটের উপর পল্লী সভ্যতা। মঙ্গল গান, ভাসান গান, গাথা রচনা, কীর্তন, কথকতা, যাত্রা, কবি, আউল বাউলের গান এসব পল্লীশিল্প মোটামুটি অব্যাহত চলেছে—বিশেষ অঞ্চলে তার বিশেষ রূপ প্রকটিত হয়েছে, যেমন গম্ভীরা, ঝুমুর ইত্যাদি। বাঙলার লোকজীবন একদিক থেকে তাই পূর্বে অনেকটা অবিভক্ত ছিল। তাই এখানে সামন্ত শাসকের ও শাসিত জনেরও জীবনবোধে তফাৎ ছিল অন্য দেশের তুলনায় অল্প।

ইসলামের অনুশাসন

কিন্তু এই তফাৎ যেমন আগেকার দিনে কম ছিল তেমনি পরের দিকে ইংরেজ আমলে কিন্তু অনুরূপ তফাৎ বাঙলার লোকজীবনে ক্রমশ বড় হয়ে উঠতে লাগল। প্রথম এক তফাৎ ক্রমশ দেখা দিল বাঙলাদেশে, বিশেষ করে পূর্ব বাঙলায়, শরিয়তি ইস্‌লামের প্রসারে। ইংরেজ আমলেই তা বেশি করে ঘট্‌তে থাকে। বেশি তা প্রসারিত হয়েছে গত দেড়শ বৎসরে। তার ফলে (১) বাঙলাদেশ থেকে লোকনৃত্য খুব দ্রুত লোপ পেয়ে গেল। (২) পালা-গান ভাসানগান ইত্যাদি রইল বটে,—আজও তা চল্‌ছেও—কিন্তু মুসলমান ধর্ম মতে তা অন্যায়, এ বোধ মুসলমান সাধারণের ক্রমশই বাড়ছে। (৩) চিত্রকলা প্রায় বর্জনীয় হয়ে উঠেছে। অবশ্য বাঙলার লোকজীবনের আর্থিক বনিয়াদ একই। বাঙলার হিন্দু-মুসলমানের জীবনযাত্রা জমিদারীতন্ত্রের চাপে একই স্তরে চলেছে। কিন্তু ধর্মগত কারণে ও লোকানুষ্ঠানে সে-জীবনও দুরকম হয়ে পড়েছ—একই স্তরের জীবনযাত্রার মধ্যে একটা খাড়া বেড়া ক্রমশ গড়ে উঠেছে। আর তার ফলে সেই বেড়ার বাধায় লোক-শিল্পের ধারা আর স্বচ্ছন্দ বা ব্যাপক বইতে পারছে না। বাঙলার লোক-জীবনে ও তার সংস্কৃতিতে আগেকার যুগের অখণ্ডতা এভাবে ভেঙে গেছে—এই একটি কারণে গত দেড়শ' দু'শ বছরের মধ্যে।

ব্রিটিশের শাসন

বাঙলার জীবনে দ্বিতীয় তফাৎ ঘট্‌ল ইংরেজ আমলে জমিদারী প্রথার প্রচলনে, শেষে "ভদ্রলোকদের" আধিপত্য বিস্তারে এবং "বাবু-কাল্‌চারের" অভ্যুত্থানে। বাঙলার জীবনযাত্রায় এ প্রথায় একটা স্তরগত তফাৎ ঘটল—মধ্যস্তর বলে একটা স্তর দেখা দিল, জনজীবনের উপরে তা একটা ডাঙার মত জেগে উঠ্‌ল। ঠিক এমনতর একটা 'ভদ্রলোক' শ্রেণী ভারতবর্ষের অন্যত্র নেই। এবং বঙ্কিমচন্দ্র থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে "বাঙলার কালচার" গড়ে উঠেছে—তার নিজস্ব সাহিত্য, সংগীত, চিত্রকলা শেষে নৃত্যকলা পর্যন্ত নিয়ে—তার মত জিনিসও ভারতবর্ষের অন্যত্র সৃষ্ট হয়নি। এরই নাম বাঙলার কাল্‌চার। এই বাঙলার কালচার অবশ্যই সম্পূর্ণরূপে বাঙলার নয়, মানে, বাঙলার লোক-জীবনের থেকে তা স্বতন্ত্র। তার বাহনরা ভদ্রশ্রেণী, খানিকটা exotic; সে সংস্কৃতিও eclectic। তার প্রেরণার উৎস পাশ্চাত্য সাহিত্যতত্ত্ব ও শিল্পাদর্শ, মাত্র দু'এক ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতবর্ষের চিত্র বা অন্য প্রদেশীয় নৃত্য। এ-কালচারের বস্তুও বাঙলার ভদ্রজীবন, লোকজীবন নয়। মোটের উপর এই শিল্পের সঙ্গে বাঙলার লোকজীবনের ঘনিষ্ঠ যোগ নেই। অথচ বাঙলার লোক-শিল্পও এর আওতায়, এর পরোক্ষ প্রভাবে আরও মৃতপ্রায় হয়ে পড়ল। তার জীবনীশক্তি আরও হ্রাস পেল। যেমন ভদ্রলোকের আধিপত্য বিস্তৃত হল তেমনি আগে-কার যুগের লোক-সংস্কৃতি, লোক-শিল্প পল্লীতে পল্লীতে ম্লান হয়ে যেতে লাগল।

"লোক-সংস্কৃতি" বনাম "বাঙলার কালচার"

এভাবে কতকটা শরিয়তি ইস্‌লামের আক্রমণে কতকটা "ভদ্রলোকি" সংস্কৃতি বা "বাঙলার কাল্‌চারের" উদ্ভবে—বাঙলার লোকজীবন আর অখণ্ড নেই, তা খাড়া ও পাশাপাশি দু'ভাবেই ভাগ হয়ে পড়েছে। আর বাঙলার লোক-শিল্পও এই কারণে অব্যাহত নেই, প্রাণবান্‌ নেই।

অবশ্য বাঙলার এই খণ্ডিত লোকজীবনও ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে, প্রাচীন শিল্পরূপ দেখে লোক আর সন্তুষ্ট থাকৃতে পারছে না। তারা নূতনতর, উন্নততর, রূপ খুঁজ্‌ছে। আমাদের বাঙলার কাল্‌চার লোকসাধারণের সে দাবী মেটাতে

জানে না, মেটায়ও না। অবশ্য জনগণেরও রসবোধ অতটা গঠিত হয়নি, মার্জিত হয়নি। তাদের রসবোধ ও তৃষ্ণাকে কিন্তু ব্যবসাদারী বণিক্ দল অবজ্ঞা করে না। তারা ব্যবসায়ের সুযোগ ছাড়ে না—ব্যবসায়ের দায়ে তারা এই জনসাধারণকে টানে। তাদের তৃষ্ণা মেটায় এখন ব্যবসাদারী শিল্প—সিনেমা, দেশী ও বিলাতী ছবি, পুতুল প্রভৃতি। এ রূপে ব্যবসায়ীরা ধনিকতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী লোক-সমাজের এই চাহিদাকে কাজে লাগাচ্ছে—ব্যবসা চালাচ্ছে, আর নিজের স্বার্থে শিল্পকে বিকৃত করছে। কিন্তু মানতে হবে এভাবেও লোকের কতকটা ক্ষুধা মিটছে। কারণ, মনে রাখতে হবে—"বাঙলার কাল্চার" সেই ক্ষুধাকেও গ্রাহ্য করে না, সে দাবীও মেটায় না। ফলে বাঙলার লোক-সংস্কৃতির অবস্থাটা দাঁড়িয়েছে ইংরেজ আমলে এইরূপ :—(ক) তা আপন ধারায় বেড়ে উঠতে পারেনি, শুকিয়ে যাচ্ছে ; (খ) বেড়ে উঠতে না পারাতে তার টেক্‌নিক সামন্ত-যুগের রয়েছে, 'সেকেলে' ও স্থূল থেকে গেছে—তা নতুন বস্তু গ্রহণের মত নমনীয়তা বা শক্তিলাভ করছে না ; (গ) আর নতুন বুর্জোয়া ব্যবসাদারী শিল্প (commercialised art) সুযোগ পেয়ে দু'ভাবে তাকে শোষণ করছে (/০) লোকসংগীত প্রভৃতির টেক্‌নিক্‌কে বিকৃত বা pervert করে যেমন, ভাটিয়ালী গানে সিনেমার ঢং দিয়ে দিলে। (৵০) ভদ্র-সংস্কৃতির কথা ও টেক্‌নিক্‌কে vulgarise করে, যেমন, রবীন্দ্রনাথের গান ও সুরে সিনেমার রং চড়িয়ে দিলে।

তাই বাঙলার সংস্কৃতি-সংকট এই যে বাঙলার জীবন অত্যন্ত মোটামুটি দুটা স্বতন্ত্র সংস্কৃতির ধারায় বিভক্ত হয়ে পড়েছে—লোক-সংস্কৃতির ধারা যা নিষ্প্রাণ ; ভদ্র-সংস্কৃতির ধারা যা নিরালম্ব বা যার মূল মাটিতে নেই। আর এই দু'এর মাঝখানে দাঁড়িয়েছে শিল্পের নতুন বুর্জোয়া ব্যবসাদারেরা,—যারা দু'এরই শিল্পানুরাগকে শোষণ করে মুনাফা করতে চায় ; তারা এ-দু'এর একটা জোড়াতালিও দেয়, কারণ দু' স্তরের মানুষই তাদের পক্ষে ব্যবসায়ের ক্রেতা শোষণের ক্ষেত্র।

এই সংকট সমাধানের উপায় অবশ্য বাঙলা সংস্কৃতির প্রশস্ত গণ-বনিয়াদ রচনা ; আর এইখানেই আসে শ্রমিক-কৃষকের ও বুদ্ধিজীবী বিপ্লবীর দায়িত্বের কথা—যাঁদের কাজ হবে এই দ্বিখণ্ড শিল্পধারাকে পুনঃ সংযুক্ত করা, আর শিল্পকে ব্যবসাদারী শোষণের হাত থেকে মুক্ত করা, তাকে স্বরাজ দেওয়া আর তার সমন্বয় করা।

২৪-১-৫২

বাঙালীর সংস্কৃতি সংগঠন

অন্য প্রদেশের লোক-সংস্কৃতি

বাঙলা দেশে যে-ভাবে হয়েছে সে-ভাবে ভারতবর্ষের অন্য প্রদেশে শিল্পের সংকট প্রকট হয়নি। তার কারণ, অধিকাংশ প্রদেশে লোক-জীবন এভাবে বিভক্ত হয়ে পড়েনি। দক্ষিণ ভারতে জীবন এখনো অবিভক্ত homogenous. উত্তর ভারতের (ও নিজাম রাজ্যের?) শহরে দরবারী (প্রধানত মুসলিম) জীবন ও শিল্প এবং পল্লীর লোক-জীবন ও লোকশিল্পে তফাৎ ঘটেছিল। কালচারেল্ দ্বিধা বা dichotomy সেখানে স্পষ্ট। হয়ত মুসলিম সংস্কৃতি রূপে উর্দু সাহিত্য ও ওস্তাদী সংগীত আশ্রয় করে সেই courtly art আরও চলতে চেষ্টা করতে পারে। কিন্তু নতুন ইংরেজি আমলে সেই সামন্তযুগের অবসান ঘটেছে। বুর্জোয়া জীবনযাত্রা ও শিল্পাদর্শের আঘাতেও সেই দরবারী আর্ট ও আদর্শ ম্লান হয়েছে; ফলে তা পরিবর্তিত হচ্ছে—তবে তা কি রূপ নেবে বলা যায় না। এ যুগের উপযোগী শিল্পাদর্শ গ্রহণ করতে না পারলে সামন্তযুগের সেই দরবারী শিল্প ক্রমশই আরও artificial নিষ্প্রাণ হয়ে পড়বে। বরং ততক্ষণে লোক-শিল্পই লোক-জীবনের ও জন-জাগরণের সঙ্গে তাল রেখে নতুন হয়ে, প্রাণবান হয়ে, বেগবান হয়ে উঠবে। যা'ই হোক, আপাতত দেখা যাচ্ছে—এ-সব প্রদেশে লোক-জীবন লোক-সংস্কৃতি বাঙলার লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতির মত খণ্ড ও নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েনি। লোক-জাগরণ হলে সেই লোক-সংস্কৃতি আবার বেগবান হবে। এরই আভাস দিচ্ছে অন্ধ্রের গণ-আন্দোলন ও অন্ধ্র লোক-সংস্কৃতির renaissance. অন্ধ্রের কৃষক আন্দোলনকে অবলম্বন করে তা প্রকাশিত হচ্ছে।

বর্তমানের গণ্ডিহীনতা

বাঙলার সংস্কৃতি সংকট আমরা দেখেছি আমাদের মোটামুটি কর্তব্যও বুঝেছি। সেদিক থেকে আমরা করতে পারি কি ?

কয়েকটা কথা স্পষ্ট করে বুঝতে হবে। প্রথম কথা—গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগঠন দুই-ই চলছে; চলবে—বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠিত না হলে শ্রমিক-কৃষক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নিজের স্থান নিতে পারবে না, নিজের দানও দিতে পারবে না। দ্বিতীয় মূল কথা হচ্ছে—শ্রমিক কৃষকের চোখে সংস্কৃতি শোষণের বা ব্যবসায়ের জিনিস নয়, বিকাশের একটা পথ; সৃষ্টির পথ ও সৃষ্টিকর্মের পাথেয়। তৃতীয় কথা—বর্তমান সমস্যা। সংস্কৃতির দুই ধারা বাঙলায় আছে—তা অস্বীকার করা যাবে না। দুয়ের স্বরূপও মনে রাখা দরকার। যেমন, লোক-সংস্কৃতির বিষয়বস্তুও অনেকটা ধরাবাঁধা, তার টেক্‌নিক্ অনেকটা স্থূল—আর এ-সংস্কৃতি কতকাংশে পুরোনো সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে জড়িত, না পরিবর্তিত হলে তা ধনিকতন্ত্রের যুগের কথাও ঠিক মত বলতে পারে না, শ্রমিক-কৃষকের বিপ্লবী বাণীকেও বহন করতে পারবে না। অন্য দিকে ভদ্রসংস্কৃতি—অনেকাংশেই মূলহীন eclectic, তা প্রধানত পাশ্চাত্য ধনতন্ত্রের শিল্পাদর্শ ও শিল্পপ্রেরণা থেকে গৃহীত। সে-ধনতন্ত্রও আজ পতনের মুখে, তাই তার পতনের ছাপও বাঙলার ভদ্রসংস্কৃতিতে আজ প্রতিফলিত হচ্ছে সেই সূত্রেই। এই ভদ্রসংস্কৃতির বিষয়বস্তু ও রূপকলা ধনতন্ত্রের যুগের বটে—অর্থাৎ দুই-ই একটু উন্নত। কিন্তু ধনতন্ত্রের পতনের যুগের ছাপও এই ভদ্রসংস্কৃতিতে এখন পড়ছে—কাজেই ভদ্রসংস্কৃতির বিষয়বস্তু (content) পাশ্চাত্য শিল্পের বিষয়বস্তুর মতই sophisticated হয়েছে, তার রূপকলাও (form) পাশ্চাত্য শিল্পের রূপকলার অনুকরণে নানারকমে বেঁকে-চুরে যাচ্ছে; আর তার দৃষ্টি পাশ্চাত্য শিল্পের দৃষ্টির মতই বিভ্রান্ত, নিরাশায় অবসন্ন—'পলায়নের' পথ সন্ধানে ব্যস্ত।

সংস্কৃতি সমন্বয়ের পথ—সংযোগের রীতি

বাঙালী সংস্কৃতিকর্মীর পক্ষে এই অবস্থায় দুই ক্ষেত্রেই অগ্রসর হতে হবে। মানে, বাঙলার মুমূর্ষু লোক-সংস্কৃতি ও ঘুণেধরা ভদ্র-সংস্কৃতি—এই দুই ধারাকে এক জন-সংস্কৃতিতে সমন্বিত করবার জন্য দু'দিক থেকেই অগ্রসর হতে হবে—

লোক-সংস্কৃতিকেও উন্নত, জীবন্ত করে তুলতে হবে, ভদ্র-সংস্কৃতিকেও সহজ, স্বচ্ছন্দ করে তুলতে হবে। যে লোক-সংস্কৃতি শুষ্কপ্রায় তাকে জীইয়ে তুলতে হবে—অর্থাৎ তা যুগোপযোগী করতে হবে, নইলে তা বেঁচে উঠবে না। তা যুগোপযোগী করতে হবে দু'ভাবে—লোক-শিল্পের আধেয় বা বস্তু (content) এ-যুগের জনগণের উপযোগী (popular) রাখতে হবে আর তার আধার বা রূপকলা (form) স্বাভাবিক ধারায় বিকশিত (develop) করে তুলতে হবে।

লোক-সংস্কৃতির প্রধান শাখাগুলোকে এই নীতি অনুযায়ী পুনর্গঠিত করতে গেলে তার পথ এই :

জনসংগীত—জারি, সারি, ঝুমুর, গম্ভীরা, পাঁচালি প্রভৃতি যে-অঞ্চলে যা লোক-গীতি আছে সে-অঞ্চলের সে-সব গায়কদের উৎসাহ দিতে হবে—(১) এজন্য তাদের নতুন কথাবস্তু জুগিয়ে দিতে হবে। দেখতে হবে যেন এ-কথাবস্তু এমন হয় যা লোকের কাছে 'পরের জিনিস' বলে না ঠেকে, কিংবা দলের সূত্র বা স্লোগান মাত্র না হয়, লোকের ভাষার, লোকের আশা ও অনুভূতির কথা হয়—(যেমন হতে পারে, দুর্ভিক্ষের কথা, নেতাদের জেলের কথা, মুক্তি-সংগ্রামের কথা, স্বাধীনতার কথা, ইত্যাদি)—আবার শুধুমাত্র সম্প্রদায়বিশেষের কথাবস্তু বা অনুষ্ঠানের জিনিস যেন না হয় ; যেমন 'মনসার ভাসান' আজ হয়ে উঠেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে—(২) পুরানো রূপকলা একটু নতুন করে তুলতে, স্বাভাবিক ধারায় তা বিকশিত করতে, এই শিল্পীদের উৎসাহ দিতে হবে। তবে দেখতে হবে তা যেন সিনেমার সুরের মত চটকদার না হয়—শিল্পকে vulgarise না করে। সম্ভব মত এদিকে ভিন্ন প্রদেশের জনসংগীতের সুর আমদানী করা সহজ। (৩) দেখতে হবে একটি জিনিস—যেন কথা ও সুর দুই মিলে, অখণ্ড হয়। কথা মাথায় যায়, সুর প্রাণে যায় ; তাই কথা ও সুরে বিরোধ বাধলে বুদ্ধিতে ও অন্তরাবেগে বিরোধ বাধবে, তা আর সৃষ্টি হবে না। over-elaboration, subtlety, conceit একদিকে, vulgarisation অন্য দিকে,—এই দুয়ের মধ্য দিয়ে এই সৃষ্টিধারা প্রবাহিত হবে।

নৃত্য—সাঁওতালী নাচ, মণিপুরী লাইছাবি নাচ, রায়বেঁশে নাচ বা নূতন প্রচলিত নৃত্য, ভিন্ন প্রদেশের জন-নৃত্য যা আমরা গ্রহণ করেছি—সে সব সম্বন্ধেও ওপরের ওই মূলনীতি প্রযোজ্য—তার বস্তু যুগোপযোগী হবে, রূপকলা বিকাশধর্মী হবে, আর বস্তু ও রূপ দুয়েতে দ্বন্দ্ব থাকবে না—দুয়ে মিলে হবে একটা নূতন সৃষ্টি।

জননাট্য—যাত্রাগান, অভিনয় প্রভৃতির সম্বন্ধেও এই একই চেষ্টা করতে হবে। সিনেমা এখনো পুঁজির নাগপাশে বাঁধা, কিন্তু তার জনশিল্প হিসাবে সম্ভাবনা প্রচুর।

সাহিত্য—সত্যসত্যই জনগণের জন্য কিছু লেখা সহজ নয়---তারা অধিকাংশেই লিখতে পড়তে পারে না। গণ-সাহিত্য হবে তাই গান মেশানো পাঁচালি কি ওইরূপ। পড়বার সাহিত্যও লিখতে হবে নতুন বিষয়ে ছড়ার ছন্দে, পাঁচালির ছন্দে---কিন্তু সুরে ছন্দে নতুনত্ব ও elasticity দিয়ে নতুন বিষয়বস্তু বলতে হবে।

বলা বাহুল্য এই লোক-সংস্কৃতি আবার সৃষ্টিময় করে তুলতে পারেন তিনিই যাঁর জন্মগতভাবে সৃষ্টি-প্রতিভা আছে। সঙ্গে সঙ্গে যিনি নিজে এই লোক-জীবন ও লোক-সংস্কৃতির ঐতিহ্যে ও শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছেন।

ভদ্র সংস্কৃতিকে লোকাভিমুখী করার কাজ চালাতে হবে সঙ্গে সঙ্গে। ভদ্র সংস্কৃতির প্রধান বাহন হল---সাহিত্য, সংগীত (ওস্তাদি শাখা ও সহজ হতে পারে এরূপ শাখা), নাট্যকলা, আর নৃত্য। এসব দিকে আমাদের নীতি হতে পারে এরূপ : এই সব শিল্প-কলার (১) কথাবস্তুতে জন-জীবনের বিষয় ও প্রেরণা সঞ্চার করা---popular content দেওয়া sophisticated, subtle, over-elaborate বিষয়বস্তু ও বিশেষত্বহীন vulgarised বা sensationalised বিষয়বস্তু—দুইই বুর্জোয়া সভ্যতার বিকৃতির ফলে সাহিত্যে আজ এসেছে। দুইই বর্জনীয়। বিষয়বস্তু হবে জনগণের কথা, popular, যা simple and great) (২) রূপকলায় ভদ্র-সংস্কৃতি উন্নত স্তরে উঠেছে—উন্নত কারুশিল্পের অধিকারী আজ যেমন ধনিক সভ্যতা। তার টেক্‌নিক যেমন শ্রমিক শ্রেণী গ্রহণ করে তেমনি জনগণও গ্রহণ করবে ধনিকতন্ত্রের উন্নত চারুশিল্পের খাঁটি টেক্‌নিককেও। ভদ্র-সংস্কৃতির সেই উন্নত টেক্‌নিক সংরক্ষণ করতেই হবে। কিন্তু এই টেক্‌নিকে যে-সব কথার কসরৎ, ভাবের মারপ্যাঁচ দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে বুর্জোয়া সভ্যতার মরণকালীন বিকৃতি, সে-সব অলস শ্রেণীর ব্যসনের উপকরণ মাত্র। টেক্‌নিকের সেই মিথ্যাচারও তাই বর্জন করতে হবে—টেক্‌নিক্ সহজ স্বচ্ছন্দ হবে, এমন কি নতুনও হবে, শোভনও হবে ; হবে না কসরৎ, মারপ্যাচ, অকারণে ভাঙাচোরা শিথিল গ্রন্থি। উন্নত টেক্‌নিক্ চাই, কিন্তু টেক্‌নোক্রাসিতে সমস্যার সমাধান হয় না। অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রেও (৩) কথা-বস্তু ও রূপকলার পরম সুসঙ্গতি ও সমন্বয় ঘটাতে হবে---যাতে সত্যই তা অখণ্ড সৃষ্টিতে পরিণত হয়।

অবশ্য, এ জাতীয় সৃষ্টিও করতে পারেন তিনিই সত্য সত্যই সৃষ্টি প্রতিভার যিনি অধিকারী (creative genius); এই ভদ্র-সংস্কৃতির ঐতিহ্য, তার স্বরূপ ও সমস্যা সম্বন্ধেও শিক্ষালাভ করেছেন; এবং সঙ্গে সঙ্গে লোক-জীবন ও লোক-মনের সঙ্গে সংযোগ রেখেছেন সকল রকমে।

সাহিত্য—এদিক থেকে অবস্থাটা এখন নিম্নরূপ।

সাহিত্যিকদের পক্ষে এ দিকে সমস্যা কম নয় কিন্তু সে সংবন্ধে সচেতনতা দেখা দিয়েছে। যুগ সমস্যা সংবন্ধে সাহিত্যিকদের সচেতন করে তুলতে পারলেই সাহিত্যের দিকে আমাদের কর্তব্য সহজ হয়ে ওঠে। সচেতন সাহিত্যিক সচেতন সৃষ্টিতে আপনা থেকেই অগ্রসর হবেন। তাঁর চেতনাকে কি ভাবে রূপ দেবেন, তা তিনিই জানেন—সংস্কৃতিকর্মীরা নয়।

সংগীত–সংগীতের দিকে ওস্তাদি গান যেমন আমরা অবজ্ঞা করব না, তার চেয়ে বেশি দরকার হবে রবীন্দ্র-সংগীতের যে সহজ ধারা উৎসারিত হয়েছে তা আরও প্রশস্ত ও বেগবান করে তোলা। এ ধারাই কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালী প্রভৃতি জন-সংগীতের ধারার নিকটতম আত্মীয়; হয়ত এ-ধারা জনগণও গ্রহণ করবে, করছেও।

নাট্যকলা—নাট্যকলায় আমরা খোলা মাঠের (open air theatre) অভিনয় রীতি ও তদুপযোগী রীতি পদ্ধতি (technique) গ্রহণ করলে তা জনসমাজ সহজে উপভোগ করতে পারবে—সেরূপ অভিনয় অনেকটা যাত্রার মত হবে, অথচ রঙ্গমঞ্চের উন্নত জিনিস ও কৌশলও তাতে কতকাংশে গ্রহণ করা যায়। যেমন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশে, প্রস্থানে একটা নতুনত্বের চমক থাকে, তা যাত্রায় থাকে না। এসব ক্ষেত্রে তা থাকতে পারে।

নৃত্যকলা—নৃত্যে আমরা অভিনয়ের মত কৌশলই গ্রহণ করতে পারি, তারও বস্তু non-communal ও popular হবে, রূপকলা হবে উন্নত পদ্ধতির। আমাদের মিছিলে আমরা নৃত্য দেখাতে দেখাতে যেতে পারি কি? যেমন কীর্তনে মহরমে অনেকটা আমরা দেখতে পাই, ভাসানেও প্রায় চল হয়েছে, সেরূপ কোনো নৃত্য পদ্ধতি গ্রহণ করলে তাতে জনগণের পরিচিত রীতির কাছাকাছি আমরা পৌছতে পারব।

এ-ভাবে দুদিক্ থেকে অগ্রসর হলে প্রথমত বাঙলার দুই সংস্কৃতিতে আমরা সংযোগ স্থাপন করতে পারব—তারই ফলে এক নূতন সংস্কৃতি সমন্বিত হবে।

সংগঠনের কথা—প্ল্যান—কিন্তু এ-সব হল সংস্কৃতিকর্মীর শিল্পদৃষ্টির ও শিল্প-নীতির আলোচনার দিক। তা যেমন প্রয়োজনীয় তেমনি প্রয়োজন এই শিল্প আন্দোলনের সংগঠন। সে দিকেও বাঙলাদেশে আমরা বড়ই ঢিলে ঢালা নিয়মে চলি। আমরা এদিকে কি করতে পারি? সব দিকেই চাই নীতি (principle) স্থির হলে পরে ভালো পরিকল্পনা (plan)। এইটা বড় দরকার। মোটামুটি তার খস্ড়া এখনও আমরা একটা দাঁড় করাতে পারি (১) সাহিত্যিকরা পরিকল্পনা স্থির করে (ক) ব্যক্তিগতভাবে সৃষ্টি করতে পারেন সাহিত্য, উপন্যাস, গল্প; (খ) অন্য সাহিত্যিকদের সচেতন করবার জন্য লিখতে পারেন, এই মতবাদ পরিষ্কার করবার জন্য আলোচনা গ্রন্থ; (গ) চালাতে পারেন এজন্য সাময়িকপত্র। তাতে সংস্কৃতির বিবিধ বিভাগের কথাই থাকবে, বিশেষ করে তাতে থাকবে সংস্কৃতির রূপান্তরের নানা ধারার সংবাদ। (২) সংগীতের জন্য (ক) শিক্ষা-গ্রহণ (খ) শিক্ষাদান দুই সমান প্রয়োজন; গ্রামোফোনে উপযুক্ত রেকর্ড করানো দরকার। (৩) অভিনয়ের জন্য নাট্যকলা রচনা, শিল্পী সংগ্রহ রেডিও ও সিনেমার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগ স্থাপন, গ্রামোফোনে উপযুক্ত অভিনয় রেকর্ড করানো দরকার—আর বলাবাহুল্য শিক্ষা গ্রহণও দরকার। (৪) নৃত্যের জন্যও শিল্পী সংগ্রহ নূতন নৃত্য রচনা, ইত্যাদি কাজ করতে হবে। সব চেয়ে সত্য কথা (১) এ-সব শিল্পের জন্য প্রত্যেক শিল্পীকেই প্রাণমনে ট্রেনিং গ্রহণ করতে হবে, বুঝতে হবে শিল্প শুধু প্রেরণার মাথায় বেরিয়ে আসে না inspiration-এর পিছনে বহু perspiration থাকেই থাকে। প্রত্যেকটি অভিনয়ের জন্য বহুবার মহড়া দেওয়া দরকার। (২) সংগীত, অভিনয় ও নৃত্যের জন্য ভিন্ন প্রদেশের শিক্ষকদের আহ্বান করে ও নিজেদের প্রদেশের উপযুক্ত গুণীদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয়-সংস্কৃতি-শিক্ষাকেন্দ্র সাময়িকভাবে চালানো দরকার। (৩) মফঃস্বলে এ-সব শিল্পীদের আরও বেশি প্রদর্শনী দেওয়া দরকার। (৪) ভিন্ন প্রদেশের শিল্পোৎসবে এ-সব শিল্পী ও শিক্ষকদের আরও বেশি যাওয়া দরকার। *

৩১-১-৫১

* কলিকাতার 'আর্টিস্ট এসোসিয়েশন' একটি সবল প্রতিষ্ঠান রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এদিকে আমরা অনেক কিছু আশা করতে পারি। লেখক, ২০।২।৪৭ইং

ভাবী ভারতবর্ষ ও বাঙলার সংস্কৃতি

আজ নববর্ষ। ১৩৫২ নেই, ১৩৫৩ এসেছে। তার মানে, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, কিন্তু শান্তি আসেনি। পৃথিবী যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে মুক্তি পেয়েছে, মুক্তি ক্ষেত্রে পৌঁছয়নি। আমরা বাঙালীরা আজ এই সময়ে আমাদের নববর্ষকে অভিনন্দন করছি।

এই 'নববর্ষ' আমাদের ইতিহাসে নতুন—অনেক সম্ভাবনায় আজ আমাদের মন আন্দোলিত—ভারতবর্ষ শুধু নতুন বছরের দুয়ারে নয়, ভারতবর্ষ আজ নতুন ইতিহাসের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে। তাই সমস্ত ভারতবাসীকে আজ আমরা আমাদের এই শুভ নববর্ষের অভিনন্দন জানাচ্ছি—আমরা সকলে নতুন ইতিহাসের পথে সংযাত্রী, এক সঙ্গে আমরা এই নতুন ইতিহাস গড়ছি,—গড়ব।

আজ নববর্ষ বাঙালীর। বাঙালী ছাড়া অন্য ভারতবাসী পয়লা বৈশাখকে 'নববর্ষ' বলে মানে না। আবার অন্য প্রদেশের অনেকেরই গণনায় আজ পয়লা বৈশাখও নয়। বাঙালী মাত্রেরই হিসাবে আজ নববর্ষ—বাঙালী হিন্দুর, মুসলমানের, স্বদেশের বাঙালীর, প্রবাসী বাঙালীর। বিশেষ করে, প্রবাসে এই নববর্ষের উৎসব পালন করতে গিয়ে এই সত্যই আমরা আরও স্পষ্ট করে বুঝি :—ভারতবাসী হলেও বাঙালী একটা বিশিষ্ট জাতি। হিন্দু বাঙালী ও মুসলমান বাঙালী দুয়ের মধ্যে পার্থক্য থেকে মিল বেশি। কারণ, একই দেশ, একই জীবন যাত্রা, একই ভাষা ও সংস্কৃতির আমরা উত্তরাধিকারী। সেই বাঙলাকে আর খণ্ড করা যায় না—১৩১২-তেও যায়নি, ১৩৫৩তেও যাবে না।

ভারতীয় ঐক্যের সংগঠক

এই নববর্ষের উৎসবে যে প্রথম কথাটি তাই আমাদের কাছে পরিষ্কার হয়ে ওঠে, তা এই :

(১) ভারতবর্ষ বহুকে নিয়েই এক; (২) ভারতবর্ষ শুধু দুই জাতির দেশ নয়; (৩) শুধু অখণ্ড এক জাতির দেশও নয়।

অবশ্য ব্রিটিশ শাসনের ছুরি বাঙলাকে ও বাঙালীকে টুকরো করে রেখেছে। শিলেট, কাছার, গোয়ালপাড়া, মানভূম, সিংহভূমের বাঙালী বাঙলা থেকে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু একটা কথা তবু আমরা বুঝি, বাঙালীও শুধু তার আপনার গৃহে বসে নেই। জীবিকার তাগিদে, বর্তমান কালের অনিবার্য টানে আমরা বাঙলার গৃহাঙ্গন ছাড়িয়ে বিহারে, যুক্তপ্রদেশে, উড়িষ্যায়, আসামে আশ্রয় নিয়েছি। আবার, বাঙলার ব্যবসাবাণিজ্যে, কলকারখানায় অবাঙালীরা আরও বেশি ভিড় করেছেন। এই গতায়াত বন্ধ করবার নয়। সভ্যতার প্রধান কথাই এই যে, বিচ্ছিন্নতা সে সহ্য করে না। আধুনিক কালে তার বিচিত্র যোগসূত্রে পৃথিবীই এক হয়ে উঠতে চলেছে। ভারতবর্ষের ভেতরে তাহলে আমরা প্রাচীর তুলব কি করে? আসলে কথাটা বোঝা উচিত—পৃথিবীর সেই বৃহৎ ধারারই তাগিদ তাড়না জেনে না-জেনে সার্থক করে তুলেছেন এই অভিযাত্রী বাঙালীরা—যাঁরা নানা কর্মসূত্রে দেশ দেশান্তরে জীবিকা অর্জন করেন—তাঁরা রেলের চাকুরে, পোস্টাফিস-টেলিগ্রাফের চাকুরে, নানা শিল্প-বাণিজ্যের ছোট বড় কর্মী। ভারতবর্ষের ঐক্যধারাকে তাঁরাই প্রাণবন্ত ও প্রশস্ত করে তুলছেন দিনের পর দিন—এই ভারত-গোষ্ঠীর অন্যান্য জাতিদের আত্মীয় করবার দায় ঘাড়ে নিয়ে, নতুন কালের জীবনযাত্রা, জীবিকা-প্রণালীকে গ্রহণ করতে এগিয়ে গিয়ে। তাঁদের পক্ষেও ভুলবার উপায় নেই যে, একই কালে তাঁরা বাঙালী হয়েও ভারতবাসী, আবার তাঁরা পৃথিবীর সকল শ্রমজীবীর স্বশ্রেণী, নতুন সমাজ বিন্যাসের দায়িত্ব ও গৌরব তাঁদের।

এই ১৩৫৩-এর নববর্ষের দিনে তাঁরা তাই যেমন বাঙালী হিসাবে উৎসব করবেন, তেমনি সঙ্গে সঙ্গে হিসাবও করবেন তাঁদের নতুন ভাগ্যলেখা কি হবে, আর এই ভারতবর্ষের আত্মীয়তার বন্ধন কি-ভাবে তাঁরা আজ দৃঢ়তর করবেন, কি-ভাবে এ-যুগের সভ্যতার ইঙ্গিতকে করবেন সুস্পষ্ট সত্য।

যুদ্ধান্তের হালখাতা

যুদ্ধান্তের পৃথিবীতে আমরা আজ ইতিহাসের নতুন হালখাতা খুলছি। পুরনো বছরের জমা-খরচ নিয়েই শুরু হবে নতুন ইতিহাস।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেখছি—যুদ্ধে ফ্যাশিজমের পরাজয় ঘটেছে। তার মানে প্রতিক্রিয়ার সামরিক পরাজয় ঘটেছে, কিন্তু প্রতিক্রিয়া নিঃশেষ হয়নি। এখনো তার চেষ্টা রয়েছে ছলে-বলে-কৌশলে নিজের স্বার্থ টিঁকিয়ে রাখার। মোটামুটি এ-যুদ্ধের আগে ফ্যাশিজম ইউরোপের দেশগুলিতে জেঁকে বসেছিল; কিন্তু এই যুদ্ধের ফলে সেসব দেশে জনশক্তিই প্রাধান্য লাভ করেছে। অবশ্য মালিকেরা তাদের প্রভুত্ব পুনরুদ্ধার করবার সমস্ত চেষ্টা সেসব দেশেও ছেড়ে দেয়নি। তবু তারা বুঝতে পেরেছে যে, এশিয়ার জনশক্তিই অপেক্ষাকৃত দুর্বল; কাজেই এশিয়াতে প্রতিক্রিয়ার আসল ঘাঁটি বাঁধবার সুযোগ রয়েছে—সেখান থেকেই ভাবী দিনে আবার চক্রাকারে বেষ্টন করা যাবে সোভিয়েট ব্যবস্থাকে। আজ গ্রীস মিশর সিরিয়া থেকে ইণ্ডোনেশিয়া-চীন-জাপান পর্যন্ত ব্রিটিশ-মার্কিন মালিকতন্ত্র সেই জন্য নানাভাবে আস্তানা গাড়ছে। আর এই নতুন চেষ্টায় মালিকতন্ত্রের নতুন ভরসা ভারতবর্ষ আর চীন। কারণ, এসব দেশে আছে কোটি কোটি মানুষ আর অফুরন্ত বস্তু-সম্পদ। সেসব হাতে রাখতে পারলে আর প্রতিক্রিয়ার পুনর্জাগরণ ঠেকায় কে? চীনে মার্কিন মালিকেরা চুংকিংএ মাঞ্চুরিয়ায় সেই খেলাই খেলছেন। আর ভারতবর্ষে এ্যাটলি-ওয়েভলের এই খেলাই চলেছে সিমলা থেকে একেবারে দিল্লী পর্যন্ত।

কিন্তু খেলাটা সাম্রাজ্যবাদের পক্ষেও আর আগের চালে চলতে পরে না—এ-যুদ্ধের পরে সাম্রাজ্যবাদের নতুন করে ছক সাজাতে হচ্ছে, নতুন করে তার চালও ঠিক করতে হচ্ছে। কারণ, সকল দেশের মত, ভারতবর্ষেও খেলা অনেক পালটে গিয়েছে।

বিদ্রোহের পথে ভারত

আমরা জানি ভারতবর্ষের রাজনীতিক জীবনে আজ কত বড় আলোড়ন দেখা দিয়েছে। ব্রিটিশ বিদ্বেষ আজ দেশের চারদিকে ফেটে পড়ছে। এমন করে স্বাধীনতার জন্য পাগল দেশের ছোট বড় সকল সাধারণ মানুষ আর কোন দিন হয়নি। সৈনিকেরা এমন করে স্বাধীনতার আন্দোলনে আর ছুটে আসেনি।

আজাদ হিন্দ্ ফৌজের উদ্দেশ্যে দেশের যে পূজা হোম ভক্তি উৎসর্গ হতে লাগল তাতে এ-দেশের ব্রিটিশ তাঁবের অন্যান্য সৈনিকেরাও নিশ্চয়ই প্রবুদ্ধ হয়েছে—নৌ-সৈনিক, বিমান সৈনিক, সাধারণ সৈনিক কেউ আজ ব্রিটিশ হুকুম ও হুকুমত মানতে চায় না। এই ১৩৫২-তে আমরা জানি ভারতবর্ষ এক "সিপাহী বিদ্রোহের" মুখে এসে পৌছেচে। আর এবারকার সিপাহীরা জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়; বরং জনতার বিদ্রোহের আগুনেই তাদের মনেও আগুন ধরেছে। যেখানে জনগণের ও সেনাবাহিনীর এমন বন্ধুত্ব ঘটে সেখানে বিপ্লবের মূল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে বলা যেতে পারে—এইটেই ভারতবর্ষের রাজনীতিক জীবনের আজ সর্বপ্রধান কথা।

কিন্তু তবু বিপ্লবের আগুন জ্বলে জ্বলে নিবে যাচ্ছে। তার কারণ যা তাও আমরা বুঝি;—তা এই রাজনৈতিক জীবনের দ্বিতীয় সত্য। ভারতের জনসাধারণের বৈপ্লবিক সংগঠন ও নেতৃত্ব গঠিত হয়নি। স্পষ্টই বোঝা যায়, এমন কোনো একটি সংগঠন আজ এ-দেশে নেই যে একা এ-দেশের এই বিপ্লবকে সংগঠিত করতে পারে। অন্তত প্রধান প্রধান সম্প্রদায়ের ও শ্রেণীর ঐক্য এ উদ্দেশ্যে চাই। কিন্তু দেখা গেল, জনতার যে দুটি প্রধান সংগঠন (কংগ্রেস ও লীগ) এ-দেশে এই বিপ্লবমুখী জনতা ও সেনাদের চালিত করতে পারত তারা এই বিপ্লবের দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত নয়। এই দুই প্রতিষ্ঠান গৃহযুদ্ধের আয়োজনেই বেশি পাঁয়তাড়া করছে, ঐক্যের জন্য প্রস্তুত নয়। তারা পরস্পরের এই বিরোধের জন্য সাম্রাজ্যবাদের ভেদনীতির খেলারই সুযোগ করে দিচ্ছে, তবু একত্র হতে পারছে না।

অবশ্য শ্রমিক কৃষকের বিপ্লবকে সমর্থন করবার জন্য উদ্যত ছিল কমিউনিস্ট পার্টি। কিন্তু যতই জনসাধারণ তাঁদের ঝাণ্ডাকে অন্য দুই ঝাণ্ডার সঙ্গে একত্র করে বিপ্লব পথে এসে দাঁড়াক, কংগ্রেস বা লীগ নেতারা তাদের দাবী গ্রাহ্য করবে না, কমিউনিস্ট পার্টিকেও বরদাশ্ত করবে না। বরং কংগ্রেসের ও লীগের নেতারা দেশের সমস্তগুলো বিদ্রোহের ও বিক্ষোভের স্ফুরণকে 'গুণ্ডামি' ও 'কমিউনিস্টের কাজ' বলেই এই আগুনকে ছাই-চাপা দিলেন। অবশ্য এর একটা কারণ—এই দুই সংগঠনের নেতৃত্ব সত্যকারের গণ-বিপ্লবের পক্ষপাতী নয়। এই দু'নেতৃত্বের উপর এ-দেশের ধনিক শ্রেণীর প্রভাবই প্রবল। আর এই ধনিক শ্রেণী জানে একবার জন-গণ বৈপ্লবিক পথে পা বাড়ালে জনসাধারণ শুধু সাম্রাজ্যবাদের উচ্ছেদ করেই

থামবে না, তারা ধনিকতন্ত্রের হাত থেকে ক্ষমতা নিজেদের হাতে গ্রহণ করতে চাইবে। কংগ্রেস ও লীগের নেতৃত্ব এ-জন্যই গণ-বিপ্লবকে সমর্থন করে না, এমন কি বিপ্লবী প্রতিষ্ঠানকেও নানা সূত্রে চায় চূর্ণ করতে। এ-জন্যই তারা এ্যাটলি-ওয়েভলের হাত থেকে ক্ষমতা প্রাপ্তি সুবিধাজনক মনে করে, বিপ্লবী চেষ্টাকে মনে করে বিপজ্জনক। ১৩৫২'র ভারতবর্ষের রাজনীতিতে দ্বিতীয় সত্য তাই এই :—ভারতীয় নেতৃত্বের পরাজয়। যেমন, ওয়েভল-এ্যাট্‌লীর নিকট তাদের আত্মসমর্পণ, জন-বিপ্লবের বিপথচালনা, এবং গৃহযুদ্ধের উদ্যোগপর্ব।

ওয়েভল নীতির জয়

আমাদের রাজনীতির তৃতীয় সত্য তাই এই :—ওয়েভল-নীতির জয়। যুদ্ধ শেষে ইংরেজের নতুন সাম্রাজ্যতন্ত্রনীতি হল, ভারতবর্ষে ইঙ্গ-মার্কিন প্রতিক্রিয়ার সামরিক ও আর্থিক ঘাঁটি পাকা করা। সেই উদ্দেশ্যে এখন তারা ভারতীয় মালিকতন্ত্রকে নিজেদের সহযোগী রূপে চায়। তাদের ইচ্ছা ভারত শোষণে ভারতীয় মালিকদের অংশীদার করে নেওয়া, এবং সেই সহযোগিতা সম্ভব করার জন্য খানিকটা রাষ্ট্রীয় অধিকার ভারতীয়দের হাতে ছেড়ে দেওয়া। এই ইঙ্গ-ভারতীয় এজমালী সম্পত্তির নমুনা হল বিড়লা-ন্যুফিলডের সহযোগিতা। রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে তাদের চেষ্টা হল কত কম ক্ষমতা হস্তান্তর করে কত বেশি ক্ষমতা হাতে রাখা যায়। সেদিকে ওয়েভলের হাতে আছে দুটি অস্ত্র—একটা এ-দেশীয় মালিকদের মনে বিলাতে জমানো ভারতবর্ষের স্টার্লিং ব্যালান্স হারানোর ভয় ; অন্যটি ভারতবর্ষের মধ্যেও হিন্দু মুসলমান সম্প্রদায়ের ভেদ-বিভেদের সুযোগ। সিমলা থেকে দিল্লী পর্যন্ত ১৩৫২-তে এজন্য এই ওয়েভল নীতিরই জয় দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ওয়েভল আমাদের জন্য পরিকল্পনা করছেন একদিকে "মিশরী স্বাধীনতা", ও অন্যদিকে ইংরেজ খবরদারীতে "ফিলিস্তিনী স্বতন্ত্রী রাষ্ট্রের"—পাকিস্তান, হিন্দুস্থান ও রাজস্থানের।

আর্থিক বিপর্যয়

ভারতীয় নেতৃত্বের কতটা পরাজয় ঘটেছে তা দেখা যায় আমাদের আর্থিক অবস্থার দিকে তাকালে। যুদ্ধে ভারতবর্ষের অর্থনীতিক জীবন একবারে চুরমার হয়ে গিয়েছে—কংগ্রেস বা লীগ তার জন্য কোনো সত্যকার ভাবনা ভাবতেও অসমর্থ ; অন্যদিকে ওয়েভলের আমলাতন্ত্র, ভবিষ্যতের প্ল্যান ভবিষ্যতের কর্তাদের

উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত। এত বড় 'ক্রিমিন্যাল' কাজ যুদ্ধ শেষে আর কোনো সরকার করেনি। দেশের অবস্থা দাঁড়িয়েছে আজ কি? প্রথমত, দেশে দুর্ভিক্ষ আসছে। তারপরে প্রায় ৭০ লক্ষ সামরিক কাজের লোক বেকার হচ্ছে, তারা অনেকেই মজুর ও মধ্যবিত্ত। হাজারে হাজারে নানা কারখানার শ্রমিক ধর্মঘট করছে, ডাক বিভাগের লোকেরা পর্যন্ত ঠাণ্ডা থাকেনি। ছোট ছোট মাস্টাররা অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছ, রেল কর্মচারী ও মজুরদের ধর্মঘটের 'ব্যালট' নেওয়া চলছে। বেকার বাড়ছে কিন্তু জিনিসপত্রের দাম রয়েছে আড়াই গুণ তিন গুণ। এ যুদ্ধকালে কলকারখানা বাড়েনি, যন্ত্রপাতি আসেনি। সাধারণের ব্যবহার্য উৎপাদন বরং কমেছে, অন্য দিকে এই কম উৎপাদন সত্ত্বেও মালিকদের মুনাফা তিন গুন চার গুন বেড়ে গেছে। তাদের হিসাবপত্রেই দেখি তারা এ-যুদ্ধের বাজারে ফেঁপে গিয়েছে, দেশের মানুষের ধনপ্রাণ কোনো কিছুর জন্য তারা পরোয়া করেনি, কিন্তু মজুরের মজুরী ভাতা বাড়েনি শতকরা যাট টাকাও। অন্যদিকে কৃষকের হাত থেকে ফসল চলে গিয়েছে জোতদার, মজুতদারের হাতে, কৃষক কিছুই পায়নি। কিন্তু এই আড়তদার-মজুতদার দেশকে লুঠ করেছে, অনাহারে লক্ষ লক্ষ লোক দিন কাটাচ্ছে। এ-ভাবে সমস্ত দেশের উপর চেপে বসেছে শোষণের দুই শক্তি—চোরা কারবারি ও চোরা কর্মচারী। গ্রামের কৃষকজীবনের উপর পুরোনো জমিদার ও মহাজনের সঙ্গে এরাই জোতদার, আড়ৎদার, মজুতদার রূপে এসে জুড়ে বসছে। শহরের জীবনের উপর এরাই চেপে বসেছে পুরোনো মালিক ও শোষকদের সঙ্গে কণ্ট্রাক্টার মুনাফাদার, নানা রকম ব্যাংক ও ব্যবসায়ের মালিক রূপে। আর পুরনো পচ্ধরা আমলতন্ত্রের ছোট বড় কর্মচারীরা এদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে গলা টিপে মারছে সমস্ত দেশের গরীবদের,—গরীব কৃষককে, মজুরকে, গরীব মধ্যবিত্ত স্ত্রীপুরুষকে। যুদ্ধ শেষে দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে তারা ধুকছে। অথচ দেশে টাকার অভাব নেই। অজস্র টাকা বিলাতেও জমা রয়েছে, কোটি কোটি টাকা বাড়তি মুনাফার মালিকদের উদরে। তবু দেশে কল-কারখানা বাড়াবার প্ল্যান নেই, দেশের মানুষের কাজ নেই। বরং দুর্ভিক্ষের মুখে পড়ে আমাদের নেতারা ওয়েভলের প্ল্যানেই ঢেড়া-সই দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেন—এমন কি, মজুরের রেশন-কাটাও সমর্থন করে গেলেন।—অথচ এখনো "১৩৫০-এর মন্বন্তরের" সরকারী নীতির কণ্ট্রোল, রেশনিং, প্রকিওরমেণ্ট প্রভৃতির এরাই হয়ে বসেন কড়া সমালোচক! ভারতীয় নেতৃত্বের রাজনৈতিক পরাজয়ই শুধু নয়, অর্থনীতিক ক্ষেত্রেও পরাজয় এভাবে সুসম্পন্ন করছেন ওয়েভল-এ্যাটলি।

"দুর্ভিক্ষ" সংবন্ধে, "বেকারী" সংবন্ধে, শিল্প-গত প্ল্যানিং সংবন্ধে কোনো সত্যকারের পরিকল্পনা বা চিন্তাও করেনি কংগ্রেস বা লীগ—তারা সেই দায়িত্বও ছেড়ে দিয়েছে দায়িত্বহীন সাম্রাজ্যবাদের উপর।

এমনি করে আজ ১৩৫৩ সনে আমরা যে নতুন ইতিহাসের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি—তাতে এ প্রশ্নই সম্ভবত আমাদের মনে জাগে, আজ কি আমাদের স্বাধীনতার নববর্ষ? না, আমাদের গৃহযুদ্ধের নববর্ষ? জন সাধারণের অধীরতা ও প্রেরণার দিক থেকে দেখলে মনে হবে স্বাধীনতার। আর সংগঠন ও নেতৃত্বের দিক থেকে দেখলে মনে হবে—গৃহযুদ্ধের।

ভারতের ভাবী যোগসূত্র

১৩৫২ এই প্রশ্ন রেখে গিয়েছে। ১৩৫৩ তার উত্তর দেবে। কিন্তু ইতিমধ্যে আমরা যে দু'একটি বিষয়ে ইঙ্গিত পাচ্ছি তাতে ভারতবর্ষের ভাবী রূপেরও খানিকটা কল্পনা করতে পারছি। সেই ইঙ্গিতের সূত্র ধরেই আজ বলতে পারি—কংগ্রেসের, লীগের বা ওয়েভলের, যারই পরিকল্পিত ভিত্তির উপর এই নতুন ইতিহাস গড়ে উঠুক, ভাবী ভারতবর্ষ আর কেন্দ্রীকৃত এক রাষ্ট্র থাকবে না। দুই বা তিন ভগ্নাংশে বিচ্ছিন্ন না হলেও তা হবে যৌথ রাষ্ট্র বা রাজ্য সংঘ, (কন্‌ফেডারেশন বা ফেডারেশন)। অর্থাৎ রাষ্ট্রের হিসাবে তার ইউনিট বা অখণ্ড বস্তু হবে এক একটি ভাষার ভিত্তিতে গঠিত এক একটি জাতি, যেমন বাঙালী, বিহারী, প্রভৃতি। এটাই কংগ্রেসের "অখণ্ড হিন্দুস্থানের" নতুন সংস্করণ। অর্থাৎ (১) কার্যত মানতে হল ভারতবর্ষ এক জাতির নয়, বহু জাতির দেশ; (২) সাম্রাজ্যবাদের গড়া ভারতবর্ষের শাসনগত ঐক্য এখন থেকে শিথিল হবে—ঘনিষ্ঠ রাষ্ট্রীয় সম্পর্কও এসব ভারতবর্ষীয় জাতিগুলি রাখতে বাধ্য হবেই। এখনকার মতই রেলওয়ে, টেলিগ্রাম বা গতায়াতের বন্ধন তো অটুট থাকবেই; শুল্ক বাণিজ্য আর বৈদেশিক ও দেশ রক্ষার ব্যবস্থাও হয়ত এরূপ একযোগেই চলবে। তবু (৩) আধুনিক সভ্যতার যে-সব অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ আমাদের ভারতবাসীদের ঘনিষ্ঠ করেছে তা আরও দৃঢ় করলেই এই সাম্রাজ্যবাদী অখণ্ডতা ভগ্ন হওয়াতে যে দুরন্ত ঘটার সম্ভাবনা তা নিবারণ করা ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব, এ কথা মনে রাখা দরকার। আর যোগাযোগের দ্বিতীয় পথ থাকবে আমাদের সংস্কৃতির,—যে-পথ চিরদিনই ভারতবর্ষের সকল প্রান্তকে সংযুক্ত রেখেছে।

কথাটি তাই এই :—ভারতবর্ষের ইউনিট যখন হতে চলল বাঙালী, বিহারী প্রভৃতি জাতিগুলি, প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে তখন আর বাঙালী থাকলে চলবে না, হতে হবে সেই প্রবাসেরই ভাইদের স্বদেশী। এবং ভারতবর্ষের শাসনগত বন্ধন যখন শিথিল হতে চলল তখন ভারতবর্ষের সকল জাতির যোগাযোগকে ঘনিষ্ঠতর করার দায়িত্ব আজ এসে পড়ল এই প্রবাসীদের উপরই বিশেষ করে। সেই মিলনের পথ দুটি দিকে খোলা আছে—এক, সর্বভারতীয় যোগাযোগ বা communication-এর পথ। বৈজ্ঞানিক ও কারুজীবী হিসাবে রেলওয়েতে, জাহাজে বন্দরে যাঁরা জীবিকা অর্জন করেন এই ভার তাদের উপর। সেখানে সমস্ত জাতির শ্রমিক ও সহকর্মীর সঙ্গে তাদের গড়তে হবে ব্যক্তিগত ঐক্য ও বন্ধুত্ব। দ্বিতীয় পথ, সংস্কৃতির। বাঙলার সংস্কৃতির নিকটে প্রবাসী বাঙালী এনে পৌছে দেবে অন্য সংস্কৃতির বার্তা। আবার বাঙলা সংস্কৃতিকে নিজেদের সর্ব-ভারতীয় অভিজ্ঞতার দ্বারা করে তুলবেন মহাজাতিক সংস্কৃতির প্রধান ধারা।

বাঙালী কালচারের হিসাব

কথা হবে, বাঙলার সংস্কৃতির এদিকে কতটা শক্তি ও সম্ভাবনা আছে। আমরা বাঙলা সংস্কৃতি নিয়ে গর্ব করি, কিন্তু একেবারে অন্ধভাবে গর্ব করি না। গর্ব করার মত বেশ কিছু কারণ নিশ্চয়ই আছে। **খুব কম করে হলেও একবার আমরা মনে করতে পারি এই সোয়া শত বছরে আমরা যা সৃষ্টি করেছি কোনো পরাধীন জাতি সম্ভবত এমন সৃষ্টি এত অল্প সময়ে করতে পারেনি।** আমরা এযুগে শিল্পে, ললিতকলায় ভারতবর্ষে (১) একটা বড় সাহিত্য সৃষ্টি করেছি; (২) অবনীন্দ্রনাথ থেকে যামিনী রায় পর্যন্ত ভারতের শিল্পকলার জগতে আমরাই অগ্রণী, —বাঙালীই ভারতের অন্যত্রও শিল্পকলার এযুগে উদ্বোধন করছে। (৩) রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে এদেশে এক নতুন আধুনিক সংগীত ধারা আমাদের দান। (৪) ভারতবর্ষে নাট্যজগতে আমাদেরই সৃষ্টি উল্লেখযোগ্য; এমন কি গণ-নাট্যের এক নতুন উন্মেষও প্রধানত বাঙলায় চলছে। (৫) আমরা নতুন করে নৃত্যশিল্পও উদ্বোধন করেছি। (৬) সিনেমা-রেডিওতে আমাদের শিল্পও আমাদের সৃষ্টির সাহায্য নিয়ে বিভিন্ন ধনিককেন্দ্রে ভারতবর্ষের একালীন ঐক্য রূপ নিচ্ছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও (১) আমাদের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা এখনো উল্লেখযোগ্য; (২) চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আমাদের দান এখনো

স্মরণীয়; (৩) নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতির গবেষণায় আমাদের কৃতিত্ব স্বীকার্য।

ভারতবর্ষের অন্য কোনো জাতিই একদিকে এ পরিমাণ সৃষ্টি এখনো করতে পারেনি, আমাদের দান প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অনেক ক্ষেত্রে তাদের প্রবুদ্ধ করেছে। আজ যখন তারা আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চেষ্টা করবে, তখন এই পূর্বজদের সাহায্য ও সহযোগিতা তারা আরও স্বচ্ছন্দেই গ্রহণ করবে, এবং নিশ্চয়ই অনেকক্ষেত্রে তাদের সৃষ্টি অধিকতর কৃতিত্বপূর্ণ হবে। কারণ শত সত্বেও আমাদের সৃষ্টিতে যে বহুদিকে ত্রুটি রয়েছে, বহু দিকে আমরা এখনো অনগ্রসর তাতেও ভুল নেই। খুব বিশদ ভাবে—হিসাব না করেও বল্‌তে পারি—সাধারণত বাঙালী সংস্কৃতি মানস সম্পদেরই সৃষ্টি করেছে বেশি, বাস্তব সম্পদ সে তুলনায় সৃষ্টি করেছে কম। যেমন, আমরা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় যতটা কৃতিত্ব দেখিয়েছি ব্যবহারিক বিজ্ঞানে, ও technological প্রয়াসে সে পরিমাণে কৃতিত্ব দেখাতে পারিনি সে দিকে ভারতবর্ষে অন্যত্র নানা প্রতিষ্ঠান ও গবেষক আজ বেশি অগ্রসর হচ্ছে। তার কারণ আমরা আর্থিক ক্ষেত্রে, বিশেষ করে শ্রমশিল্পে স্বদেশে ও প্রবাসে পিছিয়ে পড়ে গেছি। এযুগের বাণিজ্যে, জ্ঞান-বিজ্ঞানে তাই আমরা ততটা এগুতে পারি না। এজন্য রেডিও, সিনেমা, সংবাদপত্র—এযুগের এসব গুরুতর প্রভাবশালী ক্ষেত্রে আমাদের এখন প্রাধান্য নেই। আবার টেক্‌নোলজির ক্ষেত্রে স্বচ্ছন্দ না হলে ক্রমশই আধুনিক কালের উৎপাদন ক্রিয়ায় ও ও বণ্টন-ক্রিয়ায় আমরা পিছিয়ে পড়ব। অর্থাৎ, রেলের কাজে, যান-বাহনের কাজে, শিল্প সংগঠনের কাজে শুধু "কেরানী" হলে আমরা ক্রমশই পরাস্ত হব।—ভারতের বাস্তব যোগাযোগের ক্ষেত্রে কেরানীগিরির দাম খুব বেশি হতে পারে না; তার চেয়ে হাতে কলমে কাজ করা মিস্ত্রি মজুরেরও দাম বেশি। বাঙালীর সংস্কৃতির মধ্যে এদিকে একটা বড় রকমের ত্রুটি যে ঘনিয়ে উঠছে, তা কি আমরা বুঝি না? আমাদের ভদ্রলোকের সংস্কৃতি বড় শ্রমবিমুখ—বাস্তব বিমুখ।

অবশ্য বাঙলা সংস্কৃতির মূলের যা গলদ তা'ই তার এ ত্রুটির কারণ। তা এই ঃ মূলত আমাদের বাঙালী সংস্কৃতি ইংরেজের আওতায় জমিদারীতন্ত্রের মধ্যে গড়ে ওঠে। তার বাহক হচ্ছি আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা, বিশেষ করে হিন্দু ভদ্রলোকেরা। তাতেই আমাদের সংস্কৃতির গোড়া থেকেই ত্রুটি থেকে গিয়েছে ঃ যেমন (১) এ সংস্কৃতি বহুলাংশেই হিন্দুর সংস্কৃতি, হিন্দু ঐতিহ্যও

তাই যথেষ্ট পরিমাণেই আমরা গ্রহণ করেছি, কিন্তু মুসলিম ঐতিহ্য তাতে ততটা গ্রাহ্য হয়নি। এ জন্যই বাঙলার শিক্ষিত মুসলমান আজ একে অস্বীকার করে নিজেদের বাঙলা সংস্কৃতি গড়বারও কথা ভাবেন। (২) এ সংস্কৃতি বিশেষ করে মধ্যবিত্তের সংস্কৃতি, হিন্দু মুসলমান সাধারণ শ্রমিকের জীবনযাত্রার সঙ্গে তার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়; অর্থাৎ এ সংস্কৃতি হয়ে রয়েছে "বাবু কালচার।" (৩) এ সংস্কৃতি বিশেষ করে শহরে জন্মেছে; পল্লীজীবনের প্রভাব তাতে কম। তাই লোক সংস্কৃতিকে এমন কি কৃষি-সমাজের মূল রূপকেও, এ সংস্কৃতি বিশেষ করে স্বীকার করেনি। অর্থাৎ বাঙলায় সংস্কৃতির সংকট তিন রূপে প্রকাশিত হয়েছে: মানস-সম্পদের তুলনায় বাস্তব-সৃষ্টিতে আমাদের পারাঙ্মুখিতায়; 'বাবু কালচার' ও 'মিঞা কালচারের' নতুন দ্বন্দ্বে; আর বাঙলার 'ভদ্র কালচার' বনাম লোক-সংস্কৃতির পার্থক্যে।

ব্যাপারটা কতদূর শোচনীয় হয়ে উঠেছে তা আমাদের নববর্ষ উৎসব গুলোর দিকে তাকালেও দেখা যাবে। এ সব উৎসবে প্রায়ই মুসলমান যোগদান করেন না, আর বাঙালী গরীব শ্রমজীবী, মজুর, কৃষকের তাতে স্থান নেই। বাঙালী সংস্কৃতি থেকে এই ত্রুটি দূর করতে না পারলে তা সুস্থ হবে না, বাঙলার এ সব উৎসবও সর্বাংশে বাঙালীর উৎসব হবে না, তা বলাই বাহুল্য; আর এটি দূর করবার উপায় হচ্ছে এই মধ্যবিত্ত কালচারকে জন-সংস্কৃতিতে রূপান্তরিত করা, জমিদারীতন্ত্রের ভাঙা বনিয়াদ ছাড়িয়ে তাকে এ-কালের শিল্প ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

বাঙলা সংস্কৃতির দৃষ্টিভঙ্গি

কিন্তু তা সত্ত্বেও যা সত্য তা এই,—বাঙলা সংস্কৃতি এই সব ত্রুটি সত্ত্বেও কোনো সঙ্কীর্ণ নীতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠেনি। তার ভিত্তি ছিল ক্ষুদ্র, কিন্তু দৃষ্টি ছিল ব্যাপক। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত আমাদের এই সংস্কৃতির এই দৃষ্টিভঙ্গির খোঁজ নিলে দেখতে পাই—সত্যই তাতে "প্রাদেশিকতা" ছিল না, তা "বাঙালীয়ানা" বা "Bengali chauvinism"-এর প্রশ্রয় দেয়নি। তা দেওয়ার কথাও নয়: কারণ প্রথমত এ-সংস্কৃতির জাগরণের কারণ কোনো "বাঙালী প্রেরণা" নয়—পাশ্চাত্য সভ্যতা বা বুর্জোয়া জীবন ও তার সভ্যতার

প্রচণ্ড আঘাত। সে-সভ্যতা বাস্তব ক্ষেত্রে জমিদারীতন্ত্র সৃষ্টি করলেও মানসক্ষেত্রে কোনো পঙ্গুতার বা সংকীর্ণতার প্রশ্রয় দেয়নি। আমাদের সংস্কৃতি তার পাশ্চাত্য রূপের বিরুদ্ধেও যখন রক্ষা-কবচ খুঁজতে গিয়েছে তখন তা খুঁজেছে সর্বভারতীয় সভ্যতার ভাণ্ডার থেকে,—বাঙালীর সাজি থেকে নয়। রামমোহন রায় দেবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি বিশেষ করে ভারতীয় এতিহ্যকে বাঙলার কালচার গঠনে উপাদান রূপে গ্রহণ করেন। রামমোহন রায়ের তন্ত্রসাধনা "বাঙালীত্বের" প্রমাণ নয় ;—বড় জোর তা'র দৃষ্টিশক্তি যে বাঙালীর সাধনাকেও বিস্মৃত হয়নি, এ তারই প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যাকুল হয়েছিলেন বাঙালী জাতির জন্য। কিন্তু কোৎ, মিল, স্পেনসর, সীলির বিরুদ্ধে যুদ্ধে তার সম্বল ছিল গৌড়িয় বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ নয়, গীতার সর্বভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ ; অনুশীলনতত্ত্বের আশ্রয় বাঙালীর তন্ত্র নয়, ভারতীয় সাধনার ভক্তি যুক্তি বহুল কর্মযোগ। এ-ভাবেই বাঙালীর সংস্কৃতি গোড়া থেকে একটা সর্বভারতীয় (অবশ্য প্রধানত হিন্দু) মর্মবাণীকে আপনার করে নিয়েছে—কোনো বাঙালী ভিত্তিকে আশ্রয় করেনি। প্রমথ চৌধুরীর মত বাঙালী পেট্রিয়টিজমের প্রচেষ্টাও মনোজগতে সেই প্রাচীন ভারত ও আধুনিক ইয়ুরোপের মিশ্র জগতের বাসিন্দা। পরবর্তী কালে আমরা বৈষ্ণব পুনরুত্থান বা তন্ত্রের মধ্যে একটা বাঙালী সাধনায় বৈশিষ্ট্য দেখতে পেয়েছি, রামকৃষ্ণ ও বিজয়কৃষ্ণকে আশ্রয় করে তার প্রসার ঘটে। বিপিনচন্দ্র ও চিত্তরঞ্জন এ-বাঙলার রূপ আরও স্পষ্ট করে গেলেন। কিন্তু বাঙালীয়ানা বা বাঙালী chauvinism যতক্ষণ পর্যন্ত বাঙালী সংস্কৃতি বেশ সবল ছিল ততক্ষণ পর্যন্ত মোটেই আমাদের কোনো লেখক বা ভাবুককে বিচলিত করতে পারেনি—ও-জিনিসটার শুরু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময় থেকে, আর বেশি কাটৃতি হয়েছে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে। কিন্তু বাঙালী সংস্কৃতির যা দৃষ্টিভঙ্গি তা মোটেই অমন সঙ্কীর্ণ নয়, বরং তার এক চোখ ভারতীয় সাধনার দিকে, অন্য চোখ ছিল আধুনিক বুর্জোয়া সভ্যতার পাশ্চাত্য প্রয়াসের দিকে। এ-জন্যই আমরা বলতে পারি—বাঙালীর শিল্প-সৃষ্টি ভারতের অন্য জাতিদেরও পথ প্রদর্শন করেছে ; আর বাঙালীর সেই সংস্কৃতি ভাবীদিনেও ভারত-গোষ্ঠীর মহাজাতির দূত প্রাণের বন্ধনকে দৃঢ় করতে পারবে।

ভারতীয় গোষ্ঠীর এই যোগাযোগের বন্ধন কি করে নিবিড় হবে, এই নববর্ষে প্রবাসী বাঙালীর পক্ষে তা স্বভাবতই ভাবনার বিষয় হয়েছে। এখন থেকে প্রবাসে আর তাঁদের বাঙালী বলে রাষ্ট্রীয় পরিচয় দেবার অধিকার থাকবে না—পরিকল্পিত

যৌথরাষ্ট্রে তারা নিজেদের বিহারী, উড়িয়া, অহমিয়া, হিন্দুস্থানী বলেই মানতে বাধ্য হবেন। ভবিষ্যতে ভারতীয় মহাজাতি গঠন তাই এবার তাদেরই পক্ষে প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বেশি আর তারাই ভাবী মহাজাতির রাজদূত। সেই মহাজাতি গঠনের জন্য ভারত-গোষ্ঠীর জাতিদের যোগাযোগের সূত্র (communication) পথ প্রশস্ত করাই হবে প্রবাসীদের নতুন সাধনা। ভারতের এ-যোগাযোগ অবশ্য বাস্তব আর মানসিক দুইই, অথবা অনেকক্ষেত্রেই দুইয়ের মিশ্রিত পথ। অর্থাৎ একদিকে তাদের এ-কালের টেকনিক বা কারুবিদ্যা আয়ত্ত করে রেলে-জাহাজে, বাজারে-বন্দরে সেনাবিভাগে, শিল্পায়োজনে জীবিকাসূত্রে এই যোগাযোগের সাধনা গ্রহণ করতে হবে ; অপর দিকে তাঁদেরই আবার সেই সঙ্গে নিতে হবে বাঙালী সংস্কৃতির মর্মবাণী প্রচারের ভার। মনে রাখা দরকার সিনেমা, রেডিও, কলের গান, এসবই এই যোগাযোগের পক্ষে নূতন শিল্প-পথ। এ-ক্ষেত্রে অর্থকরী বনিয়াদ যারই থাক শিল্পগত কৃতিত্ব বাঙালীরও হতে পারে। তাছাড়া নতুন ভারতে শিল্পপত্তনে ও শিল্পপ্রসারে বাঙালী শিল্পীও নিশ্চয়ই আদর লাভ করতে পারে।

অবশ্য, এ কথাই বলা বাহুল্য তার সঙ্গে সঙ্গে আজ ভালো করেই মনে রাখতে হবে—আমাদের বাঙলায় বাঙালী সংস্কৃতি এখনো খণ্ড, ভগ্ন, অসম্পূর্ণ, সে-সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমানের সমবেত সংস্কৃতিতে পরিণত হওয়া দরকার। 'বাবু কালচার' ও 'মিঞা কালচারের' দ্বন্দ্ব মিটলেই শুধু হবে না, বাঙালী কৃষক ও মজুরেরও কালচারে তার পরিণত হওয়া চাই এবং সঙ্গে সঙ্গে তার চাই লোক-সংস্কৃতির দান ও ঐতিহ্য গ্রহণ করে তার বিস্তার ও ধারা-বাহিকতাকে সম্পূর্ণ করা। সেদিকে বাঙালী সংস্কৃতি সম্পূর্ণ না হলে ভারতের যোগবর্ধন তো দূরের কথা বাঙলারও অখণ্ডতা বজায় রাখবে না।

নতুন ইতিহাসের দুয়ারে আজ নববর্ষে ভারতের সমস্ত ভারতবাসীই দাঁড়িয়েছে। বাঙালী সংস্কৃতির নতুন ইতিহাস গড়ার দায়িত্ব আজ বাঙলার। তার আভ্যন্তরীণ বিরোধের সমন্বয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। একালে এই ভারতীয় যোগাযোগের ধারা প্রশস্ত করার দায়িত্ব বিশেষ করে প্রবাসী বাঙালীর —সেই পরিশ্রমী, জীবিকান্বেষী, শ্রমজীবী ও শিল্পজীবী সকল বাঙালীর। ভারতীয় মহাজাতির রাজসভায় তারাই বাঙালীর দূত—আর ভারতের ভাবী সমাজের তারাই সংগঠক। *

---

* ১লা বৈশাখ, খগোল (দানাপুর) নববর্ষ সম্মেলনের বক্তৃতার মর্মাবলম্বনে লিখিত।

রিনেইসেন্সের হেরফের

কে জানে যুদ্ধেরই একটা ফল কিনা, কিন্তু দেখা যাচ্ছে মনস্বীদের জগতে একটা নতুন লক্ষণ প্রবল হয়ে উঠেছে। পুরনো জীবন-চিন্তায় তাঁরা বর্তমান সভ্যতার ব্যাধিকে বুঝে উঠতে পারছেন না। তাই, বোধ হয়, পণ্ডিতেরা আগে যে-ভাবে নতুন জীবন-চিন্তাকে দূরে সরিয়ে রাখতেন, তেমনভাবে আর তাঁরা নতুন চিন্তাকে অগ্রাহ্য করতে পারছেন না। তাঁরা বুঝ্ছেন, পৃথিবীর পুনর্গঠন করতে হলে তাকে পুরনো ছাঁচে ঢালাই করলে আর চলবে না। তাই তাঁদের পুরনো জ্ঞান ও বিজ্ঞানের ছাঁচও এবার বদ্‌লানো দরকার। এই বোধের একটা প্রমাণ যেন মিল্‌ছে 'ইণ্টার্‌ন্যাশ্‌নাল লাইব্রেরী অব্ সোশিওলজি এণ্ড সোশ্যাল-রিকন্‌স্ট্রাক্‌শন্' নামক সিরিজের নূতন প্রকাশিত গ্রন্থাবলী থেকে। সিরিজের নামটায় একটা বিশেষ অর্থ আরোপ করতেও এজন্য লোভ হচ্ছে। সে-অর্থটি এই—সোশিওলজি, সমাজ-বিজ্ঞান, এখন বর্তমান সমাজের অবস্থা ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে উদাসীন নয়; সোশ্যাল রিকন্‌স্ট্রাক্‌শনের, মানে সামাজিক পুনর্গঠনের সেই দায়িত্ব এ-বিজ্ঞান মেনে নিতে চায়। মানে, এ-যুগের সমাজ-বৈজ্ঞানিকরা শুধু সভ্যতার রূপ জান্‌তে চান না, এবার সভ্যতাকে রূপান্তরিত করতে চান। আর্থিক পরিকল্পনা, মনোবিজ্ঞান, শিক্ষা, সাহিত্য, শিল্প প্রভৃতি নানা বিষয়ে এই সিরিজে যে নতুন গ্রন্থাবলী বেরুচ্ছে তা দেখে মনে আশার সঞ্চার হয়।

রিনাইসেন্সের হেরফেরের কথা বুঝি ইতালির রিনেইসেন্স সংবন্ধে এদের একখানি গ্রন্থ থেকে। *

* Sociology of the Renaissance—Alfred von Martin, (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co, Ltd. London. 8/6)

ছোট বই। মূল লেখা বই জার্মান ভাষায় ১৯৩২-এ—হিটলারের আবির্ভাবের পূর্বমুহূর্তে। লেখক ফন্ মার্টিনের আলোচ্য বিষয় রিনেইসেন্সের যুগধর্ম। সেজন্য ইতালির রিনেইসেন্সকে তিনি বিচার করেছেন। ইতালির রিনেইসেন্সের আসল রূপ ফ্লোরেন্সেই আবার পরিস্ফুট হয়, এই তিনি মনে করেন। কারণ, ফন্ মার্টিনের মতে জার্মানী যেমন 'মধ্যযুগ' বা 'রোমান্টিক পুনর্জীবনের' লীলাভূমি; পশ্চিম ইউরোপ যেমন 'যুক্তিযুগের' লীলাভূমি, 'রিনেইসেন্সের' লীলাভূমি তেমনি ইতালি। দেশেদেশে জলবায়ু, ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে এই খাঁটি যুগধর্মের একটু প্রকারভেদ হয়। ইতালির রিনেইসেন্স আর তার ইংরেজি সংস্করণে যে কত তফাৎ, তা আমরাও জানি। কিন্তু লেখক ইতালির রিনেইসেন্স বর্ণনা করতে বসেননি; সেজন্য বুর্কহার্ডট্-এর গ্রন্থই এখনো পাঠ্য—যাঁদের তত কৌতূহল আছে। ফন্ মার্টিন করেছেন যুগধর্মের ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যায় তিনি ম্যাক্স্ ভেবর-এর পথ ধরেছেন, অনেকটা 'পরিবেশবাদী' পথ। মানুষক যে পরিবেশ বদ্‌লায় তা এমতে ততটা প্রকট নয়। ফন্ মার্টিন্ আলোচনা করেছেন—কি সামাজিক কার্যকারণে রিনেইসেন্সের "যুগধর্ম" এই বিশেষ রূপ গ্রহণ করলে; আর সেই যুগকেও সেই যুগধর্ম আবার কি নতুন রূপ দান করলে। তাঁর এ আলোচনা পদ্ধতির গোড়ার সূত্র এই যে, এই যুগধর্মের রূপ-নির্ণীত হয় যারা আর্থিক, রাজনীতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে শাসকশ্রেণী তাদের দ্বারা। কিন্তু ভোলা উচিত নয় যে, ম্যাক্স্ ভেবর প্রমুখ আলোচকরা আসলে মানুষকে পরিবেশের পুতুল হিসেবেই দেখেছেন বেশি। মানুষ যে পরিবেশকে বদলায়, নিজেকেও বদলায় সেই সূত্রে, এ-দিক এই পণ্ডিতেরা ভুলে যান। ফন্ মার্টিনেরও গবেষণায় এ-কারণে ত্রুটি রয়েছে। তিনি যেন পরিবেশের নিকট রিনেইসেন্স-চেতনার পরাজয় দেখতেই উদ্যোগী। তার মূল ধারাটি তবু আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে অন্য নানা কারণে।

ধনিকতন্ত্রের বীজাবস্থা

মধ্যযুগ থেকে বর্তমান যুগে যাত্রার পথে ইতিহাসের প্রথম ঘাঁটি এই ইতালীয় রিনেইসেন্স। কাজেই সেই প্রথম পর্বেও নিশ্চয়ই কিছু কিছু মধ্যযুগের চিহ্ন থাকবে—তা ভুললে চলবে না। কিন্তু তার উপর গুরুত্ব আরোপ করা উচিত

নয়। গুরুত্ব আরোপ করতে হয় নতুন সামাজিক লক্ষণগুলোর উপর—যা পরে আরও প্রকাশিত হবে, বিকশিত হবে, যার সূচনা দেখা দিয়েছিল তখন রিনেইসেন্সে। আমাদের যুগে ধনিকতন্ত্রকে দেখছি আমরা বহু পল্লবিত; কিন্তু রিনেইসেন্সের যুগে ধনিকতন্ত্র সবে জন্মাচ্ছে বণিক্ বেশে। তবু তার ভ্রূণ জীবনেই তার যে-সব চাল-চল্‌তি দেখা যায় তা এ-যুগের ধনিকতন্ত্রের গতিবিধি বুঝবার পক্ষেও বেশ কার্যকরী। সেদিক থেকে এ-গ্রন্থ সকলেই পাঠ করে উপকৃত হবেন, বেশ তীক্ষ্ণ ও বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ দেখতে পাবেন।

'মানি-ইকোনমি'

মধ্যযুগের সমাজ-জীবনের ভিত্তি ছিল জমি। সমাজে জমির মালিকের ক্ষমতা ছিল প্রচুর। সম্পত্তি হিসাবে জমি স্থাবর সম্পত্তি, তার ফলে মধ্যযুগের জীবনধারা ছিল স্থাণু। তখনকার এম্পায়ার বা রাষ্ট্রশক্তি এবং চর্চ বা ধর্ম-সংস্থা সেই সমাজ-বিন্যাসকে আরও অনড় বলে ঘোষণা করত; বলত, কারিগর ব্যবসায়ী, শিল্পীরাও যার যেখানে স্থান সেখানেই থাকবে। কিন্তু এই জীবন-যাত্রার মধ্যেও বাজার বন্দর বেড়ে উঠতে লাগল, শহরগুলো ফেঁপে উঠতে লাগল; শহরের বুর্গার বা ব্যবসায়ীরা ক্রমে ক্রমে সম্পন্ন হতে লাগল, তাদের হাতে টাকাকড়ি জমতে লাগল। এ-ভাবে "মুদ্র-প্রধান" জীবনযাত্রার গোড়াপত্তন হল, অর্থাৎ 'মানি-ইকোনমির' দিন শুরু হল। মুদ্রা বা টাকাকড়ি অস্থাবর সম্পত্তি, বড় তাড়াতাড়ি তা হাত বদলায়। তাই, টাকার তাড়ায় মধ্যযুগের স্থাণু সমাজ আর স্থাণু রইতে পারল না; ক্রমেই তা সচল হয়ে উঠল। সমাজের সনাতন ঠাট তখনো বজায় রাখতে চাইল ধর্ম, রাষ্ট্র, ও আর আর সব প্রাচীন প্রাচীন শক্তি; তাদের সেই বাধা অগ্রাহ্য করে প্রসারলাভ করতে চাইল বণিক ব্যবসায়ীরা। এইভাবে বণিকতন্ত্রের প্রথম সূচনা হল, তার **প্রধান গুণ হল সচলতা**। এই সচল দলে প্রধান উদ্যোগী ছিল মুদ্রাবলে সচল বণিকেরা, আর তাদের সঙ্গে ছিল বুদ্ধিবলে সচল বুদ্ধিজীবীরা। এদের সংযুক্ত বিদ্রোহে মধ্যযুগ শেষ হল। এই বিদ্রোহই রিনেইসেন্স, মানে, বনিগ্-যুগের প্রথম পর্ব। সে পর্বের যে-দিকটিতে বুদ্ধির মুক্তি, নানা মানবীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা অনুসন্ধান, আর্টের অপূর্ব বিকাশ, মানুষের মহিমাবোধ—আমরা সে-দিকটিকেই বিশেষ করে বলি "রিনেইসেন্স।"

এই বুদ্ধিজীবীরাও মোটামুটি বণিকতন্ত্রের প্রয়োজনকে মেনে নিয়ে সমাজকে নতুন করে গঠন করতে লাগেন ; বণিকতন্ত্রও আবার নূতন সমাজপত্তনে এই গুণী ও জ্ঞানীদের স্থান ও দান স্বীকার করে নেয়। কারণ, দু-দলই ছিল সহযাত্রী, সমাজ-প্রগতির স্বপক্ষে মধ্যযুগের বিপক্ষে। সচলতা বা গতিশক্তি সমাজে যখন দেখা দিল তখন "সমাজের নূতন বিন্যাস" শুরু হল প্রথমত ব্যবসায়ী শ্রেণীর উদ্ভবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল "উদ্যোগনিপুণ পুরুষেরা", ইনডিভিডুয়েল্ অাঁত্রেপ্রেনুর। তারা কেউ বণিক্, কেউ বা যোদ্ধা, রাষ্ট্রবিদ্। তৃতীয়ত দেখা দিল—"নূতন চিন্তা পদ্ধতি",—অর্থবান বা শক্তিমানদের সমাজ-সম্ভ্রম, বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার সমাদর, সময়ের মূল্যবোধ ; মিতব্যয়িতার আদর, ধর্মচিন্তায় পর্যন্ত যুক্তির প্রতিষ্ঠা। চতুর্থ গুণ দেখা গেল—"ব্যবহারিক জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞের জন্মে",—লিওনার্ডো ও মেকিয়াভেলি তারই দৃষ্টান্ত। সমাজের পুনর্গঠনের থেকে আবার উদ্ভূত হল "নূতন শিল্পকলা।" যতই পুরনো ঐতিহ্যের বন্ধন শিথিল হয় ততই নতুন শিল্প প্রচেষ্টা সাহসী হয়ে ওঠে, গতিমান হয়ে ওঠে—শিল্পী আত্ম-চেতন হয়ে ওঠেন। শহরের প্রাধান্য ফুটে ওঠে শিল্পীর শিল্পে —বণিকের মিতাচার হয় মহত্ত্বের সঙ্গে সম্মিলিত, বাস্তব হয় বিরাটের চিন্তার সঙ্গে সংযুক্ত। ষষ্ঠস্থলে দেখি "পাণ্ডিত্য ও বিদ্যার কাজ"। বিদ্যা ও জ্ঞানার্জন ছিল এতদিন চর্চের একচেটিয়া ; কিন্তু এবার আবির্ভূত হল অন্য দল। 'হিউম্যানিজম্' বা মানব-জ্ঞানের জন্ম হলে বুদ্ধিজীবীরা বুঝলে সব মানুষই মানুষ, আর 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—তা ছেড়ে পরমার্থও নেই। সেই যুগের শাস্ত্রপড়া পাণ্ডিত্যের বা স্কলেস্টিসিজমের বিরুদ্ধে এই 'হিউম্যানিস্টরা' দাঁড়ান। বুদ্ধির মুক্তি, মানুষের মুক্তি তাঁদের কাম্য ; তাঁরা মনে করেন, তাঁরাই তো প্রাচীন গ্রীক-রোমক জ্ঞান-গরিমার উত্তরাধিকার পুনরুদ্ধার করছেন। বুদ্ধিজীবীদের এ-সব কাজে তাই ব্যক্তির আর্থিক প্রতিষ্ঠার পথ খুলে গেল। বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাও ছিলেন নিজ নিজ ব্যক্তিগত বিদ্যা বুদ্ধি সম্বন্ধে গর্বিত, অর্থাৎ আত্ম-সচেতন।

বুদ্ধিজীবী ও অর্থজীবী

কিন্তু সব চেয়ে কৌতুকজনক হল এই 'বুদ্ধিজীবী আর বিত্তজীবীদের সম্পর্ক'। টাকার মত বিদ্যারও সম্মান সম্ভ্রম নতুন সমাজে বাড়ল! তাতে ক্রমেই বিদ্বানরা

বিত্তবানদের শ্রেণীতে স্থান লাভ করলেন। সালুতাতির মতো অনেকেই তাতে হয়ে পড়লেন বণিকশ্রেণীর সমধর্মী। কিন্তু পেত্রার্কার মতো কেউ কেউ তা হলেন না, আত্মসচেতন বলে হয়ে উঠ্‌লেন স্বতন্ত্র। বুর্জোয়ার চাল-চল্‌তি, ধ্যানধারণা, সাধারণ বন্ধন, এমন কি, পারিবারিক বন্ধনেও এই 'স্বতন্ত্র' বুদ্ধিজীবীদের অনেকের শ্রদ্ধা ছিল না। এরাই পরবর্তী ধনিকতন্ত্রের যুগের সাহিত্যের 'স্বাতন্ত্র্যবাদীদের' অগ্রদূত। কিন্তু দু'দল বুদ্ধিজীবীই পুরনো পণ্ডিতদের আর "ইতর" মানুষদের সমান ঘৃণা করতেন; সে-সময়ে তাঁদের মনে থাকত না—'সবার উপরে মানুষ সত্য'। আবার বণিকরাও টাকার আভিজাত্যে সাধারণ মানুষকে আর মানুষ মনে করতেন না। বুদ্ধিজীবী আর অর্থজীবীদের কাজেই সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌ল। অর্থ ও বুদ্ধি দুই হল প্রগতি-পথের দুই শক্তি। এক সঙ্গে চল্‌লেও দুদিকে কিন্তু এদের মুখ। তাই একই সঙ্গে সংযুক্ত থাক্‌লেও এদের পার্থক্যও লুপ্ত হতে পারে না। 'মানি-ইকোনমির' উপর গঠিত সমাজে মননশক্তি তৃপ্তি পাবে কতক্ষণ? বণিকেরাই বা সম্পূর্ণরূপে মননশক্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কি করে? বুদ্ধিজীবীরাই বা কি করে বিসর্জন দেবেন তাঁদের 'অধ্যাত্ম' সম্বল, তাঁদের আত্মা, তাঁদের মিশন? কেউ কাউকে তবু ছাড়তেও পারে না। কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা যেন ব্যবসায়ী বণিকশ্রেণীর মধ্যে মিশে গেলেন না; 'শ্রেণীর অভ্যন্তরে শ্রেণী' হয়ে স্বতন্ত্র নিরবলম্ব হয়ে উঠ্‌তে লাগলেন। পেত্রার্কার সময় থেকেই হিউম্যানিস্টদের এই সঙ্কটও শুরু হয়—তাঁরা কখনো কখনো ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পেত্রার্কার মতোই পুরনো অভিজাত সম্ভ্রান্তদের থেকেও সাহায্য গ্রহণ করতেন। আর শেষে যখন মেডিচিদের মত বণিগ্‌-রাজদের আবির্ভাব ঘটল,—যাঁদের বিদ্যাও আছে, বিত্তও ছিল, শক্তিও লাভ হল—তখন বুদ্ধিজীবীদের পক্ষে এই বণিক পূজায় বাধা আরো কমে গেল।

মধ্যবিত্তেরা কোন্ পথে?

বণিক ও বুদ্ধিজীবীর এই মিলন-বিরোধের দ্বৈত লীলার মতই কৌতুকজনক 'রিনাইসেন্সের' উদয়াস্ত। বণিকতন্ত্রের প্রথম পর্ব রিনাইসেন্স বটে, কিন্তু তারও ভিতরে উত্থানপতনের কাহিনী আছে। আর্টের আলোচনায় তিন ভাগে তা বিভক্ত হয়, আদি, মধ্য, অন্ত। এরূপ বিভাগের মূলে আছে সামাজিক বিকাশের

তিন অধ্যায়। রিনেইসেন্স আরম্ভ হল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উন্নতিতে। নিজের এই অধিকার সেই বণিক্‌শ্রেণী আয়ত্ত করলে গণতন্ত্রের নামে, তারা নিজেরা কর্তৃত্বের অধিকারী হল। তখন আরম্ভ হল মধ্যলীলা। পুরনো সামন্ত অভিজাতদের সঙ্গে এবার বণিকশ্রেণী নানা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হতে লাগল ; 'ভিলা' বা বাগানবাড়িতে তারাও নানা অভিজাত্যসূচক আচার অলোচনা জমিয়ে তুলল। চর্চের সঙ্গেও তারা এরূপ বুঝাপড়া করে নিলে, চর্চও তাদের মেনে নিলে। অর্থাৎ মধ্যবর্তী বণিকশ্রেণী এরূপে শাসকশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে ক্রমেই তখন সনাতন আচার-বিচার, ধ্যান-ধারণা, 'শিষ্ট' জীবনযাত্রা গ্রহণ করলে। বুদ্ধিজীবীদেরও বরাবরই টান ছিল এই 'শিষ্ট' সমাজের উপর ; তাই তাঁরাও এ-পথেই অগ্রসর হয়। অর্থাৎ মধ্যবর্তীরা কেউ নিম্নবর্তীদের সঙ্গে যোগ রাখল না ; তাই গণতন্ত্রের দাবীও আর তুল্‌ল না। ক্রমে তাই এল অন্তঃপর্ব। চর্চ ও আভিজাত্যের সামনে আগেকার গণতান্ত্রিক চেতনা লোপ পেল—এল অধিনায়কদের, ডিক্টেটরের, যুগ। ফন্‌ মার্টিন্‌ বলেছেন, মধ্যবিত্তদের এরূপ পরিণতি যে শুধু ধনতন্ত্রের সেই প্রথম স্তরেই ঘটে গিয়েছে তা নয়। আর এ-কথা পাঠক মনে রাখলেই তিনি তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে মনে করবেন। ইউরোপের গণতন্ত্রের নতুন রাহুগ্রাস আজ শেষ হতে যখন যাচ্ছে তখন এই কথাটা বিশেষ করে মনে রাখবার মতো—কতবার গণতন্ত্রের নামে ধনিকতন্ত্র সভ্যতাকে প্রতিক্রিয়াশীল নায়কতন্ত্রের নিকট বলি দিয়েছে। কারণ সত্যকারের গণতন্ত্র আর্থিক বৈষম্যবাদের উপর গড়ে উঠতে পারে না।

ওদেশে আর এদেশে

কিন্তু ইউরোপ কেন, বণিকশ্রেণীর এই অভিজাত বর্গে প্রমোশন পেয়ে অচল হয়ে বসা, কিংবা বুদ্ধিজীবীদের এই বণিকশ্রেণীর সঙ্গে মিলন-বিরোধ,—তাঁদের আসরে স্থান পেয়ে অচল হয়ে বসা,—এ-সব কি আমাদের দেশেও আমাদের আধুনিক ইতিহাসে আমরা দেখিনি ? তফাৎ ভুলবার কারণ নেই। ইতালির রিনেইসেন্সের থেকে ইংলণ্ডের রিনেইসেন্সেরও তফাৎ ছিল, আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর রিনেইসেন্সের তো তফাৎ থাক্‌বেই। আমাদের রিনেইসেন্স বরং বিলিতী ধনিকতন্ত্র ও তারই বুদ্ধিজীবীদের ছাপ বহন করবে ; তাই করেছেও।

স্থান ও কালের এত বড় তফাতে অনেক বিষয়েই মৌলিক তফাৎ ঘটে। কিন্তু সব চেয়ে বড় কথা আমাদের রিনেইসেন্স এসেছিল সাম্রাজ্যবাদের আওতায়; তার উপরে আমাদের 'চর্চ' নামে কিছু ছিল না; নিজেদের রাষ্ট্র ছিল না; খাঁটি সম্ভ্রান্ত শ্রেণী প্রায় ছিল না, আবার তেমনি খাঁটি বণিকতন্ত্রও ছিল না। বেনিয়ন-মুৎসুদ্দিরা ইংরেজ রাজের সঙ্গে কলহে প্রবৃত্তই হতে পারে না; তাদের আসল মুরুব্বিই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী কর্তারা। পুরনো জমিদার জায়গীরদারদের এই ইংরেজ রাজাই তাড়ায়, আর সেই অভিজাতের স্তরে স্থান করে দেয় মুন্সী, দেওয়ান মুৎসুদ্দিদের; ব্যবসায়ীরাও ক্রমে তাদের সঙ্গে গিয়ে বসল। মানে, জমিদারতন্ত্র শেষ হল না, জমিদারি হাত বদ্‌লালো। অবশ্য এ দেশের নতুন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীরা এই ইংরেজ রাজ ও তার শিক্ষা-দীক্ষার ফল, তার কেরানীগিরির উমেদার। ইংরেজ পুষ্ট অভিজাতদের 'ভিলায়', বৈঠকখানায় তাঁরাও একটা স্থান লাভ করেন নিজেদের প্রতিভার বলে। ধর্মে, সমাজে, শেষে রাষ্ট্রে এই বুদ্ধিজীবীরাই হলেন বিদ্রোহের নেতা। যুদ্ধের সঙ্গে এদেশের নিম্ন মধ্যবিত্ত আজ এসে গিয়েছেন 'বেতন-দাসের' কোঠায়; কিন্তু আজও এই বুদ্ধিজীবীদের নেতৃদল—যতই তাদের বিরোধ থাক্ ধর্ম ও রাষ্ট্রের কর্তাদের বিরুদ্ধে—দেশীয় ধনিক ও অভিজাতদের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপনেই উন্মুখ। তাঁদের টান রয়েছে এই উচ্চশ্রেণীর এই 'ভদ্র' জীবনের উপর—গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সম্পূর্ণ মানে তাঁরা বুঝতে চান না।

কোনো দেশের রিনেইসেন্সই হুবহু অন্য দেশের রিনেইসেন্স-এর মত হয় না। সাম্রাজ্যবাদের চাপে আমাদের রিনেইসেন্স-এর স্বাভাবিক বিকাশ একেবারেই হল না। তবু যেমন সেই সাম্রাজ্যবাদের চাপেই ধনিকতন্ত্র গড়ে ওঠে বেঁকে-চুরে, তেমনি একটা বাঁকা-চোরা রিনেইসেন্সও দেখা দেয় সেই ধনিকতন্ত্রের জন্মের প্রথম পর্বে। আর তারও সামাজিক আলোচনা ও বিশ্লেষণ সত্যই অতি শিক্ষাপ্রদ হবে। সেদিকে তথ্যসংগ্রহও এখন হয়েছে। অতএব ফন্ মার্টিনের মত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে এখন তার বিশ্লেষণও করা সম্ভব। অবশ্য কোন মনীষী তাতে প্রবৃত্ত হলে দৃষ্টান্ত দিয়ে তাঁর ব্যাখ্যা পরিষ্কার করতে হবে। ফন্ মার্টিন তা করেননি—এক শ' পৃষ্ঠায় শুধু তিনি বিশ্লেষণটুকু উপস্থিত করেছেন। তাঁর আলোচনা-পদ্ধতি যেমন সংক্ষিপ্ত তেমনি সত্যিও। আমরা যারা ফ্লোরেন্স-এর রিনেইসেন্স-এর কথা তত বেশি জানি না, তারা আরো বিশদ ও স-দৃষ্টান্ত আলোচনা পেলে আরো সহজে এ-গ্রন্থের প্রতিপাদ্য কথা বুঝতে পারতাম।

এখনো যা বুঝতে পারি তা হচ্ছে এই—লেখকের মতে রিনেইসেন্স-এর গবেষক, শিল্পী সবাই যেন একেবারেই পরিবেশের নিকট আত্মসমর্পণ করে বসলেন, পরিবেশকে তারা বেশি বাদলাতে চাইলেন না। নিজেরাই বদ্‌লে গেলেন—স্বার্থ ও সুবিধা পেয়ে। একথায় পরিবেশ-বাদিতারই অবশ্য শক্তি প্রমাণিত হয়। এ তত্ত্বের ভুল তো আমরা জানিই। আমাদের দেশের রিনেইসেন্সকে বিশ্লেষণ করতে গেলে তাছাড়াও, সে "নবযুগকে" একটু বুঝিয়েই বলতে হবে; আর ভুললে চল্‌বে না তার ভাগ্য মূলত নির্ধারিত করেছে উপনিবেশের সাম্রাজ্যবাদ।

মাঘ, ১৩৫১

কালচার ও কমিউনিস্ট দায়িত্ব

কালচার বলতেই আমাদের দেশের কোনো কোনো রাজনীতিক দলের মনে কিছুদিন পূর্বে একটা কৌতুকের বা সন্দেহের উদয় হত। তারা কৌতুক বোধ করত এই ভেবে—'কালচার মানে তো কবিতা, সাহিত্য, নৃত্য, গান, চিত্র এসব জিনিস, ওসব আমাদের মত কাজের মানুষদের জন্য নয়'। সন্দেহ বোধ করত এই ভেবে যে, 'কাব্য, সাহিত্য, সংগীত, শিল্প এসবে মানুষ সাড়া না দিয়ে পারে না। আমরা কাজের লোকের হাজার 'কাজের কথা' লিখে ও চেঁচিয়ে যা করি, ও সব বাজে জিনিসের প্রভাবে তা অতি সহজে ধুয়ে মুছে যায়।' এসব বিপ্লববাদীরা কেউ তাই কালচার শুনলে রুখে দাঁড়াত, কেউ মুচকি হেসে তার পাশ কাটিয়ে যেত। আর কেউ বা গম্ভীরভাবে তত্ত্ব কথা শোনাত—"আমরা হলাম কাজের মানুষ, আমরা কি হাসতে পারি, নাচতে পারি?"

রাজনৈতিক কর্মীদের মনে এভাবে একটা ধারণা জন্মেছিল যে, কালচার বা সংস্কৃতি বুঝি তাদের ভাববার মত ও বুঝবার মত জিনিস নয়। কিন্তু আমাদের দেশের রাজনৈতিক প্রয়াস আগেকার যুগে কালচারের সঙ্গে তেমন নিঃসম্পর্কিত ছিল না। তার কারণ সহজেই বুঝতে পারি। আমাদের দেশে রাজনৈতিক আন্দোলন ঠিকভাবে রূপ নিতে থাকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের দিকে। তার আগেই কিন্তু আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বাজাত্য বোধ জন্মলাভ করতে শুরু করে। রামমোহন রায়ের পরে ধীরে ধীরে যে কালচারাল্ রিনেইসেন্স বা "সংস্কৃতির নবজন্ম" দেখা দেয়, এই দেশপ্রীতি ও স্বাজাতিকতা তাতেই আমাদের মনে রূপলাভ করতে থাকে। একটা সংস্কৃতিমূলক নূতন চেতনা আমাদের মনে হিন্দু স্কুলের পর থেকে ইংরেজী

শিক্ষা দীক্ষায় জাগতে থাকে। তারই ফল মাইকেল-মধুসূদন, রাজনারায়ণ বসু প্রভৃতি, আর শেষে বঙ্কিম, দীনবন্ধু, হেম, নবীন প্রভৃতি সাহিত্যিকেরা। এই চেতনাই প্রথম দিকে ধর্ম-সংস্কারে (মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও ব্রাহ্মসমাজ, পরে শ্রীরামকৃষ্ণে) সমাজ সংস্কারে (কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দে) দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কাব্যে (মধুসূদনে), গানে (প্রথম দিকের হিন্দু মেলার স্বদেশী গান, কিংবা সেদিনের ধর্ম-সংগীত, ব্রহ্ম-সংগীত প্রভৃতিতে) উপন্যাসে, নাটকে (বঙ্কিমে, দীনবন্ধুতে), নানা ঐতিহাসিক রচনায় প্রবন্ধ সাহিত্যে (রাজনারায়ণ বসু, রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ে) এই সংস্কৃতির চেতনা ফুটতে থাকে। এঁদের রীতি, লেখা, প্রেরণা থেকেই আমাদের দেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ ক্রমেই পরিষ্কার রূপ গ্রহণ করতে পারে।

এইরূপে সামাজিক ও সাহিত্যিক ক্ষেত্র থেকে নতুন শক্তি সংগ্রহ করে নিয়ে এই চেতনাই ক্রমে ১৮৮০-এর পর থেকে রাজনীতিক কর্মে দানা বেঁধে ওঠে। তাই, সে প্রথম যুগ থেকেই দেখি আমাদের রাজনীতিক সভা সমিতি আরম্ভ হত গান দিয়ে; তাতে কবিতা আবৃত্তি হত, পাঠ হত। সেদিনে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য সংস্কৃতি কর্মীরা সে-সব সভার উদ্বোধনে সাহায্য করতেন। তারপরে এল স্বদেশী যুগ। তখন তো বাঙলাদেশে অন্তত রাজনীতি আর সংস্কৃতির প্রয়াস সমান তালে চলেছিল। কাব্যে, গানে, নাটকে, চিত্রে সমস্ত দিক দিয়ে যেন বাঙালী সেদিন ফুটে উঠতে চেয়েছিল। সেদিনকার সে-সব কথা মনে রাখলে এদেশের রাজনৈতিক কর্মীদের পক্ষে 'কালচারকে' অন্তত দূরের জিনিস বলে ভাবা চল্‌ত না। কিন্তু সেই জোয়ারে একদিন ভাটা পড়ল। রাজনৈতিক কর্মীরা এমন কি বিপ্লবীরাও তারপর থেকে সংস্কৃতি সেবকদের আর নিজেদেরই সহযোগী বলে তত সহজে ভাবতে পারেননি। একবার মাঝখানে নজরুলকে পেয়ে বাঙালী বিপ্লবীরা উৎসাহিত হন। এখনো সভা সমিতির উদ্বোধনে গান হয়, স্বদেশী কবিতাও হয়ত আবৃত্তি হয়, কিন্তু তা যেন খানিকটা আনুষ্ঠানিক ব্যাপার হয়ে গিয়েছে।

আমরা কমিউনিস্টরাও যে এ-মনোভাব একেবারে কাটিয়ে উঠেছিলাম, তা নয়। আমাদের পক্ষে এ-রকম ভুল করবার কারণ ছিল আরও বেশি। কারণ আমরা জানতাম, আমরা 'শ্রমিক শ্রেণীর পার্টি, বিপ্লবী পার্টি।' অথচ আমরা দেখতাম আমাদের গল্পে, কাব্যে, সাহিত্যে, গানে, চিত্রে, কাল্‌চারের নানা কথায়

যা চলেছে তাতে সত্যই বিপ্লবের বড় কিছু নেই। গরম গরম কথা থাকতে পারে, কিন্তু আসলে বিপ্লবী চিন্তা নেই এসব গানে, কবিতায়, গল্পে, নাচে, নাটকে। শ্রমিক শ্রেণীর আশা আকাঙ্ক্ষার কথা তো নেই-ই, তাদের অস্তিত্বের কথাও প্রায় নেই। আছে মধ্যবিত্ত ও বড় লোকদের মন ভাঙ্গাভাঙ্গি আর মান নিয়ে কান্নাকাটির কথা। এসব কারণে আমরাও তখন (১৯৪০ পর্যন্ত) ভাবতাম কালচার একটা সৌখীন ব্যাপার।

তবু আমাদের কমিউনিস্টদের মধ্যে কালচার সম্বন্ধে ততটা বিরুদ্ধ মনোভাব দেখা দেয়নি। আমাদের ঐতিহাসিক বোধ স্পষ্ট বলেই তা হয়েছে। কিন্তু কালচার বা সংস্কৃতির আসল মানে তাই বলে আমরা সকলে ঠিক মত বুঝেছি, এবং বুঝে তা গ্রহণ করেছি,—এ কথা এখনো বলা চলে না। পার্টির যাঁরা নেতা তাঁরা এসব দিকে খুব মনোযোগ দেওয়ায় কমিউনিস্ট কর্মী ও মতবাদীদের কালচারের উপর শ্রদ্ধা বেড়েছে। তা ছাড়াও কয়েকটা বড় বড় জিনিস থেকে সবাই আমরা বুঝছি—কমিউনিস্টগণ তাদের সংস্কৃতি বাহিনী ও কালচার মূলক প্রয়াসের দ্বারা এদেশেও কতকটা শক্তিশালী হয়েছে। যেমন, আমাদের সামান্য স্কোয়াড গানে, নাচে, অভিনয়ে, চিত্রে পাঞ্জাব থেকে হাজার হাজার টাকা বাঙলার দুর্ভিক্ষ সাহায্যে তুলে আনল। তাতে পিপলস্ রিলিফ কমিটির কাজের খুব সুবিধা হল। দ্বিতীয়ত দেখছি—আমরা হাজার চেঁচিয়ে আর কাগজ ছড়িয়ে যা বুঝাতে চেষ্টা করি আমাদের সামান্য নাচ, গান, অভিনয়, ছবি তা সাধারণ মানুষকে কত সহজে বুঝিয়ে দেয়। পাঞ্জাবে তারও প্রমাণ পেয়েছি। বেজওয়াদা কৃষক সম্মেলনে রাত্রি সাড়ে তিনটায় যখন কমরেড উষার 'ম্যায় ভূখা হুঁ' নৃত্য শেষ হল তখন সেই ষাট-পঁচাত্তর হাজার নরনারীর দেখেছি বাঙলাকে বাঁচাবার জন্য আন্তরিক ইচ্ছা। তৃতীয়ত দেখছি, এই সব সংস্কৃতি মূলক চেষ্টার মধ্য দিয়ে জ্ঞানী এবং গুণীদেরও আমরা আমাদের পার্টি সম্বন্ধে খানিকটা শ্রদ্ধান্বিত করতে পেরেছি। বোম্বাই-এ আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্কৃতির (স্কোয়াড) গোষ্ঠীর অভিনয় দেখে সেখানকার শিল্পীরা আকৃষ্ট হন, সেখানকার বিত্তবানদের মধ্যেও শ্রদ্ধা জাগে, কংগ্রেস নেতারাও আমাদের সম্বন্ধে আশ্বস্ত বোধ করেন। কলকাতায় ও বাঙলার অন্যান্য জায়গায় যেখানে আমরা সত্যি আমাদের প্রয়াস ফুটাতে পেরেছি, সেখানেও দেখেছি জ্ঞানী ও গুণীরা আমাদের সমাদর করেছেন। তাই দেখছি পার্টির সংস্কৃতিমূলক আন্দোলনে দুর্ভিক্ষে সাহায্য আসছে, সাধারণ লোকে আকৃষ্ট হচ্ছেন, জ্ঞানীগুণীরা আকৃষ্ট হচ্ছেন, গণস্বার্থের শত্রুরাও বাধাপ্রাপ্ত

হচ্ছে, এবং এ সবের সূত্রে কমিউনিস্ট মতে আবার নূতন নূতন শিল্পীরাও আসছেন, আর সাধারণ মানুষও আসছেন।

এ হল নগদ হিসাবের দিকে কিন্তু আসলে লাভ আরও বড়। সে লাভ এই : প্রথম কথা, আমাদের কৃতিত্ব দেখে সমাজের বুদ্ধিজীবীর দল বুঝতে পারছেন, তাই তো কমিউনিস্টরা যে শিল্প সাহিত্যের ক্ষেত্রেও কৃতিত্ব দেখাচ্ছে। তাতে করে এ সব গুণী লোকদের শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে যে সব পুরনো ধারণা ছিল তা ভাঙ্গতে শুরু করছে। আবার কমিউনিজম্ সম্পর্কে ভুল ধারণা বদলে যাচ্ছে। অন্যদিকে ধনীদের সঙ্গে এই গুণী ও জ্ঞানীদের মানসিক তফাৎ বাড়ছে—গুণীজ্ঞানীরা ক্রমেই কমিউনিস্ট মতের নিকটবর্তী হচ্ছেন। দ্বিতীয় কথা : আমাদের সংস্কৃতি উৎসব দেখে শ্রমজীবী ও কৃষকেরা বুঝছে, তাইতো, আমাদের জনশিল্পের নিদর্শনগুলো তো বাজে নয়। আর, তার থেকেও সত্য কথা আমরা দেখ্‌ছি আমাদের শ্রমিক কৃষকেরও শিল্পশক্তি বাড়ছে, যদি তারা চর্চা করে তা ক্রমেই ফুটে উঠবে। অর্থাৎ Culture for the people, of the people, by the people-এরও চেতনা আস্‌ছে।

এইটিই কমিউনিস্ট কর্মীদের পক্ষে আসল কথা। আমরা তো জানি সভ্যতা আজ বানচাল হয়ে পড়েছে। তার হাল ধরে রাখতে পারবে ধনিকদের এমন শক্তি নেই। সেই হাল তাই এ-যুগের শক্তিধরদের হাতে তুলে দেওয়া দরকার। সেই শক্তিধর আজ কারা? আমরা তো জানি, সমাজে শক্তি তারাই যারা উৎপাদক, স্রষ্টা। এ যুগে এই উৎপাদনের শক্তি, সৃষ্টিশক্তি শ্রমিকদের হাতে, কারুবিদদের হাতে, শিল্পীদের হাতে। আর সেই সৃষ্টিশক্তিকেই মূলত চাপা দিতে চায় শাসকশ্রেণী ও শোষকশ্রেণী ; কারণ তা নইলে তাদের কায়েমী স্বার্থ টিকে থাক্‌বে না। যারা শাসক ও শোষক তারা এভাবে সভ্যতাকে বাধা দিতে চায়, নতুন সৃষ্টিশক্তিকে দাবিয়ে রাখতে চায় ; আর শ্রমিক ও কৃষক নতুন উৎপাদন শক্তির ও সৃষ্টিশক্তির অধিকারী, তারা চায় সভ্যতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে, নতুন সৃষ্টিতে সভ্যতাকে বাড়িয়ে তুল্‌তে। এ যুগের আসল স্রষ্টা তাই শ্রমিক ও কৃষক। সভ্যতাকে বাঁচাবার ভার আজ তাই ধনিকশ্রেণীর নয় ; আজ তা শ্রমিকশ্রেণীর উপর। তার অর্থ এই, **সমস্ত সভ্যতার উত্তরাধিকারও তার, দায়িত্ব তার।** বাস্তবক্ষেত্রে এই দায়িত্ব সে গ্রহণ করছে,—সে ফসল ফলায়, সে-ই পণ্য উৎপাদন করে ;—মুনাফার লোভে অন্য শ্রেণীরা তাতে বাধা জোগায়। মনের ক্ষেত্রেও এই দায়িত্ব শ্রমিক শ্রেণীর

স্বীকার করতে হবে; কিন্তু সেখানে শোষকশ্রেণী তাকে আরও বেশি বাধা দিতে চায়।

কারণ, যতই শোষকেরা দেখে বাস্তবক্ষেত্রে তারা হটে যাচ্ছে, ততই তারা ভাবে মানসক্ষেত্রে, নানা ধোঁয়ার জাল সৃষ্টি করে, নিজেদের আসন সেখানে পাকা করা চাই। তা পাকা করে রাখতে হলে প্রথমত সেখান থেকে শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নামে শ্রমিকশ্রেণীকে আক্রমণ করা যাবে,—আর এই ধোঁয়ায় অচেতন শিল্পী ও লেখকদের ছলনা করা সহজ। আর জ্ঞানী গুণীদের মারফৎ ধনিকতন্ত্রের এই আক্রমণ সভ্যতার ভবিষ্যতের পক্ষে সবচেয়ে মারাত্মক আক্রমণ।

দ্বিতীয়ত, শোষকশ্রেণী চায় সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তারা যে শোষণ চালায় তা অব্যাহত রাখতে। কারণ সংস্কৃতিও তাদের একটা মুনাফার পণ্য। তারা সংবাদপত্র, মুদ্রাযন্ত্র, নাট্যশালা, সিনেমা, চিত্র, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, সব শিল্পই মুনাফার বাজার হিসাবে চালায়। এইখানেই তাদের জোর। এই জোরে তারা টাকাকড়ি, মান-সম্ভ্রম, আরাম আয়েস দিয়ে লেখক ও শিল্পীদের হাত করে।

কিন্তু আসলে এইখানেই তাদের আসল দুর্বলতাও। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ধনিকেরা উৎপাদন করে না, তারা করে ব্যবসাদারি। বাস্তবক্ষেত্রে যেমন তারা উৎপাদকদের বঞ্চিত করে মুনাফা করে, সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তেমনি তারা শিল্পী ও লেখক প্রভৃতিদের বঞ্চিত করে মুনাফা তোলে। ধনিকরা হচ্ছে আসলে শিল্পী ও লেখকদেরও শ্রেণী-শত্রু। কাজেই মূলত শিল্পী ও লেখকদের সঙ্গে শ্রমিকদের ও কৃষকদের বন্ধুত্বই থাকা উচিত। আর এই বন্ধুত্ব এ-যুগে হচ্ছে স্বাভাবিক ও অনিবার্য। কারণ কাল্‌চারের আসল উত্তরাধিকারী আজ শ্রমিক কৃষক তা আমরা জেনেছি; সভ্যতার ক্ষেত্রে আজ তারাই স্রষ্টা। তাছাড়া, একটা বড় কথা হচ্ছে এই যে, সংস্কৃতি ধনিকদের মনোপলি হয়ে থাকার জন্য কৃষক, শ্রমিক ও জনসাধারণকে এতকাল ধরে মানব-সভ্যতার শিল্প-সংস্কৃতি থেকে তফাৎ করে রাখা হয়েছিল। ফলে জনগণের সৃজনী শক্তি অনেকাংশে চিরসুপ্তই থেকে গেছে। আজ বর্তমান যুগের শিল্পীদের সঙ্গে তা যোগ হলে সেই বিরাট সৃজনীশক্তি জাগরূক হতে মোটেই দেরী হবে না।

কিন্তু এই মূল সত্যটা, যারা সচেতন নয় তারা বুঝতে পারে না। আমরা কমিউনিস্টরা সর্বাধিক সচেতন কর্মী। আমরা এই মূল সত্য জানি—আমরা সকলকে প্রমাণ করাব তার সত্যতা।

কিন্তু এদিকেও আমাদের কয়েকটি কথা বুঝবার আছে। আমরা সচেতন হয়েছি বলেই আমরা শিল্পী হয়ে উঠেছি তা মনে করা হবে হাস্যকর। আমরা তো দেখেছি শোষক শ্রেণীকে বিপ্লবের দ্বারা পরাজিত করলেও তখন তখনি কমিউনিজম্ গড়ে ফেলা যায় না। "অক্টোবর বিপ্লবের" পরেও সোশ্যালিজম্ গড়তে সোভিয়েট দেশে প্রায় সতের আঠার বছর লেগেছে ; আসল কমিউনিজম্ তারা গড়ে তুলছে এখন। তাই রাতারাতি কোনো দেশ যেমন কমিউনিস্ট হতে পারে না, রাতারাতি কোনো দেশ তেমনি কমিউনিস্ট কালচার বা নতুন সভ্যতাও গড়ে ফেল্‌তে পারে না। এজন্য পরীক্ষা আর প্রাণপণ প্রচেষ্টা করতে হয় দিনের পর দিন, কিন্তু সে প্রয়াস সচেতন ভাবে আরম্ভ করতে হবে শ্রমিক পার্টিকে এখনি। যেমন বিপ্লব গড়তে চেষ্টা করছি তেমনি সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা করতে হবে বিপ্লবী সংস্কৃতি গড়তে। এই হবে প্রথম কথা।

দ্বিতীয় কথা এই, বিপ্লব সার্থক হলেও যেমন আমরা কল-কারখানা ভেঙ্গে ফেলব না, মুনাফাবাদই শেষ করব, আর ধনিকতন্ত্রের উৎপাদন-যন্ত্রগুলো আরও ভালো করে কাজে লাগাব, ঠিক সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও আমরা তেমনি এইরূপ নীতিতেই চল্‌ব। উন্নত এবং সার্থক অনেক "টেকনিক" শিল্পী ও লেখকরা এখন যা আয়ত্ত করছেন আমরা তা নষ্ট করব না ; বরং তার আরও সার্থক প্রয়োগ করব, তার কার্যকারিতা এই সব গুণী ও জ্ঞানীদের থেকে শিখে নেব আরও বাড়িয়ে তুলব। যখন নতুন সংস্কৃতি গড়তে চাই তখন আমাদের কাজ হবে তাহলে এরূপ :—

শিল্পী ও লেখকদের পৃথিবীর বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হতে সাহায্য করা। সচেতন হলে সেই জীবন-সত্য কি ভাবে শিল্পে-সাহিত্যে রূপ দিতে হবে, তা তাঁরা নিজেরাই ভালো জানেন। আমরা শুধু শিল্পী ও লেখকদের জোগাব সত্য—তা হলেই হবে।

আবার আমাদের মধ্যে যে-সব লোকের শিল্পশক্তি বা সৃষ্টিশক্তি আছে তাদের দরকার হবে এই অভিজ্ঞ শিল্পী ও লেখকদের কাছে শিক্ষানবিশী করা। শিল্পীদের ও লেখকদের থেকে সংস্কৃতি পদ্ধতি আমাদের বুঝে নিতে হবে, তারপর তা আবার লাগাতে শিখতে হবে নতুন সৃষ্টিতে।

তাই কমিউনিস্ট কর্মীর পক্ষে দরকার—(১) বর্তমান সভ্যতায় তার দায়িত্ব বুঝা ও স্বীকার করা ; (২) নিজেকে নতুন সংস্কৃতি গড়বার অধিকারী জেনে নিজের উপর শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস নিয়ে সৃষ্টি কর্মে এগিয়ে চলা ; (৩) আবার বর্তমান

সভ্যতায় জ্ঞানী ও গুণীদের সঙ্গে নিজেদের স্বার্থের একতা বুঝা; এবং (৪) জ্ঞানী ও গুণীদের উপর শ্রদ্ধা নিয়ে এগিয়ে যাওয়া—তাঁদের জানাতে বাস্তব সত্য, তাঁদের থেকে গ্রহণ করতে সংস্কৃতি কর্মে তাঁদের শিক্ষা ও তাঁদের উপদেশ, তাঁদের সাহায্য।

এই হল আমাদের সংস্কৃতি সম্বন্ধে মূল দৃষ্টিভঙ্গি। আমরা কমিউনিস্টরা কালচারকে কি চোখে দেখব তার মূল কথা। তারপর বাস্তব কর্মী হিসাবে আমরা বাঙলাদেশের কমিউনিস্টরা বুঝে নেব আমাদের নিজেদের কালচারাল সঙ্কট বা সংস্কৃতি সঙ্কট কি :—আমরা বাঙালীরা বাঙলায় দুটো পৃথক কালচারের দ্বন্দ্ব দেখছি। আমাদের শিক্ষিতদের একটা কাল্‌চার—রামমোহন রায়ের থেকে তা শুরু হয়, রবীন্দ্রনাথে যার চরম স্ফুরণ আমরা দেখি। আর একটা অশিক্ষিত জন-সাধারণের কালচার—যা গ্রামে বারাবর চলেছিল, এখনো চলে,—তাদের ভাটিয়ালী পল্লীগীতি, জারিগান, সারিগান, কীর্তন, ঘেটু, যাত্রা, কথকতা, ভাসান, পট, পাটা নানারকম আলপনা, ছবি আঁকা, ইত্যাদি। শিক্ষিত সংস্কৃতি—চাক্‌রে কালচার বা বাবু কালচার, শহুরে কালচার। আর অশিক্ষিত সংস্কৃতি—জন-সংস্কৃতি বা লোক-সংস্কৃতি, তা চাষী-মাঝি প্রভৃতিদের জিনিস, গ্রাম তার প্রাণ। দুটোই কিন্তু এখন ক্ষীণ হয়ে পড়েছে ভদ্র-সংস্কৃতি বাড়তে পারছে না, তার প্রেরণা আসত বুর্জোয়া সৃষ্টি থেকে; কিন্তু আজ বুর্জোয়ার সে সৃষ্টি শক্তি কই? তাই ভদ্র-সংস্কৃতির দরকার এ-যুগের সৃষ্টিশালী শ্রমিক মজুরের সঙ্গে প্রাণের মনের কর্মের যোগ-সাধন। অন্য দিকে আমাদের লোক-সংস্কৃতিও বাড়তে পারছে না—লোকে সেই জারিগানে আর তত খুশি হয় না—ভিড় করে আসে থিয়েটারে, সিনেমায়। এই লোক-সংস্কৃতি বাঁচতে পারে যদি তা নতুন সভ্যতার সত্যকে গ্রহণ করতে পারে, আবার নতুন কালের উপযুক্ত রূপ আয়ত্ত করতে পারে, আর পুরনো পদ্ধতিকে আবার এ-কালের উপযোগী করে দিতে পারে।

এইটাই হল বাঙলার নিজ কালচারাল সমস্যা—ভদ্র-সংস্কৃতিকে বিচ্ছিন্ন না রেখে জনতার সঙ্গে যুক্ত করা, আর জন-সংস্কৃতিকে উন্নততর কালের সত্যে ও ভঙ্গিতে সমৃদ্ধ করা। ভদ্র-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে লোক-সংস্কৃতির বিষয়বস্তু দিয়ে, আর তার প্রকাশকে করতে হবে সহজ ও লোকবোধ্য। আর জন-সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে নতুন বিষয়বস্তু দিয়ে আর তার প্রকাশকে করতে হবে আরো উন্নত বিকশিত। দুই সংস্কৃতিতে স্থাপন করতে হবে সমন্বয়।

এ-কাজ বড়দরের শিল্পীর কাজ। কিন্তু ছোটদরের শিল্পীরা তার জন্য পথ

তৈয়ার না করলে সেই বড়দরের শিল্পী জন্মাবার পথও পাবেন না। তাই বাঙলাদেশের কমিউনিস্ট কর্মীর কাজ হল এই পথ তৈরী করা, কোদাল কুপানো, মাটি কাটা, মাটি টানা,—বাঙলার জন-জীবনকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা, গুণী-জীবনকে সচেতন করা। আর এজন্য চাই কমিউনিস্ট কর্মীর তরফ থেকে কালচারাল স্কোয়াড এবং প্রত্যেক খানে সত্যিকারের উপযুক্ত কর্মীদের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে সে-কাজে নিযুক্ত করা।

এজন্যই বলতে হয় এই যে, কালচারের মানে কি, সে দিকে কমিউনিজমের কি ভূমিকা এবং কমিউনিস্ট পার্টির দায়িত্ব কতটা; বাঙলা দেশে কালচারাল সঙ্কটের স্বরূপ কি, তা কতটা জটিল, কতটা জরুরী—এসব কথা বুঝা দরকার। এসব কথা বুঝি না বলেই আমরা কর্মীরা নানাপ্রকার ওজর আপত্তি তুলে কালচারাল ক্ষেত্রের কাজকে উপেক্ষা করি।

আর এসব কারণেই দেখি—আমাদের যে সব শিল্প বা সাহিত্য আমরা কমিউনিস্ট সৃষ্টি করছি তা প্রায়ই নিষ্প্রাণ হয়। কমিউনিস্টরা সংস্কৃতিকে একটা বিশেষ শ্রেণীর শোষণ ও বন্ধন থেকে পরিপূর্ণ ভাবে মুক্ত করতে চায়। জনগণের স্বাভাবিক বাস্তব সৃজনী শক্তির বিশাল দুয়ার একেবারে খুলে দিতে হবে। আমাদের কাজ হল—শিল্পী ও সাহিত্যিককে তথ্য জোগানো; শিল্পী ও সাহিত্যিকই ভালো জানেন কি করে সে তথ্যকে শিল্পে রূপ দিতে হবে। তথ্যের তাগিদেই তাঁর মনে শিল্প রূপ গ্রহণ করবে শিল্পের নিয়মে।

তা করা হয় না বলেই আমরা মজুতদার নিয়ে, দুঃস্থ নিয়ে, পঞ্চমবাহিনী নিয়ে বা দেশপ্রেমিক নিয়ে যে শিল্প রচনা করি তা সবই একটা abstract বা গত-বাঁধা মজুতদার, গত-বাঁধা দুস্থ, গত-বাঁধা পঞ্চমবাহিনী ও গত-বাঁধা দেশপ্রেমিক হিসাবে আঁকি। তাদের কথাবার্তা, চাল-চলন, পোশাক, এমন কি আকৃতি পর্যন্ত যে বাঁধাধরা গতে চলে তাতে একজনকেও মানুষ বলে সত্য বলে চোখে ঠেকে না। কিন্তু শিল্প মানে কোনো নীতি, বা আইডিয়া বা শ্লোগান আওড়ানো নয়। শিল্পীর কাজ হল বাস্তব (concrete) নিয়ে—মানুষ নিয়ে। সে মানুষ নানাসূত্রে বাঁধা, তার 'মানুষত্ব' জটিল বিচিত্র, ভালোবাসায় দেশভক্তিতে লোভে ভয়ে সব জড়িয়ে সে এক একটি বিশেষ মানব—(individual)। তাই আমাদের শিল্পীরা এই পার্টি শ্লোগান বলবার ঝোঁকে শিল্পের উদ্দেশ্য ভুলে যান, মানে রূপ-সৃষ্টি করতেই ভুলে যান। তাঁদের গান, ছবি, নাটক, কবিতা তাই অনেক সময় হয় নিষ্প্রাণ, হাস্যকর। অথচ কমিউনিজম্-এ জ্ঞান থাকলে এ ভুল ঘটতেই পারে না।

কমিউনিজম-এ জ্ঞান থাকলে শিল্পের মূল সত্য অনুধাবণে আরও অনেক বেশি সাহায্য হয়। *

* এ লেখাটি (অক্টোবর ১৯৪৪-এ) কমিউনিস্ট কর্মীদের উদ্দেশ্যে লিখিত। কিন্তু ১৯৪৭ সালেও 'কালচার ও কমিউনিজম্' সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন শুন্‌তে হয় বলে এখানে সন্নিবিষ্ট হল। এখানে এ প্রসঙ্গে যা উল্লেখ যোগ্য তা এই যে, এ প্রবন্ধ রচনার পরে কয়েটি বড় ঘটনা এদিকে ঘটেছে : (১) বাঙলা ও ভারতে গণনাট্য সঙ্ঘের জন্মে গণনাট্য ও গণনৃত্য প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গণ-সংস্কৃতির প্রথম সূচনা হয়েছে। (২) কংগ্রেস কর্মীদের তরফ থেকেও কালচারের প্রতি (অনেকখানি কমিউনিস্ট প্রচেষ্টার প্রতিবাদে) দৃষ্টি পড়েছে। (৩) যুদ্ধান্তে সমস্ত পৃথিবীর কমিউনিস্ট সমাজে 'কালচার ও কমিউনিজম্' সম্বন্ধে গবেষণা আলোচনা চলেছে। তার এক পীঠস্থান মস্কো—যেখানে ঝাদানোভের নেতৃত্বে রুশ সাহিত্য আত্ম সমালোচনা করছে। অন্য পীঠস্থান প্যারিস ;—সেখানেই পিকাসোকে উপলক্ষ্য করে কমিউনিস্ট নেতা গারদি ও এর্ভে এবং কমিউনিস্ট কবি আরাগোঁর মধ্যে চলেছে সৌন্দর্য-তত্ত্ব ও কমিউনিজমের সংবন্ধ বিচার। সে বিচার শেষ হতে দেরি আছে। কিন্তু পিকাসো, মাতিস, জুলি ও কুরি, লাজেভা ড্রেসার প্রমুখ শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকদের কমিউনিস্ট দলে যোগদানে বোঝা যায় কমিউনিজমের হাতেই যে কালচারের মুক্তি এ সত্য ক্রমশ স্পস্ট হয়ে আসছে। ২৫।৩।৪৭

বাঙালী সংস্কৃতির চলতি হিসাব

"এখন এক পণ্ডিত এসে জুটে গেলেন—চাকরি চাই। আমি বল্‌লুম, 'বেশ লেগে যান, রোজ আমাদের মহাভারত-রামায়ণ পড়ে শোনাবেন।' আমাদের বাল্যকালের পণ্ডিত মশায়, নাম রজনী পণ্ডিত, সেই পণ্ডিত রোজ এসে রামায়ণ মহাভারত শোনাতেন। আর তাই থেকে ছবি আঁকতুম।

" 'নন্দলাল বল্‌লে, কি আঁকব?' আমি বললুম্, 'আঁকো কর্ণের সূর্য স্তব।' ও-বিষয়টা আমি চেষ্টা করেছিলুম, ঠিক হয়নি। নন্দলাল এঁকে নিয়ে এল। আমি তার ওপর দু'তিনটে ওয়াশ দিয়ে দিলুম ছেড়ে—হাতে ধরে দেখিয়ে আমি কখনও ওকে শেখাইনি। ছবি করে নিয়ে আস্‌ত, আমি শুধু কয়েকটি ওয়াশ দিয়ে মোলায়েম করে দিতুম, কিংবা একটু আধটু রঙের টাচ্‌ করে দিতুম, যেমন ফুলের উপর সূর্যের আলো বুলিয়ে দেওয়া—সূর্য নয় ঠিক, আমি তো আর রবি নই, নানা রঙের মাটির প্রলেপ দিতেম। তখন আমাদের আঁকার কাজ তেজে চলেছে। নন্দলাল সূর্যের স্তব আঁকল তো সুরেন্‌ এদিকে রামচন্দ্রের সমুদ্র-শাসন আঁকল, এই তীর ধনুক বাঁকিয়ে রামচন্দ্র উঠে রুখে দাঁড়িয়েছেন। নন্দলাল এঁকে আন্‌ল একটি মেয়ের ছবি, বেশ গড়নপিটন, টানা টানা চোখ ভুরু। আমি বল্‌লুম, 'এ তো কৈকেয়ী, পিছনে মন্থরা বুড়ি এঁকে দাও।' হয়ে গেল কৈকেয়ী ও মন্থরা। ছবির পর ছবি বের হতে লাগ্‌ল। চার দিকে তখন খুব সাড়া পড়ে গেল, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। ইণ্ডিয়ান্‌ আর্ট শব্দ অভিধান ছেড়ে সেই প্রথম লোকের মুখে ফুট্‌ল!"

---

* শিল্পকথা, শ্রীনন্দলাল বসু (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী) নিরীক্ষা, নন্দলাল সংখ্যা।

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হল, কিন্তু সমস্ত 'জোড়া সাঁকোর ধারে' (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর—রানী চন্দ) উদ্ধৃত করবার লোভ হবে তাঁরই যিনি অবনীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব কাহিনী পড়েছেন। এখানে তার একটি আশ্চর্য অধ্যায়ের কথাই উদ্ধৃত হয়েছে—ইণ্ডিয়ান আর্টের আবির্ভাবের কথা; তাও উদ্ধৃত হয়েছে তার শ্রেষ্ঠ কৃতীর আবির্ভাবের কথা বলে। বাঙলা দেশের ইতিহাসে সে এক শুভ মুহূর্ত—যখন অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে পেলেন। তারপর বছর ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ হয়ে গেছে, ভারতীয় শিল্পের বয়সও চল্লিশ হতে যাচ্ছে—আজ তার পরিচয়ের জন্য অভিধান খুঁজতে হয় না, আমাদের মত সাধারণের কাছেও তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। আমরা জানি, বর্তমান পৃথিবীর শিল্প-জগতে যাঁরা ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য এঁরা দু'জন—অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল।

কিন্তু আমাদের চোখে ও বিবেচনায় সাধারণত 'নব্য ভারতীয় শিল্পকে' আমরা কি বলে জানি? অনেকেই তা জানি এই বলে যে, একটা বিশেষ ভঙ্গীর তা পুনরাবৃত্তি। তার সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক দেহরূপের মিল বড় নেই,—আঙুল হবে সরু সরু, হাত-পা হবে লম্বা-লম্বা, চোখগুলো হবে টানা-টানা। দ্বিতীয়ত, এ শিল্পের বিষয় হবে রোমাণ্টিক—মানে পৌরাণিক কিংবা পুরাতন; নইলে এ কালের যে জীবন-যাত্রা অপরিচিত;—ঠাকুর-দেবতা, বৌদ্ধ কাহিনী, মোগল রাজপুতের জীবন আর শেষে সাঁওতাল কি পাহাড়ী মেয়ে-পুরুষ এই শিল্পের বিষয়। এ অবশ্য অত্যন্ত স্থূল ধারণা, আর অত্যন্ত ভুল ধারণা;—সাধারণ লোকের ধারণা সেরূপ হওয়া আশ্চর্য নয়। বুঝে-না-বুঝে 'নব্য ভারতীয় শিল্পকে' এই বলেই আমরা ধরে নিই। কিন্তু কেন? এরূপ ধারণা যে জন্মাল তারও কারণ আছে। একটা কারণ বোধ হয় এই যে, প্রাণ দিয়ে এক দিন যে-সত্যকে আবিষ্কার করা হয় আর দিন পুনরাবৃত্তির ঝোঁকে তার প্রাণ হারিয়ে ফেলা হয়। সত্যের তখন খোলসটা থাকে; তা দিয়েই তার রূপ আমরা চিনি, আর মনে করি—সেই সত্যকে চিন্‌লাম, বুঝলাম, পেলাম। চল্লিশ বছর হয়নি, তবু মনে হয় ভারতীয় শিল্পের ভাগ্যে এমনি দুর্দশা ঘটছে—পদ্ধতি দিয়েই তার পরিচয় ও বিচার সাধারণত শেষ হয়।

কিন্তু কি সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তার প্রথম স্রষ্টারা? অবনীন্দ্রনাথ সে সত্য বলেছেন অনেকবার, বলেছেন তাঁর আবিষ্কারের কাহিনীও। তাঁরই কথায় আবার আমরা তা শুনি নতুন করে: "পুরাতন ছবিতে (আর্ট স্কুলের আর্ট গ্যালারির মোগল-পার্শিয়ান ছবি) দেখ্‌লুম ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে

সোনা রূপো সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা, তা হচ্ছে ভাব। সবই দিয়েছে ঐশ্বর্য ভরে, কোথাও কোনো কার্পণ্য নেই; কিন্তু ভাব দিতে পারেনি। মানুষ আঁকতে সবই যেন সাজিয়ে গুজিয়ে পুতুল বসিয়ে রেখেছে। আমি দেখলুম, এই বারে আমার পালা। ঐশ্বর্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জান্‌তুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে।

বাড়ি এসে বসে গেলুম ছবি আঁক্‌তে। আঁকলুম "সাজাহানের মৃত্যু।"

নন্দলালের শিল্পেরও যে এই মন্ত্রেরই বোধন চলেছে, তা অনুমান করতে পারি। কিন্তু তাঁর নিজের সাক্ষ্য কি?—তা জানা ছিল কঠিন। তিনি লিখতে এবং বল্‌তে বরাবরই কুণ্ঠিত। এবার "শিল্পকথায়" শিল্পী নন্দলালের সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি—কখনো যা তিনি মুখে বলেছেন, কখনো বা তিনি লিখে দিয়েছেন,—'বিশ্বভারতী' আমাদের পক্ষে সহজলভ্য করেছেন। অনেক কথাই মনে হয় সংক্ষিপ্ত যেন এ্যাফোরিজম্ সেরূপ কথা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা শক্ত হয়, তাদের ভুল বুঝ্‌বারও কারণ থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে অধিকাংশ কথাই সাধারণ লোকদেরই শিল্পী বলেছেন, কিংবা বলেছেন তাঁর শিল্প শিক্ষার্থীদের। তাতেই আমরা সাধারণ লোকেরাও এসব কথা থেকে নিজেদের শিক্ষার বেশ উপকরণ পাই, আর নিজেদের স্থূল ও ভুল ধারণাগুলোকে শুধ্‌রাবার সুযোগ পাই। কি শিল্প সম্বন্ধে কি নব্য ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে—আমাদের দৃষ্টি তাতে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। নন্দলালবাবুর কথাকে উদ্ধৃত করতে গেলে খণ্ডিত করা হতে পারে। জ্ঞানত তা না করে তবু দু'একটি বিষয়ে তাঁর কথা এখানে উদ্ধৃত করা যাক।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকে তিনি বলেছেন:

"সকল শিল্পের লক্ষ্য এক। কবিতা, মূর্তি, চিত্র, গান সবই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে ধরতে চায়। সে হিসাবে যোগসাধনার সঙ্গে শিল্প-সাধনার মিল আছে। আধ্যাত্ম-সাধনায় সৃষ্টির সমুদয় বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্য সন্ধান করা হয়—একের সন্ধান করা হয় যাকে জান্‌লে সব কিছুকেই জানা যায়। শিল্পও ঠিক ঐ ভাবেই বিরাট একের সন্দর্শন-মানসে চলেছে। এক চীনা আর্টিস্ট বলেছেন, 'দেবতার মূর্তি আর দুর্বার অঙ্কুর, যথার্থ আর্টিস্টের নিকট দুইয়ের একই মূল্য; একই রসপ্রেরণা জাগাবার শক্তি দুজনে ধরে।' এতেই বোঝা যায়, শিল্পীর পক্ষে একের ধারণা করা কতখানি সম্ভব। অবশ্য দেবমূর্তির প্রতি অশ্রদ্ধার কোনো কথা হচ্ছে না, কেবল দুর্বার অঙ্কুরের প্রতিও সমান শ্রদ্ধা প্রয়োজন।"

নন্দলালের দৃষ্টিতে শিল্প এমনি একটা সাধনার পথ—রূপের মধ্য দিয়ে ভাবের উপলব্ধি। কিন্তু রূপই তারও আশ্রয়। সম্পর্কটা তিনি স্পষ্ট করেছেন বোধ হয় এই লেখায়ঃ "শিল্পী বস্তুকে গুণ সহিত দেখেন। সাধারণে বস্তুর রূপ উদাসীন অন্যমনস্ক মন দিয়ে দেখে, কাজেই তার গুণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয় না—রূপে রূপে প্রভেদটুকু মাত্র দেখে, অথবা রূপ-গুণের সম্বন্ধটি ঠিক না জানায় কখনো স্থূল রূপের প্রতি, কখনো বিচ্ছিন্ন গুণের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। শিল্পী জানেন, আসলে রূপে ও গুণে তফাৎ নেই, রূপের সবটাই গুণ এবং গুণের জন্যই রূপ। শিল্পীর পক্ষে বস্তুর কোনো একটি বিশেষ গুণে আকৃষ্ট হওয়াটাই প্রধান কথা। (একেবারে এক মুহূর্তে বস্তুর সব গুণের ধারণা কোনো মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়।) শিল্পীও প্রথমে বাহ্যিক রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হন, পরে গুণের ধারণা হয়। এই আকর্ষণের কারণ নির্দেশ করা যায় না, জনে জনে তা বিভিন্ন।"

"বাহ্যরূপ থেকে গুণে পৌঁছোন, গুণটি বুঝে যখন রূপে আবার ফিরে আসেন তখনই শিল্পের রূপ শিল্পীর চোখে নির্দিষ্ট ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিনিয়তই বাহ্যরূপের রূপান্তর হয়, কিন্তু একেবারে রূপছাড়া গুণের কোনো চিত্র বা মূর্তি হয় না। অবিচ্ছিন্ন (abstract) রূপের ধারণা বিচারবিশ্লেষণে কাজে লাগে, এবং ধ্যান—জ্ঞানের অধিগত হলে কাজেও বিশেষ দৃঢ়তা আনে। অনেক শিল্পী বিচ্ছিন্নগুণের সূক্ষ্ম বা অপরোক্ষ অনুভব থেকে (intuitively) বিশিষ্ট রূপ কল্পনা করেন; বিশেষ গুণের উপর ঝোঁক দেওয়াতে, না জানতেই, আপনা থেকেই রূপের বদল হয়ে যায়,—গড়নের মাপজোপে কম বেশি হয়"

'নব্য ভারতীয়' শিল্পের মূল ভাবাদর্শ নিয়ে অনেক বাগ্-বিস্তার হয়। সম্ভবত এখানে সে-আদর্শের কথাই তার সবচাইতে বেশি আধ্যাত্মবাদী শিল্পী বলেছেন। যা অপরোক্ষ অনুভব, কিংবা যে গুণ অবিচ্ছিন্ন, তা সাধারণের পক্ষে সহজ নয়, এমন কি শিল্পীর পক্ষেও সুলভ নয়। কিন্তু যা সত্য তা হচ্ছে এই যে, শিল্পীর জগৎ রূপের জগৎ; রূপ থেকেই তার যাত্রা, আর রূপেই আবার তাঁর সৃষ্টির প্রমাণ। অবশ্য রূপ মানে ফটোগ্রাফির রূপ নয়, তা বলাই বাহুল্য। রূপ সৃষ্টি মানে কোনো শিল্পী বল্‌বেন, আসলে বস্তুরই সত্যকে অধিগত করা, বাস্তবের মানেকে রূপের মধ্যে ধরে তোলা; আর কোনো শিল্পী বল্‌বেন,—রূপ সৃষ্টির মানে আসলে সত্যকেই

বস্তুর মধ্যে অধিগত করা, মানে, অরূপকে রূপের মধ্যে লীলায়িত করা। কারও মতে "গুণের জন্যই রূপ"; কারও মতে "রূপের জন্যই গুণ"; কারও মতে ভাব আগে, কারও মতে আগে বস্তু। কিন্তু যেখানে বোধ হয় মতভেদ নেই তা এই যে, রূপসৃষ্টিই আসল।

'নব্য ভারতীয় শিল্প' এই ভাববাদ থেকে যাত্রা শুরু করে পরম্পরার (tradition) খোঁজ করে—তার পিছনে ছিল আমাদের 'স্বদেশী'যুগের জাতীয় আত্ম-মর্যাদাবোধ আর ছিলেন হ্যাভেল, নিবেদিতা, ওকাকুরা প্রভৃতি বিদেশীয় মনস্বীরা। পরম্পরার সিঁড়ি বেয়ে সেদিনকার স্রষ্টারা একটা পদ্ধতিও নিজেদের বলে চিনে নেন। কিন্তু সেখানেই কি তাঁরা ঠেকে গেলেন? না তাঁদের মনে ছিল ওকাকুরার সমস্ত উপদেশই—nature, tradition, originality, এই তিন নিয়ে হয় সর্বাঙ্গসুন্দর আর্ট? তাঁরা জানতেন না, আধ্যাত্মিকতা আর পদ্ধতি নিয়ে ভারতশিল্পের চোরা-বাজারও আবার বস্‌বে। নন্দলাল বলছেন, "হিন্দু ঘরে জন্মে হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি। এককালে বিশেষ করে দেবদেবীর ছবিই এঁকেছি। [তারও সেদিনকার পরিবেশ আয়োজন অবনীন্দ্রনাথের কথায় আমরা পেয়েছি, লেখক।] এখন কিন্তু দেবতার ছবি যেমন আঁকি সাধরণের ছবিও এঁকে থাকি; উভয়েতেই আনন্দ পেতে যত্ন করি।"

শিল্পী নন্দলালের যে বিচিত্র বিকাশের কথা এখানে রয়েছে তার পরিচয় তাঁর সৃষ্টিতে। সেই পরিচয়ই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে 'নিরীক্ষার' 'নন্দলাল সংখ্যা।' এদিনে চিত্র ও প্রবন্ধ শুদ্ধ এমন সাময়িক পত্র বের হল তা এক বিস্ময়। কিন্তু না বের হলে বাঙালীর লজ্জা থাকত, তার শিল্পীর পরিচয় সে নিতে চায় না। 'নিরীক্ষায়' দেখি "যে নির্দিষ্ট অঙ্কন পদ্ধতিকে তিনি (নন্দলাল) স্বদেশী বলতে পারেন একমাত্র তাহাই সকল ভারতীয় শিল্পী আত্মসাৎ করুক ইহা তাঁহার দৃঢ় মত" (নিরীক্ষা, নন্দলাল সংখ্যা, দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী); "কিন্তু তিনি নব নব অভিযানে বাহির হইয়াছেন। তাঁহার নিকট সুন্দরের রূপ ফর্মায়-ফেলা কোন বিশেষ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ থাকে নাই।" 'পৌরাণিক' পর্ব কাটিয়ে নন্দলাল এসেছেন 'আধুনিক' পর্বে।" "এযুগ হল 'পরীক্ষার যুগ'"—"কোন শৈলীতে তিনি আবদ্ধ থাকিতে চাহেন না। তাঁর আধুনিক চিত্রে যে ফরাসী পোস্ট্‌ ইম্‌প্রেশ্যানিজম্‌-এর প্রভাব পড়িয়াছে, তাহাও লক্ষ্য করার বিষয়" (নিরীক্ষা,

ঐ, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত)। রাজপুত, মোগল, অজন্তা তাঁর প্রথম প্রেরণা জুগিয়েছে, প্রেরণা জুগিয়েছে তেমনি চীনা ও জাপানী চিত্রকলা। কিন্তু প্রেরণা জুগিয়েছে আবার বাঙলার লোকশিল্প—পট ও পুঁথির পাটা, পোড়ামাটির খোদাই, মাটির বাসনের রেখার ও তুলির কাজ; নানা দেশের লোকশিল্প মিশরীয়, আসীরিয়, গ্রীক, চীনা, বাইজেণ্টাইন, গথিক, প্রভৃতি নানা শিল্পকলা। বাধা তিনি পান না কোথাও—নাটকের মঞ্চসজ্জা, পোশাকের পরিকল্পনা, স্থাপত্য, অলঙ্করণ, এচিং, কাঠখোদাই, চামড়ার কাজ থেকে হরিপুরার কংগ্রেসের মণ্ডপ-মণ্ডন—আর দৈনন্দিন জীবনের সহজ রূপ—কুণ্ডলী-করা, কুকুর, পশু, ফল, গাছ, নর-নারী—সব তাঁর তুলি ও কলমের টানে যেন গীতি-কবিতার মত রূপ ধরে উঠ্ছে। আর এ সব দেখ্তে দেখ্তে বুঝি নব্য ভারতীয় শিল্পকলা কোন সত্য নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। তারপর যখন এ সব ছেড়ে আবার একালের নব্য ভারতশিল্প দেখি, তখন বুঝি কোন্ খেদে অবনীন্দ্রনাথ বলেন "আজকাল ভারতীয় শিল্প বলে যারা পরিচয় দেয় ভারতীয় তারা কোনখানটায়?" স্পর্ধা না শোনালে বল্তাম—তথাকথিত আধ্যাত্মিকতার চোরা-কারবারে শিল্পই বা আছে কতটুক?

অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

বুদ্ধিজীবীর পরীক্ষা

মহাযুদ্ধের এক প্রধান পর্ব শেষ হচ্ছে। এ পর্ব যুদ্ধের সামরিক পর্ব, আর সেই সামরিক আয়োজন প্রায় শেষ হতে চলেছে ইউরোপ ক্ষেত্রেই। সাধারণ ও অসাধারণ কেউ বর্তমান চমকপ্রদ ঘটনাবলীর সম্বন্ধে উদাসীন নেই। ইউরোপে ফ্যাশিস্টদের যুদ্ধশক্তি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের এই সামরিক পর্বকেই শেষ সত্য বলে মনে করব, এমন সমর-শাস্ত্রী আমরা নই। এ যুদ্ধ ইতিহাসের সভ্যতা সংকটের ফল, এবং যুদ্ধের মধ্য দিয়েই সেই সভ্যতা তার বৈপ্লবিক পরিণতির দিকেও অগ্রসর হতে চলেছে, আমাদের এইরূপই ধারণা। অবশ্য সেদিক থেকেও যুদ্ধের সামরিক পর্ব বিশেষ গুরুতর পর্ব। কিন্তু রণক্ষেত্রের পরাজয়েই সে বিকৃতির সম্পূর্ণ অবসান ঘটবে না, সমাজক্ষেত্রেও বিকৃতির পরাজয় ঘটলেই বিকৃতির অবসান ঘটবে।

ফ্যাশিজ্মের রণক্ষেত্রে পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা ও সংস্কৃতির

মুক্তিলাভের প্রথম সূচনা হয়। ইউরোপের রণক্ষেত্রে সামরিক জয় ঘটতে ঘটতেই আমরা দেখতে পাই—মানুষের জয়ও সেখানে শুরু হয়ে গিয়েছে। সে জয় সেখানেও সম্পূর্ণ হয়েছে তা বলছি না; কিন্তু শুরু হয়েছে। ফরাসী, ইতালীয়, ক্রোট, সার্ব, চেক্, পোল্ এমন কি গ্রীক প্রভৃতি ইউরোপের জাতিগুলোর হিসাব নিলেও দেখব, জনশক্তি আত্মপ্রতিষ্ঠ হতে চলেছে, শোষক দল পরাহত হচ্ছে। এসব থেকে এ যুদ্ধের স্বরূপ ও তার বৈপ্লবিক সম্ভাবনার কথাও আমরা বুঝতে পারি। সে সম্ভাবনা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কী রূপ গ্রহণ করে, সভ্যতার সদাজাগ্রত বাহকদের পক্ষে তাই হবে প্রতিটি পদক্ষেপে লক্ষণীয়। এশিয়ায় শোষিত জাতিগুলোর পক্ষে এই পর্ব আরও গুরুতর। কারণ এশিয়ার যুদ্ধের সামরিক পর্বও এখনো শেষ হয় নাই।

যুদ্ধের সশস্ত্র ও অ-শস্ত্র দুই পর্বেই এদিক থেকে হচ্ছে দেশ-বিদেশের কর্মরত বুদ্ধিজীবীদের পরীক্ষা। এ পর্যন্ত সে-পরীক্ষায় আমরা সব ক্ষেত্রে সুবুদ্ধির প্রমাণ দিয়েছি, তা বলতে পারলে খুশি হতাম।

কিসান ও শিল্পীর সম্মেলন

সারা-ভারত কিসান সভার বার্ষিক সম্মেলন এবার বাঙলাদেশে নেত্রকোনায় হয়েছিল। এ সম্মেলনের কিছুকিছু সংবাদ সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়েছে,—যদিও নানারূপ মতবিরোধের জন্য অধিকাংশ সংবাদপত্রই এত বড় সম্মেলনের যথোচিত বিবরণ প্রকাশ করেন নাই। প্রায় একলক্ষ লোক যে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে দেশের এই অবস্থায়ও সমবেত হয়, যেখানে গুর্খা, মারাঠী, দ্রাবিড়, পাঞ্জাবী, মণিপুরী, বর্মী—হিন্দু মুসলমান শিখ খ্রীষ্টান একত্রিত হয়, সে প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও তার গৃহীত প্রস্তাব ও আলাপ-আলোচনার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে না পারা বাঙলার সাংবাদিকদের পক্ষে প্রশংসার কথা নয়। বাঙলা দেশের হিন্দু মুসলমান হাজং মেয়ে পুরুষ কৃষকদের এই সমাবেশ দেখলে বুঝ্তে পারা যেত কৃষক সভা এই দুর্দশাগ্রস্ত প্রদেশের মানুষের মনে কি আলোড়ন এনেছে।

এই বিরাট সম্মেলনের নানাদিককার বৈশিষ্ট্য আমাদের পক্ষে এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। সম্ভব নয় বলেই যাঁদের পক্ষে তা সম্ভব ছিল সেই সাধারণ

সাংবাদিকদের কর্তব্যচ্যুতির কথা এত করে বল্‌তে হল। তাঁরা দেখতেন, কৃষকসম্মেলন শুধু একটা মামুলী সভা নয়, এদেশের পল্লী জীবন ও সংস্কৃতির এ একটি তীর্থস্বরূপ—এ যেন খাঁটি দেশী মেলা। সে হিসাবেই এ সম্মেলনের দু'একটি দিক উল্লেখযোগ্য : কলকাতায় এখন কলেরা চলেছে, বসন্তও শেষ হয় নাই ; পাঁচ সপ্তাহে ৯,০০০ নরনারী এখানে এই সব ব্যাধিতে মরেছে। মহামারীগ্রস্ত বাঙলায় নেত্রকোনার মত একটি দূর পাড়াগাঁয়ে লক্ষ লোকের সমাবেশ হল, তাই নানা ব্যাধি পীড়ার আশঙ্কা ছিল। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা মাসাধিক পূর্ব থেকে চারিদিকে স্বাস্থ্যনীতির প্রচার চালিয়ে সে এলেকাটি প্রস্তুত করেন। আর সম্মেলনের সময় থেকে প্রস্তুত থাকে তাঁদের হাসপাতাল, ডাক্তার, শুশ্রূষাকারীরা। তা ছাড়া প্রতিনিধিরাও গিয়েছিলেন সবাই কলেরা বসন্তের টাইফয়েডের টিকা নিয়ে। আমাদের বিশ্বাস, নেত্রকোনার উদ্যোক্তাদের এই সব নতুন শিক্ষা কন্‌গ্রেস-কন্‌ফারেন্সের ভবিষ্যৎ উদ্যোক্তাদের পক্ষে এখন থেকে সম্মেলনের অঙ্গ হিসাবে গ্রাহ্য হবে।

সম্মেলনের অন্য একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল, বাঙলার লোকশিল্পের প্রদর্শনী। এটি সত্যই দর্শনীয় হয়েছিল। তার একদিকে ছিল নানা তথ্য ও প্রাচীর-চিত্র দিয়ে কৃষক জীবন ও কৃষক আন্দোলনের ব্যাখ্যা অন্য দিকে ছিল হাতের কাজ, পল্লী শিল্প, আর দু'এর মধ্যখানে, সভাক্ষেত্রের তোরণের সম্মুখে ছিল মাটির তৈরী প্রকাণ্ড কৃষকমূর্তি। এটি কৃষ্ণনগরের এক তরুণ শিল্পী, লক্ষ্মী পালের কাজ। তাঁর 'মডেল' ছিলেন সভায় উপস্থিত, স্থানীয় টঙ্ক আন্দোলনের কৃষকনেতা হৃদয় সরকার। বিশেষ বীরত্বব্যঞ্জক এই মূর্তি। কৃষ্ণনগরের শিল্পীদের কৃতিত্ব আমরা জানি, কিন্তু কি করে তাঁদের এই নৈপুণ্য সত্য সত্যই রক্ষা পেতে পারে, নিজস্ব ধারায় আরও বিকাশ লাভ করতে পারে, সেই কথাই আমাদের ভাবা প্রয়োজন। তাদের মাটির কাজের কৃষক জীবনের চিত্রও এরূপই উল্লেখযোগ্য। যে সব জিনিসপত্র এসেছিল তার মধ্যে শান্তিনিকেতনের শিল্প ছাড়াও উল্লোখযোগ্য অনেক বস্তু ছিল, যেমন বস্ত্র, বাসনকোসন, তৈজসপত্র, নানা সূক্ষ্ম কাজ যা এখনো দেশ থেকে লোপ পায়নি। এমন কি এখানেই আমরা সত্যই দেখলাম বল্কলের বস্ত্র পর্যন্ত। এসব দেখলে এদেশের ব্যবহারিক লোক-কলার উপর শ্রদ্ধা জাগে—এখনো তো এসব বেঁচে আছে, লোক সমাজ তো এখনো দৃষ্টিশক্তি হারায়নি, সৃষ্টিশক্তি একেবারে খোয়ায়নি।

সম্মেলন থেকেই নানা প্রদেশের নাচ-গানের লোকশিল্পের এদিককার

নিদর্শনেরও আয়োজন ছিল। কিন্তু অন্ধ্রের ভালো শিল্পীরা দেশে রয়ে গিয়েছেন—গতবার তাঁদের নৃত্য ও অভিনয়ে বেজওয়াডায় আমারা মুগ্ধ হয়েছিলাম। এবারকার বাঙলার আয়োজনে ময়মনসিংহের নিবারণ পণ্ডিতের জারির দলই বেশি প্রশংসা অর্জন করেন; বাউল গায়ক মমুজিদ ও রসিদুদ্দীনও জনতাকে খুব মুগ্ধ করেন। কিন্তু লোক-নৃত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন উপস্থিত করেন মনিপুরীরা। মনিপুরী লাইছাবি নৃত্য দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। সম্মেলনে মেয়েদের নৃত্য হয়নি—হয় ফসলকাটার 'থাব্দল নৃত্য', মহাদেব পূজার 'লাইহাবোবা নৃত্য,' আর বর্শা নৃত্য 'ঘোরাক'। এই বর্শা নৃত্যটি দেখে সত্যই মুগ্ধ ও উদ্বুদ্ধ হতে হয়—মনিপুরীরা প্রাণ দিয়ে নাচে, প্রাণ দিয়ে বাঁচেও।

সম্মেলনে দেখা হয়েছিল দু'জন তরুণ শিল্পীর সঙ্গে; নীরদ মজুমদার ও কাশ্মীরের ব্রহ্ম—দু'জনেই 'ক্যালকাটা গ্রুপের' সঙ্গে সম্পর্কিত। দেখলাম তাঁরা রাতদিন কাজ করছেন, বুঝছিলাম আনন্দ পাচ্ছিলেন তাঁরা এই অভিজ্ঞতায়। তাঁরা বক্তৃতামঞ্চটিকে মণ্ডিত করেছিলেন কৃষক জীবনের বিবিধ দৃশ্য এঁকে। বৃষ্টি বাদলে তা নষ্ট হয়ে গিয়েছে বটে, তবে তাঁদের খাতায় দেখেছি অসংখ্য দৃশ্য স্কেচ করা। মনে হয়েছে, দৃষ্টিস্বল্পতায় সাংবাদিকেরা নিজেদেরই বঞ্চিত করলেন, কিন্তু শিল্পীরা একটা নূতন চেতনা লাভ করছেন—তাই তাঁদের চোখ খুলে যাচ্ছে, হাতের পেন্সিল নামে না, মনে আনন্দ ধরে না—গতায়াত, বাসস্থানের অসুবিধাকেও তাঁরা গ্রাহ্য করেননি। এই সম্মেলন উপলক্ষ করে বাঙলার সাংবাদিকের ও বাঙলার শিল্পীর দ্বিবিধ পরিণতির ইঙ্গিত আমরা পেলাম কিনা জানি না।

বাঙলার শিল্প প্রদর্শনী

নেত্রকোনার প্রদর্শনীতে দেখতে পেয়েছি বাঙলার লোকশিল্পের একটি দিক। প্রধানত তা কারুশিল্পের দিক। যে কারুশিল্প এখনো জীবন্ত তা দেখলাম। কিন্তু চেষ্টা করেও কৃষক সম্মেলনের উদ্যোক্তরা তাদের লোক-শিল্পের প্রদর্শনীতে যে সব শিক্ষা নিদর্শন সংগ্রহ করতে পারেননি—পারতেন না—বাঙলার লোক-শিল্পের সেই রূপ রস-ময় নিদর্শন সহজ ভাবেই সংগৃহীত ও সজ্জিত দেখলাম অন্য একটি স্থানে। আশুতোষ মিউজিয়াম, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলা ভবন, বরেন্দ্র অনুসন্ধান

সমিতি, ব্রতচারী সমিতির গুরুসদয় সংগ্রহ, ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ,—প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠানের সংগৃহীত নিদর্শন একত্রিত হয়েছে লাট-ভবনের 'বাঙলার শিল্প প্রদর্শনীতে।' লাট-পত্নী মিসেস কেজি শিল্পানুরাগিণী। বাঙলার শিল্পের জন্য তাঁর আগ্রহ ও ঐকান্তিকতা না থাকলে অনেকের পক্ষে বাঙলার লোক-শিল্পের এই সংগ্রহ একসঙ্গে দেখবার সুযোগও ঘটত না। ভাগ্যক্রমে এই প্রদর্শনীতে তিনি শিল্প-রসিকদের যথোচিত সহায়তাও গ্রহণ করেছেন, কাজেই নিদর্শনগুলির নির্বাচনে ও প্রদর্শনী-সজ্জায় দর্শকেরা আরও তৃপ্তি লাভ করছেন। সুলিখিত ও সুমুদ্রিত শিল্পপঞ্জীতে বাঙলা শিল্পের যে ভূমিকা দেওয়া হয়েছে, প্রত্যেকটি নিদর্শনে যে পরিচয় আছে, তাতেও দর্শকদের বিশেষ সুবিধা হয়েছে।

বাঙলার শিল্প তার সংস্কৃতির একটি প্রধান অঙ্গ। সে-শিল্পের যোগ রয়েছে ভারতবর্ষের শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে। আবার তার নিজেরও একটি বিশিষ্ট বিকাশ ঘটছে,—বাঙলার নিজস্ব জীবন আছে। প্রদর্শনীর শিল্প-পঞ্জীর ভূমিকায় বলা হয়েছে, "বাঙলার মন এক ও অখণ্ড। মূলত তা সমতল ভূমির দান। এই বিশাল বদ্বীপ আর তার আঁকা বাঁকা নদী খালের রহস্যে বাঙালীর ভাবনা ও দৃষ্টি গড়ে উঠেছে। হিন্দু ও মুসলমান দু'জনায় মিলে মৃত্তিকার রঙে সূক্ষ্ম কারু-শিল্পে বাঙলার কল্পনা-সমৃদ্ধ শিল্প-ভাণ্ডারে আপনার দান যুগিয়েছেন।" এই কথার মধ্যে যে সত্য আছে, তা অস্বীকার করবার কারণ নেই। তাতে নতুন করে কোনো বাঙালীপনার (সেই বিশিষ্ট প্রাকৃতিক পরিবেশের মানে এর নামে এন্‌ভেরন্‌মেণ্টালিজম্ হোক কিংবা 'বাঙালী রক্তের' বিশেষ ধর্মের, মানে 'ব্লাড্ থিওরি'র নামেই হোক্) সমর্থন করা হচ্ছে না। প্রদর্শনীতেও বাঙলার শিল্পের এই দুটি দিকেরই নিদর্শন রয়েছে।—যেদিকে ভারতীয় শিল্প ইতিহাসের ধারা বাঙলায় প্রবাহিত হচ্ছে, তাও আছে। দিন তারিখ নিয়ে তর্ক না করেও বলতে পারি, বাঁকুড়া ও তমলুকের ১নং ও ২নং নিদর্শন বেশ পুরনো; বাণগড়ের, পাহাড়পুরের পোড়ামাটির (যোদ্ধা ও নর্তকী, ৩নং ও ৭নং) নিদর্শনগুলির বয়স কম নয়, তারপরে পাল ও সেন যুগের মূর্তি তো বাঙলা দেশের পথে ঘাটে মিলে। আরও ভালো নিদর্শন আছে—লোকেশ্বর বিষ্ণু লক্ষ্মী ইত্যাদি। কিন্তু এ-প্রদেশে লোকচিত্ত রাজসভার দাবীতে ধরা পড়েনি; বাঙলা আবার ভারত-সভ্যতায় বরাবরই একটু প্রত্যন্ত প্রদেশ। তাই এখানে শিল্পে লোকচিত্তের সহজ প্রেরণা স্বচ্ছন্দভাবে প্রকাশ পেয়েছে, শিল্পশাস্ত্রের ঐতিহ্য আমাদের পক্ষে দুর্ভার হয়ে ওঠেনি, রাজসভা তাকে আড়ষ্ট করে তোলেনি। পাহাড়পুরের সেই পোড়ামাটির

মূর্তি কয়টিতেও লৌকিক জীবনের কথাই স্বচ্ছন্দ ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। লৌকিক জীবনের প্রতি নিঃশঙ্ক দৃষ্টি ও নিশ্চিন্ত সৃষ্টিই বাঙলার শিল্পের আসল গৌরবের মূল। তাই লোক-শিল্পেই বাঙালীর মনের ঠিক পরিচয় রয়েছে—তার স্বচ্ছন্দ লীলা ও সহজ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তার বিশিষ্ট রূপদৃষ্টির ও জীবনবোধের প্রমাণ মিলে। এই লোক-শিল্পের নিদর্শনগুলিকে প্রদর্শনীতে উপযুক্ত গৌরব দেওয়া হয়েছে। লাট-ভবনে অতিকর্ষিত-রুচি শিল্প-রসিকদের কাছে পল্লী বাঙলার লোক-শিল্প তার মর্যাদা আদায় করেছে, এটা ভুলবার নয়।

শিল্প-নিদর্শন না দেখলে তার পরিচয় লাভ করা যায় না, এখানে সেরূপ পরিচয় দানের চেষ্টাও নিষ্প্রয়োজন। অনেক শিল্প-রসিক অন্যত্র তা দিয়েছেন। তবু বলা যেতে পারে, পাহাড়পুরের নিদর্শন ছাড়াও যশোরের নলডাঙ্গার সেই জগদ্ধাত্রী মূর্তি, পোড়ামাটির রামায়ণ দৃশ্য, কুমিল্লার ময়নামতীর পোড়ামাটির যুবক, কিন্নর মূর্তি, কুমিল্লার কাঠের খোদাই দুর্গা ও রামায়ণের দৃশ্য, মালদহের সেই কাঠের কৃষ্ণমূর্তি, তা ছাড়া নানা জায়গার পট—কালীঘাটের পটও আছে,—পাটা, কাপড়ের উপর সূক্ষ্ম কাজ—আর সেই খানচারেক কাজ-করা কাঁথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষজ্ঞের এ কাঁথা দেখে গগ্যাঁ মাতিসের কথা মনে পড়ে গিয়েছে, সে সব মহাশিল্পী বাঙলার চিত্র দেখলে নাকি বিশেষরূপে উদ্বুদ্ধ হতেন, তাঁরা একথাও বলেছেন। সাধারণ ভাবে আমরা বাঙলার এই শিল্প-প্রদর্শনী থেকে যা দেখছি তা হচ্ছে এই—প্রথমত, বাঙলার শিল্প লৌকিক জীবনকে সাগ্রহে ও স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছে, তাতে ভয়ও পেত না, ভাবনায়ও পড়ত না; দ্বিতীয়ত, এ শিল্প জীবন-যাত্রার যে-কোনো নতুন জিনিসকেও গ্রহণ করতে পারত—সে সাহেবই হোক, আর আমীর-ওমরাই হোক, মানে, তা জীবন্ত ও চলন্ত ছিল। তৃতীয়ত, তার প্রকাশভঙ্গীও ছিল সহজ, অকৃত্রিম, বাহুল্য-বর্জিত।

বাঙলার লোক-শিল্পের এক নূতন বিকাশের চেষ্টা আজ দেখা দিয়েছে। তাই, বাঙলার লোক-শিল্পকে দেখা ও বোঝা আরও বেশি প্রয়োজন। সে সুযোগ যত পাওয়া যায় ততই আমাদের মঙ্গল; আর এ সুযোগ যে সহজে লাভ করা যায় না তাও আমরা জানি।

বৈশাখ, ১৩৫২

১ 'একান্ন'র হিসাব

বাঙলা সাল শেষ হতে চলেছে। স্বভাবতই অবসানপ্রায় বৎসরের দিকে ফিরে তাকাতে ইচ্ছা যায়। ১৩৫০ শেষ না হতেই সরকার বলেছিলেন, অবস্থার মোড় ঘুরছে। তবু ১৩৫১-র দিকে ফিরে তাকিয়ে অবশ্য খুব উৎসাহিত বোধ করব, ১৩৫১ এমন বৎসর নয়। ১৩৫০-এ মন্বন্তর গিয়েছিল, ১৩৫১-তে মহামারী এল, ১৩৫০-এ চাল ও খাদ্যদ্রব্যই বেশি করে চোরাবাজারে গিয়েছিল, ১৩৫১-তে সমস্ত দ্রব্যই চোরাবাজারে গিয়েছে। চোরাবাজারই এখন সদর বাজার হয়েছে—আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের মোট দর এখন চতুর্গুণ। মানে যুদ্ধারম্ভের সময় যেখানে জিনিসপত্রের দর ছিল ১০০৲ টাকা, এখন সেখানে দর উঠেছে ৩৯৭৲ টাকায়—এই নাকি সরকারী হিসাব। নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি—কাপড়, কাগজ, কয়লা, কেরোসিন, সর্ষের তেল শুধু নয়, মাছ, তরকারী, দুধ—যা কিছু নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তারই দর অনেক ক্ষেত্রে চতুর্গুণেরও বেশি, এবং আরও অনেক ক্ষেত্রে তা চোরাবাজারে ছাড়া পাওয়াই যায় না। সহজভাবে ন্যায্য দরে বাঙলা দেশে আজ কোনো জিনিস কেনা সম্ভব নয়। এ হিসাব আমরা বাড়াতে চাই না, মোড় যে কোন দিকে ঘুরেছে তা বুঝতে পারি। দেখছি ভূমিছাড়া কৃষকেরা তাদের জমি ফেরত পায়নি, লাঙলের লোহা কাস্তের লোহা তারা কিনতে পারে না, খোল, বীজ, সার কেনা তাদের দুঃসাধ্য হয়ে উঠছে, সরকারী বজেটে টাকা নির্ধারিত হলেও বলদ কেনার জন্য চাষী সে ঋণ পায়নি; বজেটের নির্ধারিত সেচ প্রসারের কোটি কোটি টাকা তহবিলেই জমা আছে, সরকারের মনঃপূত স্কিম্ তৈরী হয়নি; আর বহু বিজ্ঞাপিত সরকারী 'খাদ্য ফসল বাড়াও' প্রচারের ফলে বাঙলা দেশে ১৩৫১-তে আমন ফসল ফলেছে সাধারণ বৎসরেরও তুলনায় শতকরা ১০ ভাগ কম। এ ছাড়াও দেখছি—তাঁতী ও জেলেরা সূতা পায় না, কামারেরা লোহা পায় না, কুমারেরা মাটি পর্যন্ত পায় না,—বাঙলার গ্রাম্যজীবন ১৩৫০-এর পরে ১৩৫১-তে প্রতিষ্ঠিত হবার মত কোনো অবলম্বনই পায়নি। অন্য দিকে জানি কয়লার অভাবে আবশ্যকীয় জিনিসপত্রের অভাবে কল-কারখানায় উৎপাদন কমেছে, অনেক ক্ষেত্রেই সেই শিল্পজাত চোরাবাজারেই নিয়মিতভাবে যায়, আর চোরাকারবারীর সঙ্গেও মালিকের যোগাযোগ নিতান্ত অস্পষ্ট নয়। তাই কলে কাজ কম হয়, মাল কম উৎপন্ন হয়, জিনিসপত্রের দাম বাড়লেও মজুরের মজুরী বাড়েনি; অথচ মাল কম উৎপন্ন

হলেও মালিকের মুনাফা বেড়েই গিয়েছে। এই কথা পাটের বিদেশী মালিক, চালের দেশী ও বিদেশী মালিক, কাপড়ের দেশগত প্রাণ বাঙালী-অবাঙালী মালিক, চিনির ভারতীয় মালিক, আর কাগজের ও সংবাদপত্রের বিজাতীয় ও জাতীয়তা-বাদী মালিক ও ব্যবসায়ী সকলেরই সম্বন্ধে প্রায় সমান সত্য।

সমস্ত বাঙলা দেশ চোরা কারবারীর কবলে—কাপড়ের, কেরোসিনের, কয়লার লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একথা আমরা যেমন বুঝ্ছি, তেমনি বুঝছি—সমস্ত বাঙলা দেশে আজ ঘুষের রাজত্ব স্থাপিত হয়েছে। একথা আজ নিজের গরজেই কর্তৃপক্ষ স্বীকার করেন, এমন কি স্থল বিশেষে তাঁরা দুই একটি অসাধু কর্মচারীর বিরুদ্ধে মামলা মোকদ্দমাও পরিচালনা করেন। কিন্তু সেই প্রথমকার 'ভিটে-ছাড়াবার, গ্রাম-ছাড়াবার' দিন থেকে একেবারে আধুনিক দিনের কাপড় বিলির রেশনের কার্ড বিলির দিন পর্যন্ত সামরিক ঠিকাদারীতে, বেসামরিক সরবরাহ বিভাগে, সরকারের এজেণ্ট, সব-এজেণ্ট মনোনয়নে, তাদের কাজকর্মে, সমস্ত দেশ জুড়ে যে 'পুকুর চুরি' চলেছে—তাকে দমন করবার মাত্র কোনো প্রয়াসই কোথাও লক্ষ্য করা যায় না। বরং যা লক্ষ্য করা যায় তা এই যে, শুধু অপদার্থতা নয়, শুধু আত্মীয়পোষণও নয়, উৎকোচ এবং অসাধুতা আজ শাসন বিভাগের সর্ব বিভাগে, তার উচ্চ নীচ সমস্ত স্তরে একই রূপে প্রশ্রয় পেয়েছে চোরা কারবারীর জুরি চোরা কর্মচারী।

এই কঠিন সত্য ১৩৫১ আমাদের কাছে সুস্পষ্ট করে তুলেছে যে চোরা কারবারী ও চোরা কর্মচারী আজ বাঙলা দেশকে ছেঁকে ধরেছে, সমস্ত দেশের আর্থিক জীবন তাদের কবলে গিয়ে পড়েছে। কিন্তু তবু এখন পর্যন্ত আমরা যে কথাটি সুস্পষ্ট করে বুঝছি না তা এই যে—বাঙলার সমাজজীবনে এই নূতন শক্তির আবির্ভাবে কি পরিবর্তন সজ্ঘটিত হচ্ছে, আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনেই বা তার ফলে কি লক্ষণ দেখা দিচ্ছে।

* * *

তিন বৎসর পূর্বে সামরিক ঠিকাদারী থেকে এক নতুন নেশা দেশকে পেয়ে বসে—অবশ্য তারও পূর্বে যুদ্ধের মাল সরবরাহ করে কাপড়ের কলের মালিকেরা শতকরা ৩০০৲ টাকা মুনাফা করছিলেন। কিন্তু বাঙলা দেশ তিন বৎসর পূর্বেই বিশেষ করে শুরু হয় এই মুনাফার শিকার, শুরু হয় প্রধানত সামরিক ঠিকাদারীর সূত্রে। দেশের ব্যবসায়ী, সওদাগর সকল শ্রেণী দেখল—টাকার জোয়ার চলেছে, মুনাফার কোনো আর সীমা-সীমানা নেই। সমস্ত শ্রেণীতে এই মুনাফার শিকার

পরিব্যাপ্ত হল, আবার সমস্ত শ্রেণী থেকেই সামরিক বেসামরিক নানা ঠিকাদারী ও সরবরাহের ক্ষেত্রে ভিড় করে এল মুনাফার খোঁজে নানাবিধ লোক—তাদের মধ্যে দরিদ্র ছিল, ধনী ছিল, উচ্চবর্ণের ছিল, নিম্নবর্ণের ছিল, শিক্ষিত ছিল, অশিক্ষিত ছিল, চাকরিজীবী ভদ্রলোক ছিল, বৃত্তিজীবী কারিগরও ছিল, ব্যবসায়ী মালিক মহাজন ছিল, আবার অভিজাত জমিদার ব্যাঙ্কারও ছিল—এক কথায় সমস্ত স্তর থেকেই তারা ভিড় করে এল—আর এল শুধু একটি লক্ষ্য নিয়ে, 'যে করে পারি—লুটে নিই এবেলা।' এই একটি মাত্র মন্ত্র তাদের পেয়ে বস্‌ল—আত্মসর্বস্বতা হল তাদের জীবনধর্ম। এ কিন্তু ধনিকতন্ত্রের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ নয়, সমাজঘাতী আত্মসর্বস্বতা মাত্র। সমাজে বসবাস মানেই পরস্পরের সহায়-সাহায্য, খানিকটা পরস্পরের জন্য বেদনাবোধ, সম্পদে বিপদে পরস্পরের পার্শ্বে দাঁড়ানো। সমাজের প্রত্যেক স্তরেই এই মূল সামাজিক গুণ নানাভাবে প্রকাশ পায়—পারিবারিক স্নেহমমতা তার কেন্দ্র, তার পরে আত্মীয় স্বজনের প্রতি দয়ামায়া, বন্ধু প্রতিবেশীর সহিত সহজ আদান প্রদান, পূজায় পার্বণে দশজনকে নিয়ে উৎসব করা, দশজনের হিতের ব্যবস্থা করা, দরিদ্র নারায়ণের সেবা, জাকৎ ইমান অভিজাতদের দয়া দাক্ষিণ্য এসব নিয়েই সমাজ চলে। আমাদের সমাজও চলেছে আমাদের চাষী-মজুর ব্যবসায়ী কারিগর জমিদার-মহাজন কেউ মোটের উপর এই মূল সামাজিক বোধকে একেবারে অস্বীকার করত না। 'মানি ইকোনমি' বা টাকার যুগ এসে তার পুরানো বন্ধন শিথিল করছিল, নতুন মর্যাদাবোধও দিচ্ছিল সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে, আর শিক্ষিত ভদ্রলোকের অভ্যুত্থানে সেই সামাজিক গুণেরও নূতন ধারায় প্রবল বিকাশ ঘটেছিল—স্বজাতিপ্রীতি, দেশপ্রীতি, দরিদ্রনারায়ণের সেবা, মানুষের মনুষ্যত্ব, ঝড়ে বন্যায়, অনাবৃষ্টিতে দুর্গত জনতার সেবায় আত্ম-নিবেদন—বাঙলা দেশে অন্তত ১৯০৫-এর পর থেকে ভদ্রলোকের জীবন-দৃষ্টিতে এ-সবই হয়ে ওঠে মানুষের কাজ, তার সার্থকতার মানদণ্ড। অবশ্য এই ভদ্রলোকের জীবনভিত্তিতেও ভাঙন ধরেছিল ১৯২০-এর পর থেকে, বিশেষ করে ১৯৩০-এর পরে, কিন্তু তারাও অর্থকে ক্রমেই সার্থকতার মানদণ্ড হিসাবে মেনে নিতে বাধ্য হচ্ছিল; তবু ভদ্রলোকের ভদ্রতা, দেশপ্রীতি, দরিদ্রসেবা এসব সম্মানিত হত। কিন্তু ১৯৪২-এর পর থেকে সমাজের সমস্ত স্তর ভেঙে যখন মুনাফার শিকারে শিক্ষিত-অশিক্ষিত বেরিয়ে পড়ল—তখন তাদের একটিমাত্র মন্ত্র হল—"যা পারি লুটে নিই এবেলা।" নিজ নিজ শ্রেণীর সমাজের কোনো ধারণা বন্ধন তারা আর সঙ্গে নিয়ে

চল্‌ল না—পুরনো ব্যবসায়ী মালিকদের মধ্যে, জমিদার ও ভদ্রলোকদের মধ্যে যে দয়া-দাক্ষিণ্য ছিল, ইষ্টানিষ্ট ছিল, এমন কি সাধারণ কর্তব্যবোধ ছিল, ধর্মবোধ ছিল—এই মুনাফার শিকারীদের মন থেকে তা লুপ্ত হয়ে গেল। এক সমাজঘাতী আত্মসর্বস্বতা—এক নির্লজ্জ লুণ্ঠনবৃত্তি তাদের পেয়ে বস্‌ল।

তাই মন্বন্তরের দিনে তারা দেখতে লাগল তাদেরই পরিজন-প্রতিবেশীর মৃত্যু,—দেখল সমাজ ভেঙে যাচ্ছে, সংসারধর্ম বিনষ্ট হচ্ছে, চিরদিনকার মায়া-মমতা, স্নেহ-প্রীতি, ভক্তি-বাৎসল্য সব সমাধি লাভ করছে। যা কেন্দ্র করে পরিবার গড়ে উঠে, যা আশ্রয় করে সমাজ পত্তন হয়—সেই মূল সামাজিক বন্ধন অনুভূতি সব ক্ষয়ে যেতে লাগল—সে সবই আবার মুনাফার এক নতুন উপকরণ হল, অন্নহীনের ঘর দুয়ার বাসন-কোসন, জমি-জলা, শেষ পর্যন্ত পুত্রকন্যা এবং স্ত্রীলোকের দেহ পর্যন্ত এই মুনাফাদারের বড় পণ্য হয়ে উঠল—মুনাফার মৃগয়া মানুষের মৃগয়ায় পরিণত হল।

দিগ্‌ভ্রান্ত নর-নারীর লক্ষ্য হয়ে পড়ল—'যে করে পারি আপনাকে বাঁচাই' এই সমাজ-বিরোধী আত্মরক্ষার বুদ্ধি, আর মুনাফার কাণ্ডারীদের মন্ত্র হয়ে উঠল —'যে করে পারি এবেলা লুটে নিই' এই সমাজ-ঘাতী আত্মসর্বস্বতার পথ। চোরা কারবারী ও চোরা কর্মচারী যতই বাঙলার সামাজিক জীবনে তাদের আধিপত্য বিস্তার করতে লাগ্‌ল ততই বাঙলার ভদ্রলোকের ভদ্রতার মানদণ্ড পরিত্যক্ত হল, বণিকের মানদণ্ড নয়, চোরা-কারবার ও চোরা-কারবারীর মানদণ্ড সমাজে রাজদণ্ড হয়ে উঠল ১৩৫০-৫১-এর মধ্য দিয়ে। শিক্ষিত ভদ্র সমাজ প্রথম বিস্ময়ে দেখেছিল এই নূতন শক্তির অভ্যুদয়—ঠিকাদার ও মুনাফাদারের অসাধু ব্যবসায়,—ঘৃণাও করেছিল, আহতও হয়েছিল দেখে মন্বন্তরের মুখে দয়ামায়া মানমর্যাদার পরাজয়, তারপর আত্মরক্ষায় তারাও বিব্রত হয়ে পড়ে, তারাও মেনে নেয় আজ মুনাফার শিকারেই মুক্তি, তারাও সহিংস দৃষ্টিতে দেখল নূতন শক্তির উচ্ছৃঙ্গ মদগর্বিত সমারোহ—পথে ঘাটে, বাসে বাজারে—একেবারে পারিবারিক আদান প্রদানে—তারাও মান্‌ল এই শক্তির শক্তিকে, আর একটু একটু করে তারাও সেই নূতন আদর্শের দ্বারা কবলিত হল—সেই শুভবুদ্ধি, সেই ভদ্রতার আদর্শ, সেই দেশপ্রীতির, সেই দুর্গত সেবার—পরিবারে ও পরস্পরের প্রতি মায়ামমতার সেই বন্ধন তারাও বিসর্জন দিতে লাগল।

বাঙলার সমাজে ভদ্রলোকের জীবনাদর্শ একটু করে ঠিকাদার, মুনাফাদার, চোরা-কারবারী ও চোরাকর্মচারীর নিয়ম কানুনের নিকট,—ভদ্রনীতি চোরা-

নীতির নিকট নত হয়ে পড়েছে—সমাজ-নীতি সমাজ-বিরোধী আত্ম-সর্বস্বতার নিকট হার মেনেছে,—এইটিই ১৩৫১-তে দেখ্‌তে পাই, আর এইটিই আমরা ১৩৫১-তে সুস্পষ্টরূপে বুঝে উঠ্‌তে পারি না। তাই সচেতন হতে পারিনি—আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে এই চোরা-কারবারীর অভ্যুত্থানে—সমাজ-বিরোধী শক্তির প্রতিষ্ঠায় কেমন করে সমাজের প্রতি স্তরে ভাঙন ধরেছে আমাদের রাজনীতিক চিন্তায় ও আদর্শে, কর্মে ও সঙ্ঘ-শক্তিতে; ভাঙন ধরেছে কংগ্রেসের মধ্যে, মোসলেম লীগের বাইরে,—ভাঙন ধরেছে আমাদের সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও।

* * * *

১৩৫০-৫১-তে সব চেয়ে আশার যে লক্ষণ দেখা যায় তা দেখা গিয়েছে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই। মন্বন্তরের আঘাতে বাঙলার সহিত্যিকরা সাড়া দেন—সমস্ত প্রাণ দিয়ে। সকলে খুব সচেতনভাবে সাড়া দিয়েছিলেন তা নয়। কারণ যা ১৩৫১-তে ক্রমশ প্রকট হয়, তা তখনো এত সুস্পষ্ট ছিল না—বোঝা যায়নি বাঙলা দেশ কোন নির্লজ্জ শক্তির কবলে গিয়ে পড়ছে। স্বাভাবিক সহৃদয়তা ও মানব বৃত্তিতেই সেই মন্বন্তরের দিনেও সাহিত্যিকরা সাড়া দেন—তা তাঁদের সুস্থ হৃদয়বৃত্তিরই পরিচয়, তাঁদের জীবন-পূজারই তা সহজ সাক্ষ্য—মানুষের অতবড় দুর্ভাগ্যে, সভ্যতার এমন পরাজয়ক্ষণে—তাঁরা উদাসীন থাকেননি। ইতিহাস তাঁদের এই পরিচয় স্মরণ রাখবে—যতই সাময়িক হোক্ তাঁদের সৃষ্টি, যতই অপরিণত হোক্ তাঁদের প্রয়াস। ১৩৫১-তে দেখলাম—শিল্পীরা এই সাক্ষ্য বহন করে উপস্থিত হয়েছেন। গত বছরে আমাদের দেশে যত শিল্প প্রদর্শনী হয়েছে ইতিপূর্বে তা এত বেশি হত কি না জানি না। সত্য বটে, এসব প্রদর্শনীরও পিছনে একটা চোরা আশা অজ্ঞাতসারে সঞ্চারিত হয়েছে—'দেশী বিদেশী নূতন ভাগ্যবানদের কোনরূপে মুগ্ধ করে কিছু অর্থ সংগ্রহ করে নিই এ বেলা'। কিন্তু মোটের উপর শিল্পীরা নিষ্ক্রিয় থাকেননি—আর অনেক শিল্পীই নূতন জীবন-সৃষ্টির ও নূতন জীবন-বোধের প্রমাণ দিতে লজ্জা বোধ করলেন না। যাঁরা শিল্পীর 'সামাজিক চেতনা' দেখলে বিরক্ত হন বা ব্যঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন তাঁরাও মানতে বাধ্য হন—এদের শিল্প অসার্থক নয়।

১৩৫১ জুড়ে শিল্পীদের মনে এই সামাজিক চেতনা নানাভাবে প্রকাশপথ খুঁজতে থাকে। তার প্রমাণ নানা নাট্য সঙ্ঘের জন্মে, এমন কি, চলচ্চিত্রের ক্ষেত্রে পর্যন্ত প্রত্যক্ষ হয়। তারই বলিষ্ঠ ও সুস্পষ্ট সাক্ষ্য মিলে গণ-নাট্যকলার সার্থক জাগরণে এবং গণ-নৃত্যনাট্যের অপূর্ব প্রয়োগে।

এ সময়ের সব চেয়ে বড় আশার লক্ষণ এই বাঙলার লোকশিল্পীকে পুনঃ প্রতিষ্ঠার আবার চেষ্টা হচ্ছে, সেই লোকশিল্প ও শিক্ষিত শিল্পের সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা হচ্ছে, আর বাঙলার শিল্প সাহিত্যের বাহকেরা নিজেদের ঐতিহ্য ও দায়িত্ব পালনে পরাঙ্মুখ হননি। "রবীন্দ্র নগরের" সংস্কৃতি উৎসবে এই সত্যই উপলব্ধি করবার সুযোগ পেয়েছি, আর সঙ্গে সঙ্গে এই সত্যেরও আভাস পেয়েছি, দিনের পর দিন শিক্ষিত ও অশিক্ষিত জনতার সুশৃঙ্খল আচরণ ও অকৃত্রিম রসবোধ থেকে জনশক্তি বাঁচবার শক্তি খোয়ায়নি, জাতি এখনো বাঁচতে চায়।

কিন্তু ভুলব না—সমাজক্ষেত্রে যে চোরাকারবারী ও চোরাকর্মচারী রাজত্ব স্থাপন করেছে ১৩৫১-তে তারা সংস্কৃতিক্ষেত্রেও তাদের আসন স্থাপন করছে। তাদের চোরা নীতি বাঙলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে নানা কলহ ও অসূয়ার বেশে আত্ম-প্রকাশ করছে। জেনে না জেনে শিল্পী ও সাহিত্যিক দল অনেকেই মিলন অপেক্ষা বিরোধের, ঐক্য অপেক্ষা দ্বন্দ্বের, ভদ্র সামাজিকতা অপেক্ষা অসামাজিক আত্মকেন্দ্রিকতার, শুভ সহযোগিতার অপেক্ষা অশুভ প্রতিযোগিতার পক্ষপাতী হয়ে পড়েছেন। শিল্পীর রসোপভোগে, সাহিত্যের বিচারে, গণনাট্য ও নৃত্যনাট্যের সমালোচনায় তাই সংস্কৃতিগত আদর্শ, জীবনদৃষ্টি, জীবন-বোধ অনেক ক্ষেত্রে গ্রাহ্য হচ্ছে না, চোরাবাজারী মনোভাব, নিতান্ত বৈষয়িক লাভালাভের খতিয়ান, নিজ নিজ শিল্প ব্যবসায়ের ও সাহিত্য ব্যবসায়ের হিসাব—এসবও বহুলাংশে বিচারক-সমালোচকদের প্রভাবান্বিত করছে; মুনাফার এই শিকারের নেশায় সংস্কৃতিক্ষেত্রেও বিভেদ-বিচ্ছেদ টানবার আয়োজন হচ্ছে।

এইটিও ১৩৫১ সালেরই এক ইঙ্গিত। বাঙলার সংস্কৃতি-জীবনের একাংশ চোরাকারবারীর ও চোরাকর্মচারীর ছায়ায় আছন্ন—বাঙালী সাংবাদিক তাঁর গৌরবময় ঐতিহ্য আর বহন করতে পারছেন না। মুনাফার মৃগয়ায় তাঁরা এতটাই মত্ত যে দেশী বিদেশী সামরিক, বেসামরিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলে দু'দশ হাজার টাকা ক্ষতি-স্বীকার করতে আজ তাঁরা অস্বীকৃত, এমন কি, দেশী চোরা কারবারের বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করতে—বিড়লা বা ইস্পাহানী, সিংগনিয়া বা থাপর প্রমুখ বনিগ্-রাজদের যে সব কার্যাবলী প্রমাণিত হয়েছে, সাধারণের সম্মুখে তা তুলে ধরতেও বাঙালী সংবাদপত্র অনিচ্ছুক। অন্য দিকে গ্রামে গ্রামে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান শেষ হয়ে গিয়েছে,—শিক্ষক অনাহারে মরেছেন, জীবিকান্বেষণে বিদ্যালয় পরিত্যাগ করেছেন। এমনি সময়ে বাঙলার সংস্কৃতিক্ষেত্রে শিল্পী ও

সাহিত্যিকরাই একমাত্র ভরসা। বাঙালী সংস্কৃতি, বাঙালী জীবনাদর্শ, বাঙালীর ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রাখবার দায়িত্ব এই শিল্পী ও সাহিত্যিকদের। তাঁদেরই কীর্তির মধ্য দিয়ে নূতন বাঙালী শক্তির জন-জাগরণের সম্ভাবনা, বাঙালীর দেশ-প্রীতির ও সমাজবুদ্ধির মানব ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার আশা। [চৈত্র, ১৩৫৩]

সংগীত উৎসব

গত ৫ই জানুয়ারী থেকে ১০ই জানুয়ারী পর্যন্ত ছ'দিন ধরে কলিকাতায় পূরবী চিত্রশালায় নিখিল ভারতীয় ভারতসংগীত সম্মেলনের অধিবেশন হয়েছে। উত্তর ভারতের প্রধান প্রধান ওস্তাদেরা অনেকেই এসেছিলেন, প্রধান প্রধান 'ঘরানাদে'র পরিচয় শ্রোতারা লাভ করেছেন। যেরূপ উচ্চ ধরনের ও বিচিত্র শিল্প-কলার পরিবেশন হয়েছিল তাতে বিস্মিত হয়ে ভাবতে হয়—সংগীতের প্রতি এদেশের সত্যকারের অনুরাগ আছে, এ শুধু একটা অভ্যাসগত অনুশীলন মাত্র নয়। বোম্বাইর কেশর বাঈ কেরকার ওস্তাদ আল্লাদিয়া খাঁর শিষ্যা; খাঁটি হিন্দুস্থানী সংগীতের তিনি যে সব পরিচয় উপস্থিত করেন তাতে সংগীতভক্ত মাত্রই মুগ্ধ হন। বোম্বাই'র রোশেনারা বেগম গা'ন স্বর্গীয় অব্দুল করিম খাঁ সাহেবের পদ্ধতিতে। খাঁ সাহেব কর্ণাটকী ও হিন্দুস্থানী সংগীতের একটা সমন্বয় করেন রোশেনারা বেগম তা উপস্থিত করেন শ্রোতাদের কাছে—সংগীত রসিকেরা মুগ্ধ হয়ে শোনেন। লাহোরের গোলাম আলী খাঁর খেয়াল, আর তাঁর ঠুংরীও, মুগ্ধ না করেছে এমন লোক নেই। পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ, পটবর্ধন, গোয়ালিয়রের কৃষ্ণরাও, নারায়ণ রাও ব্যাস প্রভৃতি ভারতবর্ষের নমস্ত সংগীত-গুরুদের ভজন, খেয়ালও তাঁদের শোনবার সৌভাগ্য হয়েছে। তা ছাড়াও, খলিফা দবির খাঁর বীণা, গোয়ালিয়রের হাফিজ আলী খাঁর এবং আলাউদ্দীন খাঁর পুত্র আলী আকবর খাঁর সরোদ—নানা গুণী ও কলাবিদের কণ্ঠ ও যন্ত্রসংগীত ছদিন ধরে ক্রমাগত যা চলে, তার একটা সংক্ষিপ্ত তালিকা দেওয়াও সম্ভব নয়। সমালোচনা করা অবশ্য আরও অসম্ভব; কারণ তেমন শক্তি আমাদের নেই; আর যাঁদের আছে তাঁরাও কাগজের পাতায় লিখে সাধারণ পাঠকের কৌতূহল বা রসবোধ মিটাতে পারেন না। এখানে সাধারণ শ্রোতাদের পক্ষ থেকে সাধারণভাবে আমাদের যা বলবার তা'ই বলা যেতে পারে। প্রথমত কথা এই, এত গুণীর ও

ওস্তাদের সমাগম হয়েছে, কিন্তু ব্যবস্থাপনাতে আরও একটু যত্ন নেওয়া সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন ছিল। দ্বিতীয় কথা, সংগীত সম্মেলনের উদ্দেশ্য যদি এই হয় যে, দেশের সাধারণ লোক ভালো গান শুনবার অবসর পাবে, আর তার ফলে দেশের সাধারণ লোকের রুচির ও জ্ঞানের উন্নতি হবে, তাহলে সম্মেলনের প্রবেশ-দক্ষিণাও সাধারণ লোকের অবস্থানুযায়ী করা উচিত। হয়ত ওস্তাদদের দক্ষিণা প্রচুর দিতে হয়েছে। কিন্তু সাধারণ লোক আজ ওস্তাদদের দক্ষিণা দিতে অস্বীকৃত নয়। আপত্তি তাদের ব্যবসায়ীদের মুনাফাদারীতে। তৃতীয় একটি কথা, ওস্তাদদের আচরণ পরস্পরের মধ্যে এবং শ্রোতাদের সঙ্গেও শোভন হওয়া দরকার—এটাও স্বীকার্য।

"রাজসিক" চিত্র প্রদর্শনী

এ্যাকাডেমি অব্ ফাইন আর্টসের বার্ষিক শিল্প প্রদর্শনী চলছে। এ্যাকাডেমি গোড়া থেকেই রাজা-রাজড়ার ব্যাপার। এখনো তাই—লাট সাহেব তা উদ্বোধন করেন, লাটগিন্নী তাতে চিত্র প্রদর্শন করেছেন (ভাগ্যক্রমে অবশ্য এখনকার লাট-গিন্নী সত্যই শিল্প রসিকা); রাজা বাহাদুররা তাতে চিত্রাদি ক্রয় করেন—আর এখনকার বণিগ্‌রাজেরাও তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছেন। এখানে চিত্রের তাই দাম ধরা হয় এ দেশের তুলনায় উঁচু হারে; চিত্র বিক্রয়ও হয় উঁচু দরেই; এবার নাকি এ প্রদর্শনীতে চিত্রাদি যেমন বিক্রয় হয়েছে তেমন বিক্রয় পূর্বেও হয়নি। এরূপ না হলেই আশ্চর্য হতে হত,—দেশে টাকার জোয়ার চলেছে। শিল্পীদের ভাগ্য ভালো—তাঁদের কপালেও তার ছিটেফোঁটা জুটছে। অবশ্য ভাগ্যবান্ শিল্পীরা হয়ত সংখ্যায় দু'একজন। আর যা চিরদিনকার নিয়ম তাই হয়ত হয়েছে—যাঁরা ভাগ্যবান ছিলেন তাঁদেরই ভাগ্য হয়ত আরও খুলছে। এসব দেখে শুনে বলতে পারি এ্যাকাডেমির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আর ভয়ের কারণ নেই। তার বর্তমান সম্বন্ধেও আমরা নিঃসংশয় হয়েছি।

এবারকার প্রদর্শনীতে গিয়ে যা আশা করেছি তা'ই দেখেছি। মানে, নতুন বেশি কিছু দেখিনি, তবু এমন কিছু কিছু দেখেছি যাতে আনন্দও পেয়েছি। আশানুরূপই দেখলাম—শ্রীযুক্ত সতীশ সিংহ ও যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়দের প্রতিষ্ঠা ও কৃতিত্ব। সতীশ সিংহ মহাশয়ের "শকুন্তলা" বড় হলের পূর্ব প্রাচীর

জুড়ে আছে—আকাশ, পাতা, রং নিয়ে তাঁর নিজের ধরনের এক খেলা এই ছবিতে। ভালোই লাগল—শুনেছি ভালো দামও উঠেছে। আরও অনেক ছবি তাঁর আছে—'মহাত্মা গান্ধী'কেও তিনি বাদ দেননি। আজ 'মহাত্মাজী'র ছবির একটা বাজার দর আছে, শিল্পীদের অনেকের তা ভোলা সম্ভব নয়। শ্রীযুত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের প্রতিপত্তি ও তাঁর বর্ণ-বিলাস সুপরিচিত। তাঁর একখানা প্রতিকৃতিতো চোখে পড়বেই। দেখা যাচ্ছে শ্রীযুক্ত রমেন্দ্র চক্রবর্তীও প্রতিকৃতি অঙ্কনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন। তাতে সংশয়ের কারণ দেখি না। রমেন্দ্র চক্রবর্তী তাঁর গুরু নন্দলালের মতোই নানা পথে নানা পদ্ধতিতে চল্‌তে উৎসাহী। শিল্পী-মনের পক্ষে তা স্বাভাবিক বলে আমাদের বিশ্বাস—বিচিত্র পথে চল্‌তে যে খণ্ডিত হয়ে যায় না, বরং আপনাকেই প্রকাশ করে চলে। আমাদের চক্ষে কিন্তু তাঁর 'প্যারিস ১৯৩৯', তাঁর 'ভারতীয়' পদ্ধতিতে অঙ্কিত 'রামলীলা' বা 'হোলীর' থেকে কম তৃপ্তিদায়ক মনে হল না, আর 'ত্রিপুরার মহারাজার' প্রতিকৃতিতেও কৃতিত্বের ছাপ রয়েছে। কিন্তু প্রতিকৃতির দিক থেকে শিল্পী অতুল বসুর অঙ্কিত 'লেডি মুখার্জিই' এবার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। অতুল বসু পোর্ট্রেটে সিদ্ধহস্ত কিন্তু এরূপ চমৎকার পোর্ট্রেট তিনিও বেশি আঁকেননি। এসব সুপ্রতিষ্ঠিত শিল্পীদের ছাড়াও চোখে পড়ে হসুমিয়া, সমর ঘোষ (ভারতীয় পদ্ধতির চিত্রের জন্য তাঁর 'শকুন্তলাই' প্রথম পারিতোষিক পেয়েছে), দিলীপ দাশগুপ্ত প্রভৃতির কাজ। ভাস্কর্যের নিদর্শন তেমন ভালো নেই—প্রায়ই পুরোনোও। কিন্তু কয়েকখানা শক্তিশালী ড্রয়িং প্রদর্শনীতে 'গরীব আত্মীয়ের' মতো কুণ্ঠিতভাবে রয়েছে,—প্রদর্শনীর কর্তৃপক্ষ হয়ত তাদের জন্য লজ্জিত,—তা' গরীবদেরই ছবি,—জয়নাল আবেদীনের আঁকা। রাজ-রাজড়ার প্রদর্শনীতে দুঃস্থদের টানা একটু বিপজ্জনক। আমরা কিন্তু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম জয়নালের বলিষ্ঠ রেখা।

অনেকক্ষণ দেখেও এই প্রদর্শনীতে আর কি দেখলাম, তা মনে করতে পারছি না। 'ভারতীয় পদ্ধতিতে'ও দেখলাম যেন একই পদ্ধতিতে পুনরাবৃত্তি। শেষটা কি এখানেও 'তোট, তোট তোটয়ই' চল্‌বে নাকি? কিন্তু ভিড় বেশি অন্য ঘরেই; সেখানেই সমারোহ, ক্রয়-বিক্রয়ের আসল কারবার। সেখানে উল্লেখযোগ্য শিল্প-নিদর্শন অপেক্ষাও উল্লেখযোগ্য শিল্প-ক্রেতাদের চিহ্ন দেখলাম। বুঝলাম, ইন্‌ফ্লেশান্ মিথ্যা নয়, এবং ভারতীয় ধনিক্‌ও এবার কাল্‌চারের দর ও কদরও বুঝে উঠেছেন। সেদিকে এ্যাকাডেমি সার্থক হচ্ছে। শিল্পীদেরও

কি ভাগ্য ফিরছে? একজন শিল্প-রসিক বল্‌লেন, 'বিশ বছরেও অমুক শিল্পীর ছবির ভেজা কাপড় শুকোল না।' আমাদের একজন বন্ধু জানালেন, 'শুকোবে না—যত দিন রাজা-রাজড়ারা আছে।'

রাজা-রাজড়ার পার্শ্বে পার্শ্বে আজ বণিগ্‌রাজারাও এসে গেছেন শিল্পের হাটে। কাপড় আর শুকোবে না। কিন্তু শিল্পীদেরও একটা কথা নিবেদন করতে চাই—বড় লোকের মুখাপেক্ষী না হয়েও শিল্পীরা আজ চল্‌তে পারেন। যেকালে কবি, শিল্পী, ওস্তাদ এঁদের রাজ-রাজড়ার দরবারে প্রসাদ সংগ্রহ করতে হত, সেকাল পশ্চিমে চলে গেছে, এদেশেও যাচ্ছে। এদেশের সাহিত্যিকরা আজ সাধারণ পাঠকের দক্ষিণাকেই শ্রেয় ও প্রেয় মনে করেন, বড় লোকের দাক্ষিণ্য আর কামনা করেন না। সংগীতের ওস্তাদ ও শিল্পীরা অতটা জন-সাধারণের উপর নির্ভর করতে এখনো সাহস্ পাচ্ছেন না;—এখন পর্যন্ত একদিকে তাঁদের ভরসা বড় লোকের প্রতিকৃতির অর্ডার, দরবারে বা ইস্কুলে চাকরি, কিংবা এমনিতর প্রদর্শনীতে শিল্প বিক্রয়; ওস্তাদদের সম্মেলনে গাওয়া। এখনো চোখ তাঁদের বড় লোকের উপরে—তাই শিল্পীরা ছবিরও দাম করেন ইচ্ছা মতো,—কালে ভদ্রে একখানা কোনো রাজাবাহাদুরকে গছাতে পারলেই যাবে কিছু দিন। কিন্তু সস্তা দাম করলে হয়ত একটু রুচিশীল শিক্ষিত মধ্যবিত্তরা তাঁদের ক্রেতা হতে পারত। আর তা হলে সেইরূপে দেশের সাধারণ শিল্প-রুচিও একটু উন্নত হত—তাতে দর্শকও সত্যই চিত্রের মর্যাদা বুঝত। শিল্পীও তার ফলে পেতেন গুণগ্রাহী দর্শকসাধারণ। সাহিত্যের বেলা এই পরিবর্তনই এসেছে এদেশে, তাতেই সাহিত্যের সত্যই একটা প্রশস্ত সমুন্নত আসর তৈরী হয়েছে। শিল্পের বেলা শিল্পীরা সাহস করে তা তৈরী করতে না লাগলে জন-সাধারণের শিল্প-শিক্ষাও সম্ভব নয়, শিল্পেরও সত্যই স্বাধীনতা লাভ সম্ভব হবে না। তা মুখ চেয়ে থাকবে রাজা-রাজড়ার, পুরনো বড় লোকের আর নতুন বড় মানুষের।

ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপ

রাজসিক চিত্র প্রদর্শনী ছেড়ে একটি ছোট প্রদর্শনীতে গিয়ে আমরা তৃপ্তি পেলাম। প্রদর্শনীটির উদ্যোক্তা ক্যালকাটা আর্ট গ্রুপ। এবার তাঁরা ব্যবস্থা করেছিলেন শিল্পী নীরদ মজুমদারের চিত্র প্রদর্শনীর। নীরদ মজুমদার ইণ্ডিয়ান

সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রাক্তন ছাত্র—কেই বা সেই সোসাইটির ঋণ একেবারে অস্বীকার করতে পারে? কিন্তু পূর্বতন পদ্ধতির সুলভ পুনরাবৃত্তির ঝোঁক কাটিয়ে এই শিল্পী বেরিয়ে এসেছেন; শিল্পগুরু যামিনী রায়ের দৃষ্টান্তই তাঁকে এখন পথের নির্দেশ দিচ্ছে। রূপ ও রেখা নিয়ে তাঁর প্রয়াস সৃষ্টিতে সার্থক হয়ে উঠেছে কয়েকখানা চমৎকার চিত্রে। সেগুলোর প্রেরণা জীবন্ত, গতানুগতিক নয়। জীবন শিল্পীকে ছুঁয়েছে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, মন্বন্তর, মহামারী, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক দুর্দিনের কঠিন সত্য আজ সাহিত্যিকদের মতই শিল্পীদের মনকেও নাড়া দিয়েছে। তাঁরা কেউ কেউ সেই সত্যকে রূপের জালে ধরতে চাইছেন—রূপেরই সত্যে তাকে পরিণত করে,—শুধু হুবহু বাহ্য দৃশ্য হিসাবে পটে সেই বাস্তবকে চিত্রিত না করে। নীরদ মজুমদারের শিল্পেও এই কল্পনা ও রূপানুসন্ধানের রূপ পরিচয় রয়েছে। তা দেখি তাঁর "তিনটি নগ্নমূর্তিরা' সংস্থিতিতে, "কিংবা অনাথ দুঃস্থের" চিত্রে (এ চিত্রখানা পূর্বেও আমরা দেখেছি), "একটি পরিবারের" চিত্রে এবং ওরূপ আরও খানকয় চিত্রে। নাম মনে পড়ে না, কিন্তু চোখে এখনো সেই চিত্রগুলো ভাসছে। ক্যালকাটা আর্টগ্রুপ এ সব চিত্রের খানকয় একরঙা প্রতিলিপি মুদ্রিত করে ভালো করেছেন। শিল্পী নীরদ মজুমদারের ভবিষ্যৎ লক্ষণীয়—নিশ্চয়ই সাহস ও সংযমের সঙ্গে তিনি এগিয়ে যাবেন।

বনিয়াদী শিক্ষা

সম্প্রতি যে সব উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান হয়েছে তার মধ্যে ১১ই জানুয়ারী থেকে সেবাগ্রামে "হিন্দুস্থানী তালিমী সঙ্ঘের" যে অধিবেশন হয় তাকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলা চলে। সেখানে তখন "বনিয়াদী শিক্ষা" সম্মেলনের অধিবেশন হয়, তাতে বিভিন্ন প্রদেশের শতাধিক কর্মী আসেন তাঁদের জন্য শিক্ষাশিবির খোলা হয়। সঙ্ঘের সেক্রেটারি বিভিন্ন প্রদেশে "বনিয়াদী শিক্ষার" পরীক্ষা, প্রসার, ও প্রচেষ্টা বিবৃত করে ছয় বৎসরের (১৯৩৮-৪৪) রিপোর্ট দেন। বিভিন্ন প্রদেশের "তালিমী সঙ্ঘের" প্রতিনিধিরাও তাঁদের কাজের রিপোর্ট দেন—যেমন, বাঙলা দেশে ৯টি বিদ্যালয় চলেছে, ৬টি মেদিনীপুরে, ১টি ঢাকার তাজপুরে, ১টি বর্ধমানে, ১টি ফরিদপুরে রাজবাড়িতে। তা ছাড়াও নানা কমিটিতে "প্রাক্-বনিয়াদী",

"বনিয়াদী" ও "উত্তর-বনিয়াদী," তিন স্তরের শিক্ষা, এবং বয়স্কদের বিবিধ শিক্ষা বিষয় ও পদ্ধতি নিয়ে নানা আলোচনা হয়। গান্ধীজীর উপদেশ মত এই শিক্ষাকে একেবারে পল্লী-উন্নয়ন শিক্ষায় পরিণত করবার প্রস্তাব হয়েছে। সেবাগ্রামে এরূপ শিক্ষকদের শিক্ষাকেন্দ্র চলবে। নানা স্থানে শিক্ষকরা পরে শতখানেক টাকা বেতনে শিক্ষাকেন্দ্র চালাবেন, সেরূপ স্কিম হচ্ছে,—এসব সংবাদ মোটামুটি আমরা জেনেছি। তবু বোধ হয় বল্‌লে অন্যায় হবে না—সাধারণ এই শিক্ষার সম্বন্ধে আমাদের অনেকের কোনরূপ স্পষ্ট ধারণা নেই। সবাই জানি—এ-বুঝি শুধু ধরা-বাঁধা একটা গান্ধীবাদী শিক্ষা পদ্ধতি। তাই ভেবে অনেকে এই শিক্ষাপদ্ধতিকে বিচার বিশ্লেষণ না করেই সরাসরি সমর্থন করি ; আবার কেউ কেউ বিচার-বিশ্লেষণ করি না, মনে মনে একটা সংশয় পোষণ করেই নীরব থাকি। অবশ্য, শিক্ষাব্রতীরা অনেকে এই বনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি নিয়ে সত্যই চিন্তা করেছেন, তাঁরা কেউ কেউ এবার সেবাগ্রামে উপস্থিতও ছিলেন। আর গান্ধীবাদ যাঁরা জীবনের আদর্শ করেছেন, তাঁরা তো এই শিক্ষাকে গ্রহণ ও প্রসার করবেনই। কিন্তু দু'একটি মোটা কথা এই 'বনিয়াদী শিক্ষার' স্কিম সম্বন্ধেও আমরা মনে রাখতে পারি—অন্তত শিক্ষার পরিকল্পনায় বা পাঠ্য নির্ধারণে কোনো রকম গোঁড়ামি বা দৃষ্টিহীনতার চিহ্ন নেই। বনিয়াদী শিক্ষার এই স্কিম নিয়ে তাই দেশী রাজ্যগুলিও পরীক্ষা করেছে, এবং ভারত গবর্ণমেণ্টের সার্জেণ্ট বোর্ডের প্রস্তাবও মোটামুটি এই জাকির হোসেন কমিটির মূল রিপোর্টকে ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে। তবে অবশ্য কার্যক্ষেত্রে এক এক স্থানে এক এক কর্তৃপক্ষ এক এক ভাবে এই স্কিমের প্রয়োগ করবেন ; তার উপরও এই শিক্ষার সফলতা বা বিফলতা বহুলাংশে নির্ভর করবে—সেখানে হয়ত গোঁড়ামি বা আক্ষরিক নিষ্ঠা দেখাও দিতে পারে। মোটামুটি ভাবে এই স্কিমের উদ্দেশ্য বর্তমানে অনেকেই মানবেন। যথা, প্রথম কথা, সাত বছরের মত প্রথমিক, অবৈতনিক ও আবশ্যিক শিক্ষা চাই ; দ্বিতীয়ত, সে শিক্ষা হবে কাজের বা কারু বিদ্যার মারফতে, আর সে শিক্ষার সঙ্গে সমাজ ও পরিবেশের ঘনিষ্ঠ যোগ থাকাও দরকার। তৃতীয়ত, আর্থিক ভাবেও এ শিক্ষাকে স্ব-নির্ভর হতে হবে। এই তৃতীয় কথায় যাঁরা আপত্তি করেন তাঁরা আশ্বস্ত হবেন জান্‌লে যে, এই কথার মানে এ নয় যে, ছাত্রদের ফ্যাক্টরির মজুরের মত খাটিয়ে মুনাফা আদায় করা চাই। তাদের জীবিকার্জনের উপযোগী করার জন্যই এ ব্যবস্থা। অবশ্য নইলে যে টাকার অভাবেই এ শিক্ষা ব্যবস্থা ঠেকে থাক্‌বে তাও সত্য। শেষ উদ্দেশ্য—

সত্য ও অহিংসার উপর শিক্ষার ভিত্তি স্থাপন করতে হবে। এই কথায় কেউ আপত্তি করবেন না; কিন্তু অনেকেই মনে মনে বিশেষ জোর দেবেন না, এরূপ সন্দেহ হয়। কিন্তু এইটিই গান্ধীবাদের মূল কথা। তার বাস্তব উদ্দেশ্য হল দেশের সাত লক্ষ গ্রামে শিক্ষা-বিস্তার, নতুন করে তাতে জীবনী সঞ্চার, আমাদের পল্লীকেন্দ্র সভ্যতাকে বাঁচাবার জন্য পল্লীকে বাঁচিয়ে তোলা। কে তা না চায়? অবশ্য আমরা জানি, পল্লী বেঁচে উঠলে আধুনিক কালে তা ছোট ছোট সুস্থ এবং শান্ত শহরে প্রায় রূপান্তরিত হবে—যেমন হচ্ছে সেবাগ্রাম।

বনিয়াদী শিক্ষা ও তার আদি, মধ্য, অন্ত প্রভৃতি স্তর, ও শিক্ষার বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা হওয়া উচিত। মনে রাখা দরকার—শিক্ষা চাই, সমাজ ও রাষ্ট্র যতক্ষণ না বদলাচ্ছে ততক্ষণও চুপ করে থাকতে পারব না, এ বুঝেই,—এই বাস্তব অবস্থা মনে রেখেই—একটা বাস্তব ও সর্বাজনীন শিক্ষার পরিকল্পনা করতে হবে। সে পরিকল্পনা নিশ্চয়ই এ সমাজ ও তার মানুষকে আধুনিক জীবনযাত্রার উপযোগী করবে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের নতুনতম দানকে কার্যত গ্রহণ করতেও তাদের উৎসাহ দেবে, কলকারখানও অগ্রাহ্য করবে না। বাঙলা দেশে যেটুকু শিক্ষার সুযোগ ছিল, গত দু'বৎসরে তারও অনেকটা ধসে গিয়েছে; ইস্কুল, পাঠশালা কি আছে, কি নেই—তার ঠিকানাই নেই। তাই নতুন করে শিক্ষার গোড়াপত্তন করতে গেলে অনেকাংশেই যে এরূপ একটা 'বনিয়াদী শিক্ষা' এখনকার মত গ্রহণ করতে হবে, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষত, যে-সব বয়স্ক মেয়ে ও পুরুষ দুঃস্থ হয়েছে তাদের জীবনক্ষেত্রে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হলে একটা না একটা বৃত্তি-বাহন শিক্ষাই দরকার।—অবশ্য সেজন্য শিক্ষা ছাড়াও দরকার অনেক কিছুর। আর, তা ছাড়াও, এ শিক্ষাপদ্ধতিরও স্থান কাল ভেদে পরিবর্তন দরকার। কিন্তু মোটামুটি ভাবে বলতে হবে—বনিয়াদী শিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণের আরও সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করাই প্রথম প্রয়োজন। [মাঘ, ১৩৫১]

বাঙালী উর্দু কবিতা

৩১শে ডিসেম্বর, কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেত্রীত্বে উর্দু কবি হালির ত্রিংশত্তিতম স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। কবি হালি জন্মান সিপাহী বিদ্রোহের বিশ বৎসর পূর্বে ১৮৩৭ সালে; আর ১৯১৪-তে গত মহাযুদ্ধের প্রথম দিকেই তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি দেশের

এক যুগান্তর ও জাগরণ দেখে যান,—আর উত্তর ভারতে সেই নবযুগের উদ্বোধনে তাঁর দান ছিল সমধিক। উর্দু কবিতার জগতে তিনি এক নূতন যুগের সূচনা করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'মুসাদ্দস্' প্রকাশিত হয়—ইসলামের জোয়ার-ভাঁটা নিয়ে লিখিত এ কাব্য এখনও উর্দুর মহাসম্পদ—তা পাঠ করে স্যর সৈয়দ আহমদ্ খাঁ প্রভৃতি মুসলিম নবযুগের প্রবক্তারা উদ্বুদ্ধ হন—উর্দু কবিতা হালির হাতে নূতন হয়ে উঠে পুরোনো কৃত্রিম বাক্‌চাতুর্য ছেড়ে দেয়।

এ স্মৃতি-সভার আয়োজন করেছিলেন বাঙলার আঞ্জুমান-এ-তরক্কী-এ-উর্দু। এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। কারণ, আমরা বাঙালীরা অধিকাংশেই উর্দু জানি না; অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানও উর্দু জানেন না। দু'চার জন শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান যা জানেন, তাও তত গভীর নয়। কিন্তু উর্দু একটি জীবন্ত ভাষা, বিশেষত হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারের চেষ্টায় এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ্য বই যথেষ্ট রচিত হয়—অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় সে সব বই তত রচিত হয় না। তাই এ ভাষার কবি ও লেখকদের সঙ্গে পরিচয় রাখলে আমরা সব রকমেই উপকৃত হব। কিন্তু আমাদের এ পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পারেন শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানরাই। কারণ, সাধারণ বাঙালীর পক্ষে এদিকে প্রথম বাধা উর্দু বর্ণমালা; দ্বিতীয় বাধা ফারসী আরবী শব্দের প্রাচুর্য। ইচ্ছা থাক্‌লেও এ সব বাধা উত্তীর্ণ হওয়া আমাদের অনেকের পক্ষে সহজ হয় না। জানি না উর্দু কবিতা ও সাহিত্যের বাংলায় অনুবাদ সম্ভব কি না। কিন্তু মৌঃ মুজাফুর রহমান-এর ইংরেজিতে লেখা পুস্তিকায় হালির কবিতার যে নিদর্শন দেওয়া হয়েছে, তা মোটেই ভীতিপ্রদ নয়, অনুবাদের অযোগ্যও হতে পারে না। যেমন :

"তুম্ আগর্ চাহ্‌তেহো মুলক্ কি খয়ের্
না কিসি হম বতন্ কো সম্‌ঝো গৈর,
হো মুসলমান উসমে ইয়া হিন্দু
বুধ্ মজ্‌হব্ হো কেহ্ হো ব্রাহ্মো
সব্ কো মিঠি নেগাহ্ সে দেখো
সম্‌ঝো আংখুকি পুট্‌লি সবকো।"

কিংবা—

শক্তি ভি শান্তি ভি ভগ্‌তোঁ কে গীত মে হ্যায়
ধর্‌তি কে বাঁসিও কি, মুক্‌তি পিরিত মেঁ হ্যায়।

এই উর্দু ভাষা অবশ্য আমাদের পক্ষেও বোঝা সম্ভব। হয়ত পরবর্তী সময়ে উর্দু আরও ফারসী আরবীতে ভরতি হয়ে উঠেছে; যাই হোক, এ ভাষার সম্পদকে বাঙালীর নিকট সুপরিচিত করার দায়িত্ব বাঙালী মুসলমানের।

এ প্রসঙ্গে বাঙালী মুসলমান উর্দুর চর্চা করবে কি বাংলার চর্চা করবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। যা তাঁদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক, তাই তাঁরা করবেন, তাঁরা নিজেরাই দেবেন সে প্রশ্নের উত্তর;—আর সে উত্তর তাঁরা দিচ্ছেনও। শখ হিসাবে আমরা অনেক ভাষা চর্চা করতে পারি, প্রয়োজনে ইংরাজীতেও কলম পিশি—কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করতে পারি সেই ভাষায় যে ভাষায় জন্ম অবধি কথা বলি।

বিজ্ঞানের স্বরাজ

বৎসরে বৎসরে এ সময়ে যে সব সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয় তার মধ্যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন প্রধান বলে গণ্য হয়ে উঠ্‌ছে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চা ক্রমশই সুস্থ এবং জীবন-নিষ্ঠ হচ্ছে, শুধু মাত্র একাডেমিক বা ল্যাবরেটরির গবেষণার বিষয় হয়ে থাক্‌ছে না। অবশ্য 'বিজ্ঞানের স্বরাজ' এ দেশে কেন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এখনো সম্পূর্ণ লাভ হয়নি। বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কার অনেকাংশে ধনিবর্গের স্বার্থেই চলে। এদিকে আমাদের দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হবারই কথা। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় বিজ্ঞানের স্বাভাবিক বিকাশ এখানে সম্ভব হয়নি। দেশ স্বরাজলাভ করলে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকরা সত্যই একটা সুস্থ পরিবেশ পেতেন; তখন এ দেশে বিজ্ঞান স্বাভাবিক ধারায় বিকাশলাভ করতে পারত। এই চেতনাও বৈজ্ঞানিকদের মনে বেশ প্রবল ও তীব্র হয়ে আজ দেখা দিচ্ছে। অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, শান্তি-স্বরূপ ভাটনগর প্রমুখ ভারতবর্ষের যে বৈজ্ঞানিক দল ব্রিটেন হয়ে সম্প্রতি আমেরিকা গিয়েছেন তাঁদের নানা কথাবার্তা, বক্তৃতা, আলোচনায় তাঁরা এই সত্যকে বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই সে সব দেশে প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মধ্যে শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে সভাপতি হবার কথা ছিল। তাঁর লিখিত অভিভাষণ সেখানে পঠিত হয়, তা ছাড়া তিনি আমেরিকা থেকে বিশেষ সন্দেশও এই উপলক্ষে অধিবেশনে পাঠিয়েছেন। তাতে

এ দেশের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা আলোচিত হয়েছে। সভাপতি মহাশয়ের দু'একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন "ভারতের নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেতভাবে শিল্প-গবেষণা-কাউন্সিল গঠন করা উচিত।" ভারতীয় শিল্পপতিদের এ বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। "ভারতের দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে কৃষিই যথেষ্ট নয়। ভারতের যথেষ্ট সংখ্যক লোক যদি কৃষি ছেড়ে অন্য ব্যবসা অবলম্বন না করে তা হলে স্বাস্থ্যবান, উন্নত, আত্মসম্মানমূলক ভারত গঠন করা সম্ভব নয়।" কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের চেষ্টা বরাবরই এর বিপরীত—তার লক্ষ্য ভারতবর্ষ কাঁচা মালের দেশ ও বিলাতী শিল্পজাতের বাজার হয়ে থাক্। এ যুদ্ধের পরেও চার্চিল প্রমুখ ব্যক্তিদের সেরূপ চেষ্টাই প্রবল হবার কথা। স্যর শান্তিস্বরূপ প্রস্তাব করেছেন যে ব্রিটিশ পার্লামেণ্টারি কমিটির মত আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সভার সঙ্গে একটি 'বৈজ্ঞানিক কমিটি' সংযুক্ত থাকা উচিত। তা হলে আমাদের আইন সভার প্রতিনিধিরা কৃষি, শিল্প, খাদ্য, স্বাস্থ্য, টেকনোলজি সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল থাকতে পারেন, অবশ্য যদি সত্যই সদস্যদের তেমন ইচ্ছা থাকে। স্যর শান্তিস্বরূপের অন্য কথা এই, দেশ-বিদেশে বিজ্ঞানের যে উন্নতি হচ্ছে তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য ওয়াশিংটনে, লণ্ডনে এবং সম্ভবত মস্কোতে বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ রক্ষার অফিস প্রতিষ্ঠায় গভর্ণমেণ্টকে রাজী করাতে হবে। দুটি প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু বর্তমান ভারত গভর্নমেণ্ট তা কতটা গ্রহণ করবে, অন্তত মস্কোর সঙ্গে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকদের যোগাযোগে যে রাজী হবে—তা আশা করা যায় না। এ সরকার সময় মত কিছুই করতে পারে না। যুদ্ধ একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়লে এ দেশে একটি বোর্ড অব্ সায়েণ্টিফিক্ এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রীয়াল রিসার্চ গঠিত হয় সত্য, কিন্তু তারপর থেকে মার্কিন মুলুকে এবং কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকায়ও যে-তালে শিল্পোন্নতি ঘটেছে ভারতবর্ষে তার মত কিছুই ঘটেনি। বরং ও-সব দেশে এরূপ উন্নতি হওয়ায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক গবেষণার জন্য তাগিদ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে কমে গেছে। দিনের পর দিন এ দেশের যে কোন গবেষণায় বিলাতের উদ্বৃত্ত বিশেষজ্ঞ আমদানী করা চলছে। তবু এর মধ্য দিয়েও ভারতীয় শিল্প ও ভারতীয় বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে, আর শিল্পপতি ও বৈজ্ঞানিকরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন, তাতে সন্দেহ নেই। স্যর শান্তিস্বরূপ এ সব বুঝেই বলেছেন, "ভারতে জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই যে জাতীয়

উন্নতির জন্য প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।" জাতীয় সরকারের জন্য যাঁরা তাই সক্রিয়, বৈজ্ঞানিকরা বুঝতে পারছেন যে, তাঁরাও এ দেশে বিজ্ঞানেরই উন্নতির পথ তৈরী করছেন। যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে একজন ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক—জে. ডি. বার্ণেল—বলেছিলেন : Probably the best workers for Indian science today are not the scientists but the political agitators who are struggling towards this end. আমাদের বৈজ্ঞানিকদের বর্তমান প্রচেষ্টা দেখে মনে হয়, আমরা উপরের কথাটাকে একটু সংশোধন করে বলতে পারি—are also the scientists in addition to the political agitators.

গোপাল ঘোষের প্রদর্শনী

গত ১৮ই নভেম্বর সুভো ঠাকুরের ষ্টুডিও ৩-এ, এস্. আর. দাস রোডে, তরুণ শিল্পী গোপাল ঘোষের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। দুটি ঘরে সব শুদ্ধ ১০৮টি ব্রাশ ড্রইং এবং ১০ খানি রঙিন ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই ছবির মিছিলের মধ্যে এসে প্রথম দর্শনে অভিভূত হতে হয় শিল্পীর রচনা বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন আঙ্গিকের ওপর অনায়াস ও বলিষ্ঠ দখল দেখে। এই রচনা প্রাচুর্যের মূলে হয়ত আছে তাঁর সহজ শিল্পবুদ্ধি, যার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ তাঁর চিত্রগুলিকে আভামণ্ডিত করে তুলেছে। অথচ শিল্পের সাহজিক বিকাশ ও জাগ্রত সমাজ চেতনা, সুসমন্বিত হয়েছে গোপাল ঘোষের রচনা প্রতিভায়। তাঁর ব্রাশ ড্রইং-এ আঁকা ছবিগুলিই অবশ্য বেশি ভাল লাগলো। দেখলাম মানুষ এবং তার নানা ভঙ্গীর মুহূর্তগুলি, নির্ভিক ও দ্বিধাহীন রেখার গতিবেগে শক্তিমান হয়ে উঠেছে। তিনি কতগুলি ক'লকাতার রাস্তার দৃশ্য এঁকেছেন যার ভিতর নগরীর কর্ম-চাঞ্চল্য সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর আঁকা কয়েকটি জন্তুর ড্রইংও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। বিশেষ করে গত মন্বন্তরের কয়েকটি ছবি হৃদয়কে খুব গভীরভাবে নাড়া দেয়। সবদিক দিয়ে গোপাল ঘোষের আঙ্গিকের পরিচয় দিতে হলে বলতে হয় যে তাঁর চিত্রগুলি ছন্দমুখর, দ্বিধাহীন, নির্ভীক ও সংযত রেখার কতগুলি মুহূর্তের রূপায়ণ। তাঁর ছবি আঁকার ভঙ্গীর মধ্যে হয়ত কোথাও কোথাও চৈনিক শিল্পীর প্রভাব দেখতে পাই, তা হলেও, একথা স্পষ্ট যে গোপাল

বাবু একান্তভাবে ভারতীয় ও আধুনিক। সার্থক রূপ-কর্মী হিসাবে গোপাল ঘোষের ভিতর আমরা আরও বলিষ্ঠ সমাজ-চেতনা ও জাগ্রত শিল্প-প্রচেষ্টা দেখতে আশা করি। [পৌষ, ১৩৫১]

বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙালীত্ব

গত ২৬শে চৈত্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মৃতিসভা যথানিয়মে পালিত হয়। স্যার যদুনাথ সরকার সভাপতিত্ব করেন। স্যার যদুনাথ তাঁর অভিভাষণে বলেন :

"বঙ্কিম চাহিতেন বাঙ্গালীকে—বাঙ্গালী কেন সমস্ত ভারতবাসীকে সবদিকে বড় করিতে—জ্ঞান, বিজ্ঞানে, সংস্কৃতিতে, বাহুবলে ও বুদ্ধিতে, একতাবন্ধনে ও কর্ম্ম করিবার শক্তিতে, রুচি ও শুচিতায় প্রকৃত পূর্ণ মানুষ করিয়া তুলিতে—শুধু গল্প দিয়া মনোরঞ্জন করিয়া নহে। সত্য বটে বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের ঋষি। তাঁহার আনন্দমঠ আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামের বেদ বা আদিগ্রন্থ; কিন্তু তাই বলিয়া তিনি ক্ষুদ্রচেতা, কোণঠেসা একজন বিদেশ-দ্বেষী ছিলেন না। মনের সমস্ত দ্বার অবাধে খুলিয়া দিয়া আত্ম-অনুশীলন করা তাঁহার কাছে দেশদ্রোহিতা বলিয়া মনে হইত না, বরং তিনি উহাকে দেশসেবার সর্বশ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া গণ্য করিতেন।" আনন্দবাজার পত্রিকা, কলিকাতা সংস্করণ, বুধবার, ২৭শে চৈত্র, ১৩৫২।

কথা কয়টি অত্যন্ত সত্য। তবে এবারকার বৎসরে বঙ্কিম সম্পর্কে এই কথা বলা স্যার যদুনাথের পক্ষে শুধু সত্যনিষ্ঠার নয়, সাহসেরও পরিচায়ক। নানা কারণে আমাদের "অখণ্ড ভারত" প্রতিজ্ঞার সঙ্গে সঙ্গে আবার "বাঙালীয়ানার" বা বাঙালী-দর্পের বাড়াবাড়িও এ সময়ে দেখা দিয়েছে। ও-দু'টি ভাবের মধ্যে যে বিরোধ রয়েছে, তাও আমাদের চোখে পড়ে না। এ সময়ে বঙ্কিমের জাগ্রত মন, তাঁর জিজ্ঞাসা ও তাঁর প্রতিভার স্বরূপ নির্দেশ করে স্যার যদুনাথ ওরূপ মিথ্যা দর্প ও মোহ থেকে আমাদের মুক্ত করতে চেষ্টা করেছেন। এ কথা আমরা সবাই জানি, বঙ্কিম পাশ্চাত্য সাহিত্য ও চিন্তার মধ্য দিয়ে নতুন পৃথিবীর পথ দেখতে পান। অত্যন্ত দেশভক্ত বঙ্কিম নিজের দেশাভিমান ও স্বাজাত্যের টানে চাইলেন প্রাচীন ভারতীয় দর্শন ও ঐতিহ্যকে এই নতুন কালের নতুন

জীবন যাত্রার সমর্থক ও সহায়ক সত্য রূপে দাঁড় করাতে। তাঁর কৃষ্ণ চরিত্র ও অনুশীলন তত্ত্ব ব্যাখ্যায় তাঁর এই প্রবল দেশভক্তির ও প্রতিভারই পরিচয় পাওয়া যায়। তত্ত্ব হিসাবেই তা বঙ্কিমের কৃতিত্বের প্রমাণ। কিন্তু তত্ত্ব এক কথা, আর সত্য আর এক কথা। তাই তাঁর শ্রীকৃষ্ণ বা অনুশীলন আমাদের জাতি-গঠনে গ্রাহ্য হয়নি। এবং গ্রাহ্য হয় তাঁর 'বন্দেমাতরম্' বা তাঁর পরিকল্পিত সেই মাতৃরূপ। বলা বাহুল্য, এ দেশমাতা বঙ্কিমের পরিকল্পনায় ছিলেন "বঙ্গ আমার, জননী আমার"—"অখণ্ড ভারত" নয়। অবশ্য এরূপ পরিকল্পনা বিশেষ ভাবে হিন্দু-ঐতিহ্য সম্মত,—আর মুসলমান-ঐতিহ্যে অগ্রাহ্য তাও আমরা মনে মনে বুঝি। তবে তখনকার স্বাজাত্য অনেকাংশেই 'হিন্দু-স্বাজাত্য' ছিল, সে জন্য বঙ্কিমও একা দায়ী নন। কিন্তু যা বঙ্কিমের এ-দিকে কৃতিত্ব তা এই: তাঁর "বাঙালী জাতীয়তাবাদে" ও "হিন্দু স্বাজাত্যে" এরূপ সঙ্কীর্ণ "বাঙালী দর্প" বা "অখণ্ড হিন্দুস্থানী" উগ্রতা ছিল না, তাই বাঙালী বঙ্কিমের "বন্দে মাতরম্" সমস্ত ভারতবর্ষের মাতৃরূপের পরিকল্পনা বলে সহজেই ভারতবর্ষের অন্য জাতিদের দ্বারাও গ্রাহ্য হল। এমন কি, হিন্দুর পক্ষে 'বন্দেমাতরম্'কে সমস্ত পৃথিবীরই ধ্যানরূপ বলেও গ্রহণ করতে বাধা হয় না। বঙ্কিম আসলে বাঙালী ছিলেন মনেপ্রাণে, এবং বুঝেছিলেন—বাঙালীকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত দান অঙ্গীকার করেই বাঙালী হতে হবে। [বৈশাখ, ১৩৫৩]

বিক্ষোভের হিসাবনিকাশ

পাঠক মাত্রই জানেন গত ২১শে নভেম্বর, ১৯৪৫ বুধবার থেকে গত ২৩শে নভেম্বর, শুক্রবার পর্যন্ত কলিকাতার জনসাধারণের মন কতটা অশান্ত ও তাদের জীবনযাত্রা কতটা বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিল। অবশ্য মফঃস্বলের পাঠকদের পক্ষে সম্ভবত ঘটনাবলী যথাযথ বোঝা সহজে সম্ভবপর হয়নি। তার প্রধান কারণ বাঙলা দেশের সংবাদপত্র আজ সংবাদ সরবরাহ করে না, সংবাদকে ঢেলে সাজিয়ে ব্যক্তি বা দল বিশেষের প্রচারের উপযুক্ত করে তা পরিবেশন করে। কথাটি সংস্কৃতি-অনুরাগীদের পক্ষে গুরুতর। স্থানাভাবে ঘটনাবলী নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়, আর তা না করলে তর্ক-বিতর্কের অবকাশ

থাকে। তথাপি জীবন্ত সংস্কৃতির ছাত্র হিসাবে কলকাতার এই কয়দিনের ঘটনার অর্থ আমাদের সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া প্রয়োজন।

প্রথম ও প্রধান কথা অবশ্য এই যে, কলকাতার ছাত্ররা এবার যে সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন আমাদের এতদিনকার আন্দোলনের ইতিহাসেও তা অসাধারণ। নিরস্ত্র জনতার পক্ষে লাঠির বা গুলির সম্মুখে না দাঁড়াতে পারা আমরা মোটেই অস্বাভাবিক মনে করি না। তবু ভারতবর্ষের রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে। লাঠির সামনে মাথা পেতে দিয়ে, গুলির সাম্‌নে দাঁড়িয়ে থেকে এ দেশের লোক মাঝে মাঝে দেখিয়েছেন তাঁদের স্বাধীনতার প্রেরণা কত তীব্র ও সাহস কত প্রবল। পৃথিবীর অন্য দেশেও তেমন দৃষ্টান্ত সুলভ নয়। এরূপ তেজস্বীতার ফলে রাজনৈতিক সাফল্য অর্জন হয়নি বটে, কিন্তু নিশ্চয়ই রাজনৈতিক শক্তি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আরও বর্ধিত হয়েছে। ছাত্ররা বুধবার ও বৃহস্পতিবার আমাদের সেই ইতিহাসেরই আর একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। এ-জন্য তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এই ঘটনাবলীর মধ্য দিয়ে আমাদের যে সব ত্রুটি দেখা গিয়েছে, তা এই সঙ্গে পরিষ্কার করে না বুঝলে অন্যায় হবে। নিজেদের ত্রুটির কথাই আমরা বলব, পুলিসের বা সাম্রাজ্যবাদীদের মূর্খতা ও কাপুরুষতার কথা বলব না। কারণ, তারা অন্যরূপ আচরণ করলেই তা হত ব্যতিক্রম। আর তাদের এই নির্বুদ্ধিতা ও অমানুষিকতা পরোক্ষে আমাদের শক্তিকেই সুদৃঢ় করে তোলে। সেই শক্তি প্রমাণিত হবে এখন এই অত্যাচারীদের শাস্তি বিধানের স্থির ব্যবস্থায়, আর অত্যাচারের মূলোৎপাটনের বৈপ্লবিক আয়োজনে। দুইই হচ্ছে প্রধানত আমাদের দায়িত্ব। সে দায়িত্ব পালনের জন্য নিজেদের ত্রুটিগুলিও সংশোধন করা প্রয়োজন।

প্রধান ত্রুটি যা এবার দেখা গেল তা হচ্ছে দেশের নেতাদের। গত দু'তিন মাসে তাঁরা দেশের উপর দিয়ে বিক্ষোভ ও উত্তেজনার প্লাবন বইয়ে দিয়েছেন। তাঁরা কেউ অর্বাচীন নন, কাজেই এ প্লাবন পুলিসের লাঠি ও বন্দুক দেখে উদ্বেল হয়ে উঠলে তাঁদের চমকিত হওয়া সাজে না। ছাত্রদের সেদিনকার বিক্ষোভ-শোভাযাত্রা যে এত বলিষ্ঠ হতে পারল তার জন্য নেতারাও গৌরব করতে পারতেন ; আর তা যে সর্বাংশে সুনিয়ন্ত্রিত রইল না, সে দায়িত্বও নেতারা সঙ্গে সঙ্গে আংশিকভাবে গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তার পরিবর্তে নেতারা

পর নেতা বুধবার ও বৃহস্পতিবারের সমস্ত বিক্ষোভ-প্রকাশকেই 'শুধু প্ররোচকের কাণ্ড' বলে নিজেদের দায়িত্ব অস্বীকার করছেন, এবং ছাত্রসাধারণের মাথায় এক মূর্খতার ও গ্লানির বোঝা চাপিয়ে দিচ্ছেন। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাঁর বুধবারের বাণীতে গুলি বর্ষণের বিরুদ্ধে একটি কথাও বল্‌লেন না, তাতে পরোক্ষে তাই সাম্রাজ্যবাদীদের অপপ্রচারও পুষ্ট হল। তিনি বরং বল্‌লেন, প্ররোচকের খেলার পুতুল হয়েছে বুধবারের ছাত্রদল। কিন্তু পরিষ্কার কথা এই, মোটামুটি ছাত্রদের আচরণে গৌরবের জিনিসই ছিল, অগৌরবের কিছু ছিল না। এমন কি বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ পর্যন্ত কলকাতার বিক্ষুব্ধ জনতা কাণ্ডজ্ঞান হারায়নি, তখনো শহর একেবারে নানা দায়িত্বহীন লোকের হাতে গিয়ে পড়েনি। কিন্তু বুধবার থেকেই নেতাদের কণ্ঠে যে সুর ফুট্‌ল তা হচ্ছে মূল ছাত্র-বিক্ষোভকেও বিকৃত করে দেখাবার সুর, কারো ঘাড়ে দোষ চাপানোর চেষ্টা। স্বভাবতই এই সুরেরই জের দূর থেকে পরে স্বয়ং মৌলানা আজাদও টান্‌লেন, এবং স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলালও টান্‌ছেন—যেন কংগ্রেসের নির্বাচন ও "ভাবী সংগ্রামকে" ব্যর্থ করে দেবার ইচ্ছাতেই বুধবার কলকাতার ছাত্ররা মিছিল বের করেছিলেন, লাঠির সাম্‌নে মাথা নোয়াননি, গুলির সাম্‌নেও পালাননি।

সত্য বটে, বৃহস্পতিবারের অপরাহ্ণ থেকে ছাত্রদের বিক্ষোভ শেষ হয়ে সাধারণের উদ্দামতা বাড়ে; কোথাও কোথাও চ্যাংড়া ও বথাটেদের বাঁদরামোও শুরু হয়। শুক্রবারে শহরের গুণ্ডা আর বথাটেরাও এই জনবিক্ষোভের সুযোগ গ্রহণ করে, জন-উদ্দীপনার একটা বিশ্রী পরিণতিও ঘট্‌তে থাকে। তার কারণ, গোড়া থেকেই এই বিক্ষোভের ও নেতাদের পূর্ববর্তী দীপ্ত ভাষণের মধ্যেই ত্রুটি ছিল। সে ত্রুটি মৌলিক— নেতাদের সুচিন্তিত কোন প্ল্যান নেই। ছাত্র মিছিলেরও মাথায় কোনো প্ল্যান ছিল না— বাধা পাওয়াতে হঠাৎ একটা জিদ্‌ তাঁদের চেপে গেল—"লাল দীঘি।" তবু তাঁরা একটা সাময়িক উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হতে পারলেন, কিন্তু নেতারা ছাত্রদের এই কৃতিত্বটুকুও স্বীকার করতে রাজী নন। এ ত্রুটিই আমাদের নেতাদের মৌলিক —স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভকে তাঁরা সংকল্পে সুনিয়ন্ত্রিত ও কর্মধারায় সফল করতে অভ্যস্ত নন। Spontaneity'র উপর তাঁরা জন-বিক্ষোভকে ছেড়ে দেন; স্বয়ং-চালিত জন-বিক্ষোভ তাই ব্যর্থ আক্রোশে ফেটে পড়ে নিঃশেষ হয়। তখন তার শোচনীয় রূপ ও পরিণতি দেখে নেতারা অপরের ত্রুটি খুঁজতে থাকেন, ভেবে দেখেন না মৌলিক ত্রুটি কোথায়—তা রয়েছে তাঁদের নিজেদের এই

স্বতোৎসারণের, spontaneity'র উপর বিশ্বাসে, নিজেদের চিন্তাশূন্যতায়, সংগঠন শক্তির অভাবে।

বলা বাহুল্য নেতাদের এই অভ্যাস কম বেশি ছাত্রদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়। এবারের এ ঘটনাবলীতে ছাত্ররা নিজেরাও বোধ হয় বুঝতে পারছেন—বিক্ষোভ যত তীব্র ও প্রবল হোক্, তা'ই বিপ্লবের পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ নয়—বিপ্লবের জন্য চাই সংযত আয়োজন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি, সংঘবদ্ধ পরিচালনা।

শুধু মাত্র নেতাদের ত্রুটি নিয়ে বিচারে বস্‌লেও ছাত্ররা লাভবান হবেন না, বরং তাতে হয়ত নব নব উপনেতার সৃষ্টি হতে পারে। এদিকেও নেতাদের মধ্যে যে শোচনীয় অবস্থা দেখা গিয়েছে তা দেখে ছাত্ররা সাবধান হতে পারেন। প্রত্যেক নেতাই সে কয়দিনের ঘটনা সম্বন্ধে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিবৃতি দিচ্ছেন। তাঁরা অনেকে একই প্রতিষ্ঠানের (কংগ্রেসের) লোক, একই মর্মের কথাও বলছেন ('সব প্ররোচকের কাজ') ; কিন্তু তথাপি একত্র হয়ে তাঁরা একটি বিবৃতিও এক সঙ্গে প্রকাশ করতে অনিচ্ছুক। অথচ ছাত্রদের মধ্যে অন্তত এ ব্যাপারে হিন্দু মুসলমান ও বিভিন্ন রাজনীতিক মতের যুবকদের ঐক্য দেখা গিয়েছে। এমন কি, কলকাতার যানবাহনের সাহসী মজুরেরা পর্যন্ত সরল ভাবেই জানিয়েছেন এ ব্যাপারে তাঁদের ঐক্যবদ্ধ প্রতিবাদ, ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের সহমর্মিতা। সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী প্রেরণা অনিবার্যরূপে তাঁদের একত্র করেছে। ছাত্র ও মজুরদের এবার সেই সংযোগ ও একতা নিশ্চয়ই দৃঢ় করতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে নেতাদেরও বিবাদ-বিভেদ দূর করিয়ে একত্র করতে হবে। নইলে নেতারাই উপর থেকে বসে বিবাদ ও বিভেদ ঘটাবেন—এই ঐক্যবদ্ধ ছাত্র ও মজুরদের মধ্যেও। বিভিন্ন তাঁবেদার সংবাদপত্র এজন্যই বিকৃত সংবাদ জোগাচ্ছে, তা আমরা জানি। কারণ সংবাদপত্রগুলো এক-এক নেতার বা এক-একটা নেতৃ-গোষ্ঠীর প্রচার পত্র মাত্র। কেউ শ্যামাপ্রসাদবাবুর কৃতিত্ব প্রচার করে সার্থক, কেউ শরৎচন্দ্রের বীরত্ব ঘোষণায় কৃতার্থ ; অনেকেই পরস্পরের দোষ কাটাচ্ছেন স্বতন্ত্র কোনো দলের ঘাড়ে মিথ্যা দোষ চাপিয়ে দিয়ে।

কিন্তু, ছাত্ররা জানেন—প্ররোচক ছিল কি ছিল না ; আর নেতাদের এই প্ররোচক আবিষ্কারের ফলে কি প্ররোচনা প্রশ্রয় পাচ্ছে। তথাপি এই সূত্রে আমরা আমাদের যে ত্রুটি সংবন্ধে সচেতন হতে পারি তা এই—প্রথমত, স্বতোৎসারিত নীতিতে, spontaneity-তে, আন্দোলন আমাদের নেতাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছে—ছাত্রদেরও উপর তার প্রভাব পড়েছে। দ্বিতীয়ত, বৈজ্ঞানিক চিন্তা ও

সংগঠন-ক্ষমতার অভাবে নেতারা জনজাগরণ দেখলে সহজেই দ্বিধাগ্রস্ত ও বিড়ম্বিত হয়ে পড়েন। তৃতীয়ত, একই সঙ্গে বলবার মত ঐক্যও নেতারা এখনো সঞ্চয় করেননি। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখাও দরকার—নেতাদের উপরে দোষারোপ করলেই নেতৃত্ব পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে না। বরং উপনেতৃত্বের সৃষ্টি বাড়াতে পারে। চতুর্থত, বাঙলা দেশের সংবাদপত্র আজ মুনাফাদারীর দৌলতে মালিকদের মুখপত্রই শুধু হয়নি, বিশেষ বিশেষ নেতা ও উপনেতাদের স্বার্থে তা সংবাদ সাজায়, ভাঙে গড়ে, গোপন করে। তাই সংস্কৃতি-অনুরাগীর পক্ষে জনমনের ও জন-আন্দোলনের সংবাদ লাভ আজ দুঃসাধ্য হয়ে পড়ছে। অথচ,—যা সব চেয়ে বড় সত্য তা এই,—যুদ্ধের বৈপ্লবিক সম্ভাবনা আমাদের দেশেও এবার প্রকটিত হচ্ছে। তাকে বলিষ্ঠ ও সার্থক রূপ দানেই আমাদের নতুন জীবনের ও নতুন সংস্কৃতির দুয়ার খুলবে। সে জন্যই চাই ঘটনার সঙ্গে যথার্থ পরিচয়, অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ; তাতেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও সংগঠন সম্ভব। [অগ্রহায়ণ, ১৩৫২]

ইতরতার বেসাতি

কবি গোলাম কুদ্দুস লেখক ও সাংবাদিক। গত বৎসরও তিনি ছিলেন বাঙলার প্রগতি লেখক ও শিল্পীসঙ্ঘের সাধারণ সম্পাদক। ৯ই ডিসেম্বর, রবিবার, সন্ধ্যায় তিনি ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক অফিস থেকে একজন মুসলমান বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়ে আস্‌ছিলেন। লোয়ার সার্কুলার রোড্‌ ও ক্রীক্‌ রো'র সংযোগস্থলে তাঁকে কয়েকজন যুবক-ধরনের গুণ্ডা মিলে আক্রমণ করে, মারপিট করে, কুদ্দুস আহত হন। আক্রমণকারীদের অজুহাত—কুদ্দুস কমিউনিস্ট পার্টি অফিস থেকে বেরুচ্ছেন এবং কমিউনিস্টরা পূর্বদিন (শনিবার, ৮ই ডিসেম্বর) দেশপ্রিয় পার্কের আজাদ হিন্দ ফৌজ সম্পর্কিত সভার লাউড্‌ স্পীকারের তার কেটেছে।

অবশ্য কুদ্দুস একাই প্রহৃত হননি, সেদিন ঐ আফিস থেকে একা-একা যাঁরা বেরুচ্ছিলেন তাঁরা অনেকেই ঐ সন্ধ্যায় প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হন। ঐ অঞ্চল ছাড়াও কলকাতায় কালিঘাট ও হাওড়ার কমিউনিস্ট পার্টির স্থানীয় অফিস আক্রান্ত হয়। 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র পরিচালিত একটি শিশু-শিক্ষালয়ে তার একজন শিক্ষায়িত্রী আক্রান্ত হন। সোমবার, ১০ই বঙ্গবাসী কলেজেও

শুনেছি কমিউনিস্ট-ভাবাপন্ন ছাত্ররা অন্যান্য ছাত্রদের হাত থেকে কোনোরূপে লাঞ্ছনা পেতে পেতে নিষ্কৃতি পায়। অন্যত্র সর্বক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা মারধর, ইটছোঁড়া ছাড়াও যে ইতর গালাগালি প্রয়োগ করে গোয়েন্দা বিভাগের কর্মচারীদের মুখে ছাড়া তা বাঙ্‌লাদেশে অন্যত্র শোনা যায় না।* এই সব আক্রমণের ফলে যাঁরা আহত হন তাঁদের মধ্যে হিন্দু আছেন, মুসলমান আছেন, যুবক আছেন, তরুণী আছেন, হরতালী মজুর আছেন, আছেন আন্দামান-ফেরৎ সদ্য-কারামুক্ত রাজনীতিক কর্মী,—আর আছেন কুদ্দুসের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র, বাঙালী লেখক ও সাংবাদিক। সর্বক্ষেত্রেই একই ওজুহাত আক্রমণ-কারীরা ঘোষণা করে—'কমিউনিস্টরা দেশপ্রিয় পার্কের সভায় লাউড্‌ স্পীকারের তার কেটেছে'। রবিবার, ৯ই ডিসেম্বর, 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' এ-সংবাদ বিশদভাবে প্রকাশিত হয় যে, ৮ই ডিসেম্বরের সভায় সভার অন্যতম উদ্যোক্তা শ্রীমান্ অমিয়কুমার বসু সভাক্ষেত্রে ঐ কথা ঘোষণা করেছিলেন, এবং দু'জন লোককে সেরূপ অপরাধী কমিউনিস্ট বলে মঞ্চের উপর তুলে দেখিয়েছিলেনও। অতএব, যারা আক্রমণ করেছে তাদের যুক্তি বা প্ররোচনার অভাব ঘটেনি। অভাব ঘটেছিল শুধু একটি জিনিসের—সংযম ও সভ্যতার।

কিন্তু তারও পূর্বে অভাব ঘটেছে আর একটি জিনিসের—সত্যের। কারণ, ১১ই ডিসেম্বর, মঙ্গলবারের 'যুগান্তর', 'বসুমতী' প্রভৃতি কংগ্রেসী কাগজে দেখা গেল কয়েকটি চিঠি: দু'জন অভিযুক্ত লোকই জানিয়েছেন তাঁরা সম্পূর্ণ নির্দোষ। জোর করে সেদিন মঞ্চের উপর তুলে নিয়ে তাঁদের এ-ভাবে লাঞ্ছনা করা হয়, মারধরও করা হয়। তাঁরা কেউ কমিউনিস্ট নন—একজন ভবানীপুর অঞ্চলের দোকানদার; আর-একজন কংগ্রেস কর্মী, ১৯৩০-এ জেলভোগ করেন, '৪২-এ আগস্ট সংগ্রামেও' যোগদান করেন, লাঞ্ছনা ভোগ করেন (অমিয়বাবু তখন বিলাতে ব্যারিস্টারি পাশের সংগ্রাম করছিলেন)। সেই সংবাদপত্রেই সেদিনকার সভায় দু'জন ব্যাণ্ডপার্টির ভলান্টিয়ারেরও পত্র প্রকাশিত হয়। তাতে তাঁরাও প্রত্যক্ষ সাক্ষী হিসাবে জানান, নিরীহ ও নির্দোষ মানুষদেরই এভাবে লাঞ্ছিত করা হয়েছে। অবশ্য এসব পত্র 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়নি। আবার, সেদিনকার সংবাদপত্রেই দেখি পণ্ডিত জওহরলাল বড়বাজারের সভায় বলেছেন—(ক) ২১শে নবেম্বরের কলকাতার ছাত্র বিক্ষোভও কারো উস্কানিতে হয়েছিল বলে তিনি বিশ্বাস করেন না (পূর্বে শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তা উস্কানির ফল ও "জনযুদ্ধওয়ালাদের উস্কানির"ফল বলে পুনঃপুনঃ প্রচার করেন,'আনন্দবাজার পত্রিকা'

তা যথাশক্তি সাধারণের নিকট ছাপিয়ে ধরে ; মৌলানা আজাদ ১১ই তারিখের প্রেস প্রতিনিধিদের নিকট এই সত্যই আরও তীক্ষ্ণতর করে বলেছিলেন, এ প্রসঙ্গে তাও স্মরণীয়)। (খ) কমিউনিস্ট বা যে কোন দলের প্রতি আক্রমণ ও অত্যাচার করা কংগ্রেসের নীতিবিরুদ্ধ। (গ) দেশপ্রিয় পার্কের সভায় তার কাটা হয়েছিল এ কথা জওহরলালজী বিশ্বাস করেন না। বলা বাহুল্য, এ-সব কোন কথার একটি বর্ণও 'আনন্দবাজার পত্রিকায়' প্রকাশিত হয়নি।

পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে, দেশে অভাব যা ঘটেছে সে হচ্ছে সত্যের, প্রাচুর্ভাব যা হচ্ছে তা ইতরতার। তাই ইতিমধ্যে শিল্পী ও সাহিত্যিকেরা বিবৃতি দিয়েছেন; জানি না তা কোন্ কোন্ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। সংস্কৃতি-অনুরাগী হিসাবে আমরা এ-দিকে বাঙ্‌লা সংস্কৃতিবানদের মনোভাব স্পষ্টভাবেই ঘোষণা করবার দায়িত্ব বোধ করছি। কমিউনিস্টদের স্বপক্ষে এ-বিষয়ে আমরা কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। তাঁরা রজনীতিক কর্মী। হিটলার মুসোলিনীর দাপটে যাঁরা তলিয়ে যাননি তাঁরা এ-দেশের নকল হিটলারী হীনতায় অভিভূত হবেন, তা সম্ভব নয়। বিশেষত যখন জানি—গত চার মাসের ইতরতার ঝড়েও তাঁদের ৪০ হাজার সভ্যের মধ্যে ৪ জনও পার্টি ছাড়েননি,—এমনি তাঁদের আত্মপ্রত্যয় ; আর তাঁদের মেয়ে, তাঁদের মজুর, তাঁদের কর্মীদের মধ্যে রয়েছেন এমনি বহু বহু সভ্য যাঁরা ফাঁসির হুকুম, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর, সুদীর্ঘ কারাবাস,—সব অকুণ্ঠিতভাবে গ্রহণ করেছেন,—এমনি তাঁদের বিপ্লবী ঐতিহ্য। নিজেদের মতের ও পথের দাম তাঁরা এ-সময়েও পুরোপুরিই দেবেন। আর না দিতে পারলে মরবেন—সে জন্য দুঃখ করবারও কারণ দেখি না। নিজেদের নীতির হিসাব বুঝে বিপ্লবী দলের মতই তাঁরা চল্‌বেন—রক্ষা করবেন সত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার মর্যাদা।

সেই সত্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দায়েই আমরা এদেশের শিক্ষিত সাধারণের কর্তব্যও এই ইতরতার উদ্বোধনকালে স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন মনে করি। তিন বৎসর আগে ঢাকার রাস্তায় তরুণ লেখক সোমেন চন্দ ঘাতকের ছুরিকায় নিহত হন। সেদিন বাঙ্‌লা দেশের লেখক সমাজ তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের প্রেরণা নিয়ে তাঁরা অনেকে 'ফ্যাশিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ' সংগঠিত করেন। গোলাম কুদ্দুস ছিলেন তারই অন্যতম সম্পাদক, এখনও সেই প্রতিষ্ঠানের একজন পরিচালক। যে ইতরতার বেসাতি বাঙলা দেশের সাম্‌নে খুলে আজ তার নেতা-উপনেতার

দল দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করতে চেষ্টা করছে সে ইতরতাকে স্পষ্টভাবে অস্বীকার করবার দায়িত্ব আজ আমাদের—আমরা যারা কুদ্দুসের সতীর্থ বাঙলা লেখক, আমরা যারা রলাঁ-রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বকেই মানি, জানি সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইতরতার অভিযান অন্য দেশে যখন রণক্ষেত্রে নিশ্চিহ্ন হয়েছে এদেশেই তখন তা বাসা খুঁজছে সাম্রাজ্যবাদের বিকৃত পরিবেশে।

সংস্কৃতির সৈনিক হিসাবে আজ আমাদের আবার ডাক পড়ল; নতুন করে আমরা শপথ নিচ্ছি প্রত্যেকে—I WILL NOT REST.

সেই সৈনিক হিসাবেই আমাদের তাই লক্ষ্য রাখতে হবে কয়েকটি দিকে:

প্রথমত, যুদ্ধান্তে বিপ্লবী-চেতনাকে এদেশে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী খাত থেকে সাম্যবাদ-বিরোধী খাতে চালিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে। এটাতে এ-দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সমান স্বার্থ। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সেই চক্রান্তে জেনে না-জেনে যোগ দিচ্ছে ইতরতার ব্যবসায়ীরা। সংস্কৃতির সৈনিক হিসাবে আমাদের প্রথম দায়িত্ব—ভারতের বিপ্লব-মুখী জনতাকে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী খাতে রেখে তীব্রতর করে তোলা, বিপ্লবকে স্বাগত করা।

দ্বিতীয়ত, এই ইতরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে আমাদের পথ হবে কি? এক, দেশের নেতাদের নিকট ঘটনা-সত্য বিবৃত করে তাঁদের শুভ চেতনা প্রবুদ্ধ করা। দুই, দেশের জনশক্তিকে,—মজুরকে, কৃষককে, শিক্ষিত দরিদ্রকে এই ইতরতার বিরুদ্ধে আরও সচেতন, আরও সংগঠিত, আরও সক্রিয় করে তোলা। তিন, জাতির শিক্ষা-দীক্ষা ও বিবেক-বুদ্ধির সংরক্ষক হিসাবে লেখক শিল্পী বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল সংস্কৃতি-কর্মীকে এই সংগ্রামের সৈনিকরূপে প্রস্তুত করা।

কাজটা সহজ বা বিপদশূন্য নয়। আততায়ীর ছুরিকা সোমেন চন্দকে খুন করেই থামেনি। গেলাম কুদ্দুসকে আঘাত করেও তা থামবে এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। তাই প্রমাণ করতে হবে—সোমেন চন্দের জাত শুধু লেখে না, মরতেও জানে।

"কাশ্মীর চিত্রাবলী"

শীত আরম্ভ হতেই কলিকাতায় দু'একটি শিল্প-প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছে। দিলীপ দাশ গুপ্তের আঁকা কাশ্মীর চিত্রের প্রদর্শনী তার মধ্যে প্রধান। ২৫শে নভেম্বর থেকে ৯ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সে প্রদর্শনী চলে। আর্ট স্কুলের অভ্যন্তরস্থ সার্ভিস্ আর্টস্ ক্লাবের উদ্যোগে ক্লাবের গৃহে প্রদর্শনী বসেছিল।

দিলীপ দাশগুপ্ত বয়সে তরুণ হলেও আমাদের শিল্পীসমাজে অপরিচিত নন। তাঁর একাধিক চিত্র পূর্ব পূর্ব প্রদর্শনীতে প্রশংসা পেয়েছে, পুরস্কার লাভও করেছে। বৎসর তিন আগে চৌরঙ্গীতে একটি শিল্প সমিতির উদ্যোগে তাঁর নিজস্ব একটি চিত্র-প্রদর্শনীও হয়েছিল। তাতে তাঁর অঙ্কিত মালয়ের মানুষ ও প্রাকৃতিক দৃশ্য, পোর্ট্রেট ও ল্যাণ্ডস্কেপ, অয়েল ও ওয়াটারকলার, এবং জয়পুর রাজপুতানার দৃশ্যাবলী অনেকেরই মনে আশার সঞ্চার করে। তার পরে যুদ্ধের বাজারে শিল্পীদের পক্ষে শিল্পোপকরণও দুষ্প্রাপ্য হয়ে ওঠে; দিলীপ দাশগুপ্ত সার্ভিস আর্টস্ ক্লাবে সম্পাদক ও শিক্ষকরূপে শিল্প-সেবায় সময় কাটাতে বাধ্য হন। এই সময়ে তাঁর অঙ্কিত নূতন চিত্র আর বেশি সাধারণে দেখতে পায়নি। এবার দিলীপবাবু তাঁর সঞ্চিত শক্তি ও বিকশিত দৃষ্টির প্রমাণ নিয়ে আবার উপস্থিত হওয়াতে স্বভাবতই শিল্পানুরাগীরা বিশেষ আশ্বস্ত হয়েছেন।

তিন সপ্তাহের ছুটিতে কাশ্মীর গিয়ে শিল্পী খান ৬০ ছবি আঁকবার সুযোগ পান। তিন সপ্তাহের অনেকটা সময় চলে যায় বৃষ্টি বাদলে, তখন তিনি কাশ্মীর দেখবার ও ছবি আঁকবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন। তারপরে অল্প কয়দিনে তিনি এঁকে চলেন মোট খান ৬০ ছবি—তার ৪০ খানা তিনি এই প্রাদর্শনীতে দিয়েছেন। খান ১০ পোর্ট্রেট্; বাকী বেশির ভাগ ওয়াটারকলারে আঁকা কাশ্মীরের দৃশ্য, শ্রীনগরের বাড়িঘর, পথ ঘাট, দোকানপাট; আর দু'খানা স্প্যাচুলা। বহুচিত্রের ভিড় নেই বলে দেখা যেমন সুখকর হয়েছে তেমনি এই প্রদর্শনীর চিত্রাবলী দেখে শিল্পরসিকেরা আনন্দলাভ করেছেন।

পোর্ট্রেটের মধ্যে ১নং চিত্র 'বৃদ্ধ মাঝি' সকলকে প্রথম থেকেই আকৃষ্ট করে। আরও খান দুই তিন পোর্ট্রেট্‌কেও প্রথম শ্রেণীর বলা চলে। তা ছাড়া মোটামুটি সব কয়টি প্রতিকৃতিতেই শক্তির প্রমাণ রয়েছে। 'বৃদ্ধ মাঝি'ই শিল্পীর কাশ্মীরে আঁকা প্রথম ছবি! মনে হয় স্বভাবতই শিল্পীর মনের আশা ও আগ্রহ

তাতে উৎসারিত হয়ে পড়েছিল। দর্শকও তাকে সহজভাবেই প্রথম স্থান দিতে অসুবিধা বোধ করেন না।

ওয়াটারকলারের আঁকা দৃশ্যগুলিও চমৎকার। যাঁরা শ্রীনগর-কাশ্মীর দেখেছেন তাঁরা এসব চিত্র দেখে বিশেষ উৎফুল্ল হন। কিন্তু সকলেরই প্রথমে চোখে পড়ে এ চিত্রাবলীর এক উজ্জ্বল স্বচ্ছতা। সাধারণত আমাদের শিল্পীদের এদিকে এতটা দৃষ্টি ও প্রকাশ-কুশলতা দেখা যায় না। অথচ আমাদের দেশের আকাশ রোদে ভরা, উজ্জ্বল; বিলাতের আকাশের মত তা মেঘে ঢাকা গোমড়া নয়। বিলাতী ল্যাণ্ডস্কেপ নিদর্শনের ছায়াবাহুল্য আমাদের শিল্পীদের মন ও মেজাজের উপর ছায়াপাত করে কিনা জানি না। নইলে স্বভাবত আমাদের শিল্পীদের মন এদেশের প্রাকৃতিক প্রভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠবার কথা, আর তাঁদের চিত্রাঙ্কনেও প্রকাশ পাবার সম্ভাবনা উজ্জ্বল স্বচ্ছতা। দিলীপ দাশগুপ্তের ছবিতে এই স্বাভাবিক সত্যেরই আবির্ভাব দেখতে পাই।

কিন্তু সব চেয়ে এ চিত্রাবলীতে যা দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করে তা শিল্পীর অঙ্কিত তুষারাবৃত পাহাড়ের দৃশ্যাবলী। এরূপ খান সাত-আট বরফঢাকা দৃশ্য প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হয়েছে (১৫নং ও ৩৫নং থেকে ৪০নং পর্যন্ত চিত্রাবলী)। প্রত্যেকটিই অতি চমৎকার। খিলিনমার্গ থেকে দেখা তুষারদৃশ্য (৩৮নং) কিংবা গুলমার্গ (৩৭নং) কিংবা চন্দন-ওআড়ির তুষারসেতু (৩৯নং)—এক-একটি এক একজনকে বিশেষভাবে বিমুগ্ধ করে। একজন বিলাতী শিল্পীর কথায় বোধ হয় এই বরফ-ঢাকা দৃশ্য-চিত্রগুলির ভালো পরিচয় লাভ করা যায়। দেখতে দেখতে তিনি বলেন, "আমার যেন শীত করছে।" গরমের দেশের শিল্পী বরফের দেশের শিল্পরসিককেও যখন এভাবে নাড়া দিতে পারেন, তখন বুঝতে পারি তাঁর সৃষ্টি কতটা উত্তীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু একটি বিশেষ ধরনের কাজের জন্য দিলীপ দাশগুপ্ত আমাদের শিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত এখনো একক। তা তাঁর স্প্যাচুলার কাজ। সে-সব কাজের নিদর্শন এই প্রদর্শনীতে ছিল; 'ঝিলম্ নদী' (১৩ নং চিত্র) এইটিই তাঁর এবারকার প্রদর্শনীর সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন; আর বোধ হয় তা সর্ববাদিসম্মত। আগেও শিল্পী এদিকে কাজ করেছেন; তাতেও তাঁর শক্তির পরিচয় ছিল। কিন্তু 'ঝিলম্ নদী'তে তিনি আরও উৎকর্ষ দেখিয়েছেন।

এই ছোট প্রদর্শনী দেখে সন্দেহমাত্র থাকে না দিলীপ দাশগুপ্ত শিল্পী হিসাবে একটা সুনির্ভর ক্ষেত্রে সমুত্তীর্ণ হয়েছেন। তাঁর দৈহিক (কৈশোরে

দুরন্ত ব্যাধির ফলে তাঁর একটি হাত ও একটি পা ছেদন করতে হয়) বা আর্থিক কোনো বাধাই তাঁর শিল্পশক্তি ও শিল্পীমনকে ব্যাহত করতে পারবে না।

ভালো প্রতিলিপি মুদ্রিত করে না দিলে শুধু মাত্র লিখে কোনো চিত্রকলার স্বরূপ বুঝানো প্রায় দুঃসাধ্য। লেখার মধ্য দিয়ে আমরা গুণগ্রাহী দর্শকদের এদিকে আগ্রহ জাগাতে চেষ্টা করতে পারি। সে জন্যই শিল্পীদের কাছ থেকেও আমরা দাবি করি—আরও প্রদর্শনী ও যথাসম্ভব চিত্রের দাম কম করা, যাতে সাধারণ মধ্যবিত্তও চিত্রকলার আদর করতে উৎসাহ পান। কিন্তু দেশের সাময়িকপত্রগুলোর কাছ থেকে আরও একটু সহানুভূতি নিশ্চয়ই সকলে প্রত্যাশা করেন। এই প্রদর্শনীর সংবাদটুকুও প্রায় কোনো দেশীয় সংবাদপত্রে ভালো করে প্রকাশিত হয়নি; প্রদর্শিত চিত্রের কোনো সমালোচনা বা প্রতিলিপি প্রকাশ তো এই সংবাদপত্র-জগতের চিত্রে-বাক্যে প্রলাপ-প্রশস্তির মধ্যে পাওয়াই যায়নি। তথাপি এ সময়েও অবশ্য আমাদের সংবাদপত্র শিল্প ও সংস্কৃতির সংবাদ ও চিত্র প্রকাশ করবেন—হয়ত তা করবেন বিলাতী ও দেশী কর্তাদের হাতে কোনো লেখা বা ছবি সার্টিফিকেট পেলে পর, তার।
[পৌষ, ১৩৫১]

ভাষার ভিত্তিতে ভারত গঠন

রাজনৈতিক দৃষ্টিতে মন্ত্রী-মিশনের সুপারিশ নিয়ে আলোচনা না করেও (করা অবশ্য অন্যায় নয়) একটি কথা আমরা সেই প্রস্তাবের আলোচনায় স্মরণ করতে বাধ্য হচ্ছি। ভাষার ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলেকাকে একত্রিত করার যে-কথা কংগ্রেস মাঝে মাঝে উত্থাপন করেছিল তা কি কংগ্রেস ত্যাগ করতে বাধ্য হল? কারণ, মন্ত্রী-মিশনের সুপারিশে তার বিন্দুমাত্রও উল্লেখ নেই। বরং যে ভাবে ভারতবর্ষকে জোট্ বাঁধাবার নির্দেশ তাঁরা দিয়েছেন তাতে ভাষা যে জাতি-গঠনে বা সঙ্ঘ-গঠনে গণনীয় জিনিস তা-ই মনে হয় না। অথচ আমরা বুঝি, জাতির একটা বড় বন্ধনই ভাষার বন্ধন; আর জাতীয় সংস্কৃতির যত বিকাশ যে দিকে ঘটুক ভাষাই হল সংস্কৃতির প্রধানতম বাহন। তাই, শ্রীহট্ট, ও মানভূমের বাঙালীদের, আর কাছাড়ের পূর্ণিয়ার সিংহভূমের বাঙলাভাষী অঞ্চলকে বাঙলায় প্রবেশের অধিকার না দিলে 'বঙ্গভঙ্গ' শেষ হয়

না। পরিকল্পিত ব্যবস্থায় বিহারের মধ্য থেকে সে-সব অঞ্চলে বাঙালীরা নিজেদের বিহারী বলেই পরিচয় দিতে বাধ্য হবে। জিনিসটা সহজ হবে না। অথচ বিহারের পিছনে নিখিল ভারতীয় রাজনৈতিক কর্তৃপক্ষের যতই শুভেচ্ছা থাক, "বিহার"বাসী বাঙালীরা সহজে এই পরিচয় স্বীকার করে নিতে পারবে না। অবশ্য শ্রীহট্ট হয়ত বাঙলায় আসবে, কাছাড় গোয়ালপাড়াও নিজেদের মত নিজেরা ঠিক করবে। কিন্তু অসমিয়াদের জোর করে বাঙলার সঙ্গে এই জোট বাঁধতে বাধ্য করলে নিশ্চয়ই তাঁদের এদিকে বিরোধিতা বাড়িয়ে তোলা হবে। না হলে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণে অসমিয়ারা যতই বাঙালী-বিরোধী হোন্, বাঙালীর সঙ্গে তাঁদের সংস্কৃতি-গত মিল খুবই বেশি। নিজের ইচ্ছায় জোট-বাঁধবার অধিকার পেলে হয়ত পূর্বভারতে বাঙালী, অসমিয়া, ওড়িয়া সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে একদিন মিলিত হতে পারে। কিন্তু তার পূর্বে চাই তাদের ভাষার ভিত্তিতে প্রত্যেকের স্বতন্ত্র জীবন-প্রতিষ্ঠার অধিকার। মন্ত্রী-মিশন সে অধিকার মানে না। কিন্তু কংগ্রেসও যদি ভাষার ভিত্তিতে অঞ্চল পুনর্গঠনের নীতি ছেড়ে দেয়, তা হলে নিশ্চয়ই ভারতবর্ষে অন্ধ্র, কেরল, কর্ণাটক, মারাঠী, বাঙালী প্রভৃতি জাতি ও তাদের সংস্কৃতির বিকাশের পক্ষে বাধা থেকে যাবে।

দুর্ভিক্ষের রূপ

'ছায়া পূর্বগামিনী'। কিন্তু দুর্ভিক্ষের শুধু ছায়া নয়, দুর্ভিক্ষই আবার এসে যাচ্ছে। কারণ, একে এবার ফসল ফলছে কম; তাতে ভারতবর্ষ জোড়া দুর্ভিক্ষ, আর পৃথিবীরও বহু দেশে নিদারুণ খাদ্যাভাব। তাই বাইরে থেকে খাদ্য বাঙলা দেশ এবার বেশি আশাও করতে পারে না। আর ঘরের ভেতরে বাঙলা দেশের জনসাধারণের মধ্যেও বিভেদ এখন বেশি। কাজেই দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তিও এখন আমাদের আরও কম। কারণ, ইতিমধ্যে, ১৩৫০'র কোনো ক্ষতই শুকায়নি; কোনো ক্ষতিই প্রায় পূরণ হয়নি। বাঙলার মত জমিদার-তন্ত্রী দেশের যে মূলগত আর্থিক-সামাজিক অসঙ্গতির জন্য দুর্ভিক্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে তার সেই মৌলিক আর্থিক সুবিন্যাসের কোনো পথই তৈরী হয়নি। বরং সেই গেঁজে-ওঠা সমাজের বুকে ফেঁপে উঠেছে গ্রামে ও শহরে জোতদার মজুতদার চোরাকারবারী ও চোরা-কর্মচারী। এসব

যে মন-গড়া কথা নয়, তা দুর্ভিক্ষ-কমিশনের রিপোর্ট থেকেও প্রমাণিত হয়। আরও প্রমাণিত হয় সম্প্রতি প্রকাশিত অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ ও ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত রাশি-বৈজ্ঞানিক গবেষকদের একটি রিপোর্ট থেকে। তা বিশদভাবে সকলেরই আলোচ্য—এখানে শুধু তার সার সিদ্ধান্ত উদ্ধৃত করছি :

"১৯৩৯ সালের জানুয়ারী হইতে ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের পূর্বের যুগ। ইহার ভিতরেও কিন্তু বেশি লোকেরই অবস্থা খারাপ হইয়াছে। অনেকে নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছেন। যাঁহাদের অবস্থা ভাল হইয়াছে, তাঁহারা অনুপাতে কম। ইহাতেই প্রমাণ হইয়া যাইবে যে দুর্ভিক্ষ আসিবার পূর্ব হইতেই লোকের অবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। দুর্ভিক্ষের সময় শুধু তাহারই চূড়ান্ত পরিণতি ঘটিল।

"দুর্ভিক্ষের ভিতর লোকের অবস্থা অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বদলাইতে লাগিল। পূর্বে যে হারে অল্প কিছু লোকের অবস্থা ভাল হইতেছিল এখন তাহাদের অবস্থা হয়তো দ্বিগুণ তাড়াতাড়ি ভাল হইতে লাগিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি সর্বনাশের কথাও দেখিতে হইবে। তিনগুণ তাড়াতাড়ি লোকের অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। আগেকার চেয়ে বারগুণ তাড়াতাড়ি লোকে নিঃস্ব হইতে লাগিল।

"এখন তাহা হইলে ছবিটি পরিষ্কার দেখা যাইতেছে। দুর্ভিক্ষের সর্বনাশা নাগপাশ কোন কোন অঞ্চলকে ছারখার করিয়া দিয়া গিয়াছে। কোথাও বা তাহার ধমকটা তত হয় নাই। আবার অন্য কোথাও হয় ত তাহারও চেয়ে কম হইয়াছে। ইহাতেই প্রমাণ হইয়া যায় যে, সাধারণ অবস্থাতেও দেশের এক এক স্থানের আর্থিক অবস্থা ছিল এক এক রকম। দুর্ভিক্ষের সময় সেই বৈষম্যটা বাড়িয়া গিয়াছিল। দেশের যাঁহারা সবচেয়ে গরীব সেই ভূমিহীন মজুরের দল, সেই মৎস্যজীবী সম্প্রদায় ও গ্রামের সেই শিল্পীরাই এ সময়ে সবচেয়ে কষ্ট পাইয়াছেন। তাঁহাদের অনেকে নিঃস্ব হইয়া গিয়াছেন। যাঁহারা মাঝামাঝি দরের লোক, যাঁহাদের কিছু জমি ও অন্য দু'এক ছিটা সঞ্চিত কিছু ছিল, তাঁহারা কিছুক্ষণ যুঝিতে পারিয়াছেন। উপরের দিকের লোকদের বিশেষ কিছুই হয় নাই। এই তালে তাঁহাদের কেহ কেহ অবস্থা ফিরাইয়া লইয়াছেন। দুর্ভিক্ষের সময় (১৯৪৩-এর জানুয়ারী হইতে '৪৪-এর মে পর্যন্ত) এই উত্থান-পতনটাই আরও দ্রুতভাবে হইয়াছে। তাই ঠিকভাবে দেখিলে, '৪৩ সালের দুর্ভিক্ষ ভূমিকম্পের মত একটা আকস্মিক দুর্যোগ নয়। সাধারণ অবস্থাতেও যে অর্থ-

নৈতিক পরিবর্ত্তনের খেলা চলিতেছিল, ইহা তাহারই পরিণতি।" ("স্বাধীনতা"র অনুবাদ হইতে উদ্ধৃত)

এ পরিণতি স্বাভাবিক বটে, কিন্তু সাঙ্ঘাতিক। বাঙলার সমাজ ও সংস্কৃতি ১৯৪৩-এ বেঁকে চুরে গিয়েছে। দুর্ভিক্ষের এই বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ থেকে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, (১) এ দেশে জমিদারীতন্ত্র থাকলে দুর্ভিক্ষ ক্রমেই "চিরস্থায়ী" হবে ; এবং (২) দুর্ভিক্ষের ফলেও বাঙলার গত দেড় শ' বৎসরের সমাজ ও সভ্যতায় বিপর্যয় ঘটেছে। [জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৩]

বাঙলা ফিল্‌ম-এর গতি

ফিল্‌ম বা বাক্‌চিত্র হচ্ছে পৃথিবীর প্রধান এক লোকশিল্প।

বাঙলা ফিল্‌ম-এর কথাই বিশেষ ভাবে আমাদের ভাবনীয়। কারণ ফিল্‌ম-এর বাক্‌চিত্রের আবির্ভাবের পরে ফিল্‌ম-এর জগতে ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ স্বীকৃত হতে বাধ্য। বাঙালীর ফিল্‌ম হবে এখন থেকে বাঙলা বাক্‌চিত্র। অবশ্য, এ কথাও প্রায় স্বতঃসিদ্ধ ইংরেজি বাক্‌চিত্র (বেশির ভাগই তা মার্কিন), হিন্দুস্তানী বাক্‌চিত্র এসবও আমরা দেখি, বাঙলা ফিল্‌ম তাদের সঙ্গেও নাড়ীতে বাঁধা,—ব্যবসায় সূত্রেও বটে, টেক্‌নিকের নানা সূত্রেও বটে, আর ভাবের সূত্রেও বটে। পৃথিবীর কোনো 'জাতীয় সৃষ্টিই' অন্য জাতির সৃষ্টিকে একেবারে অস্বীকার করে আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ হয় না।

তা ছাড়া, রূপমঞ্চের সঙ্গে আবার সব দেশেই নাট্যমঞ্চের সম্পর্কও ঘনিষ্ঠ ; বাঙলায়ও তা আছে, তা স্মরণীয়।

এ কথা স্বীকার করতেই হবে, এই বাঙলা ফিল্‌ম-এর জগতে হঠাৎ 'উদয়ের পথে' এল এক বহু-প্রতীক্ষিত আত্মীয়ের মত। এক মুহূর্তে বাঙালী জগৎ, আর পরে ভারতীয় জগৎ, তাকে স্বাগত করলে। কারণটা তার কি, সার্থকতা তার কোথায়, এবং কি পরিমাণে? এ প্রশ্নটি তখন আলোচনা করেছিলেন (আশ্বিন, ১৩৫১-এর 'পরিচয়ে')) শ্রীযুক্ত রঙ্গীন হালদার। এখানে বাঙলা ফিল্‌ম-এর চলতি হিসাবে তা পূর্বাপর উদ্ধৃত হল :

"চলচ্চিত্র দেখা ছেড়েই দিয়েছিলাম ; কিন্তু সেদিন 'উদয়ের পথে' ছবিখানি দেখে খুশি হয়েছি। এরকম দেশী ছবি ত আর দেখিনি।

"প্রথমেই বলা দরকার যে ছবির টেক্‌নিক্ পুরাতন ধরনের। চলচ্চিত্র এখনও এদেশে রঙ্গমঞ্চের টেক্‌নিক্ই অবলম্বন করে রয়েছে। সুতরাং সংলাপই তার প্রধান উপজীব্য; নূতন টেক্‌নিক আবিষ্কার করতে হলে আইসেনস্টাইন জাতীয় প্রতিভার দরকার; আর দরকার সিনেমা-শিল্পেও শিল্পগত উন্নতি।

"ছবিখানির বৈশিষ্ট্য তবু আছে। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য গতি। প্রথম থেকেই ঘটনাপ্রবাহ আখ্যানবস্তুকে এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির দিকে প্রবল বেগে টেনে নিয়ে চলে। সংলাপের মধ্যে এমন action বোধ হয় এক 'ষোড়শী' ছাড়া অন্য কোনো নাটকে দেখিনি।

"ছবিখানির theme'ও পুরাতন; নেহাৎ রোমান্টিক। আমাদের দেশে উপকথা থেকে শুরু করে নভেল নাটকে সকল ক্ষেত্রেই এ-রকমের গল্প দেখা যায়। রাজকন্যা মাল্যদান করেন বীর যোদ্ধাকে অথবা কবিশেখরকে। এ ধরনের স্বপ্ন দেখে মন্দভাগ্য লেখক বা কর্মচারীরা এক রকমের সুখ পায়। 'উদয়ের পথে'র মূল গল্পও তা'ই: বুর্জোয়া-কন্যা বরমাল্য দিচ্ছে লেখক ও ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী অনুপকে। নতুন কালের লেখকেরা ও দর্শকেরা নিজেদের ইচ্ছাপূরণের পথ খুঁজছেন পুরাতন ধারায়। স্বপ্নরাজ্যে তারা অসম্ভবকে সম্ভব করে নিজেদেরই বাস্তব ক্ষেত্রে বঞ্চিত করেন। অবশ্য এ রোমান্টিকতার ব্যাধি এ কালের লেখকদেরও বোধহয় আর টিঁকবে না। শ্রমিককর্মীদের তো তা জন্মাতেই পারে না, তা বলাই বাহুল্য।

"ছবিখানির আখ্যানবস্তু শ্রেণীবৈষমের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে, তাই আশা করেছিলুম বাস্তব কিছু দেখব। সেদিকেও একেবারে নিরাশ হইনি। রোমান্সের ফাঁকে ফাঁকে জীবনের প্রতিচ্ছবি সব সময়েই দেখা গেছে। সে-জীবনকে কিরূপে মহত্তর জীবনে পরিণত করা যায় তারও আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। অথচ কোথাও প্রচারের গন্ধ পাওয়া যায়নি। মোট কথা, নব-জীবন-বোধই এই ছবিখানির মূল প্রেরণা, তা সত্য।

"ধনিকের কন্যা গোপা তার নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীর বন্ধু সুমিতাকে ভাইঝির জন্মদিনে নিমন্ত্রণ করতে এসে সুমিতার দাদা অনুপের ঘর দেখে বিস্মিত হল। সেখানে দেয়ালের গায়ে আঁকা রয়েছে ভারতের দেশপ্রেমিক মনীষীদের রেখাচিত্র গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র। আর অনুপের তক্তাপোশের ঠিক শিয়রের দিকে রয়েছে একটি মাত্র বিদেশীর রেখাচিত্র—কার্ল মার্কস্। প্রযোজক এর বেশি আর কিছু বলেননি। তবু দর্শকরা বুঝে নিলেন নায়ক কোন পথের পথিক।

"অনুপ ও গোপা দুই জগতের মানুষ,—শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মত সন্ধ্যাতেই তাদের পরিচয়। তবু গোপার গান শুনেই অনুপের শিল্পীমন গোপার আর্কষণ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠ্‌ল। এখানেই গল্পের একটা মোড়। প্রযোজক বিশেষ করে বিজ্ঞাপিত না করলেও বুঝতে পারা যায় যে, অনুপ শুধু মননশীল কর্মী নয়, সে একজন রসজ্ঞ শিল্পী। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় যে হতে পারত একজন সাহিত্যস্রষ্টা তাকে বর্তমান অবস্থায় হতে হল একজন সমাজকর্মী।

"আসলে, লেখকের ও প্রযোজকের হয়ত ট্রেড-ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই; মজুরদের জীবনের বাস্তব চিত্র তাই এ-ছবিতে নেই। মজুরদের সভায় রজনীগন্ধা ফুল থাকে না; যদিও গল্পের জন্য রজনীগন্ধা দরকার। দেয়ালেও নাৎসি-প্রতীক স্বস্তিক থাকে না। অম্বিকা এতগুলি মজুরের সামনে অনুপই যে এ-আন্দোলনের মূল তা মিলের মালিককে নিশ্চয়ই বলত না। মালিক ও মালিক-কন্যার কৃপায় শ্রমিক-সমস্যা মিটছে, তারা 'গোপা দেবী কী জয়,' বলে কৃতার্থ হচ্ছে, এ দেখলে মজুরেরা হাস্য সম্বরণ করতে পারে না। এ অসঙ্গতি যে দর্শকের সহ্য হয়, তার কারণ দর্শকেরা মজুর নয়, কর্মচারী। তারা এদেশের ব্যাংকের কেরানী, ইনসিওরেন্সের কর্মচারী, যারা আপিসের মুনিবদেরই দেখে, কলকারখানার মালিককে দেখে না।

• শুধু মজুরদের জীবনের চিত্র নয়, বিলাত-ফেরত সমাজেরও চিত্র বাস্তব হয়ে উঠেনি। এই বিলাত-ফেরত সমাজের কোনো মূল নেই সত্য; তারা স্বদেশী সমাজের সব কিছুই অবজ্ঞা করে, অথচ বিলাতী সমাজ গড়বার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা বৈঠকখানা ভেঙ্গে ফেলে, অথচ বিলাতী ড্রইং রুমও গড়তে পারে না। দামী বিলাতী ছবি কিনবার মতো অর্থ ও রসজ্ঞান তাদের নেই। তাই তারা কুমারটুলীর বুদ্ধমূর্তি ড্রইং রুমের dummy fireplace-এর উপর রেখে সিগারেটের ধোঁয়ায় তার অর্চনা করে, আর নটরাজের মূর্তির সামনে নৃত্য করে 'oriental' হয়। এক কথায়, সে এক কিম্ভূতকিমার, অসমঞ্জস জীবন, এবং তা দেখলে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। তবু সে-জীবনও বাস্তব। এতবড় ইঙ্গ-বঙ্গ অভিজাত পরিবারের বধূ রমা আরও মার্জিত, আরও ইংরেজীভাষিণী হলে বাস্তব বলে মনে হত। বিভাসের বাঁদরামিও যেন স্বেচ্ছাকৃত; এ বাঁদরামি যদি তার চরিত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ হত তবে ছবিখানির মূল্য আরও বেড়ে যেত। যাকে খেলো করতে হবে তারও একটা বাস্তব রূপ দেওয়া দরকার। ব্রজেন্দ্রনাথের

চরিত্রও ঠিক capitalist-এর চরিত্র হয়নি। প্রেম যদি dividend না দেয় তবে তারও কোনো মূল্য নেই capitalist-এর কাছে। কঠোরতার আবরণে এতখানি স্নেহপ্রবণ মন শুধু feudal lord-এর সম্ভব। এ যেন মনে হয় আধুনিকতার আবেষ্টনে তারাশঙ্করের কোনো জমিদার চরিত্র।

"দেখা গেল, ফুটেছে সবচেয়ে সত্য হয়ে নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন—অনুপের গৃহস্থালি, তার মায়ের স্নেহ, বোনের ভালোবাসা। আর নিম্ন মধ্যবিত্তই যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এক প্রকার বঞ্চিত, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই বঞ্চিত নিম্ন মধ্যবিত্তদের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি স্বাভাবিক,—দর্শকেরাও প্রায়ই নিম্ন মধ্যবিত্ত। ছবিখানির সাফল্যের একটি প্রধান কারণও তা'ই, তা ভুললে চলবে না।

"ধনিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভটা এক্ষেত্রে শ্রমিক সঙ্ঘর্ষ নয়, বঞ্চিত মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ। কিন্তু একটি কথা এই জন্যই আজ আমাদের মনে রাখতে হবে বেশি। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তরা আজ আর মধ্যবিত্ত নেই; আমরা মেয়ে-পুরুষে আজ রোজগার করছি, তবু বাঁচতে পারছি না। জীবনযাত্রায় আমরা বঞ্চিতের দলে। কিন্তু অনেক কালের 'ভদ্রলোকের' দেমাক তবু আমাদের মনে। তাই ভদ্র-লোকের খোলসটা সম্বল করে থাকি, মালিকের মুখে ভদ্রলোকের মুখোশ দেখলেও বেঁচে যাই। অথচ জীবনক্ষেত্রে সত্যই আমরা শ্রমিক শ্রেণীর সগোত্র। তাদের সঙ্গেই আমাদের বন্ধন দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এই কথাটা আমাদেরও বোঝা চাই—আমাদের শিল্পী আর লেখকদেরও। তাদের রোমান্সের জায়গা নেই।

"রোমান্সের ফাঁকে ফাঁকে এই ক্ষীয়মান সমাজব্যবস্থার চিত্র এ ছবিতেও অবশ্য দেখা যাচ্ছিল। শুধু মধ্যবিত্ত শ্রীকণ্ঠবাবু নয়, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ও ব্যাংকের মালিকরাও চালের মজুতদারী করে কিরূপে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি করছিল তারও আভাস পাওয়া গেল।

"চিত্রের সমাপ্তি খুবই রোমান্টিক, তবে অসহ্য নয়। উদয়ের পথে যাত্রা যেন চার্লির 'Modern Times'-এর নায়কনায়িকার অজানা পথে যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রযোজক অজ্ঞাতসারে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন, তাতে ক্ষতি নেই।

"তবু বলব এরকম দেশী ছবি আর দেখিনি। শুধু থিওরি নয়, জনতার জীবনের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় ঘটলে আমাদের রোমান্টিক আত্ম-বঞ্চনার জায়গা

থাকবে না—আমরা সত্য হয়ে উঠব, আমাদের ছবিও সত্য হয়ে উঠবে,—সিনেমার শিল্পীদের সামনে 'উদয়ের পথ' সেই ইঙ্গিতই উপস্থিত করেছে।

"এ ছবির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে লেখক, প্রযোজক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই প্রায় নূতন। সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আশা করি তাঁরা আর্থিক সুবিচারও লাভ করবেন, লেখকও তা' থেকে বঞ্চিত হবেন না। নূতন অভিনেতা রাধামোহন অনুপ-চরিত্রের দৃঢ়তা ও মর্যাদা-বোধ যে-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা পুরাতন অভিনেতাদের মধ্যে বড় একটা দেখতে পাইনি। তাঁর শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ শিশিরবাবুকেই মনে করিয়ে দেয়। ছবি দেখে মনে হয় পুরাতন লেখক, প্রযোজক ও অভিনেতা অভিনেত্রীরা পুরাতন ভাবলোক ও অভিনয়-কলায় বাঁধা পড়ে গেছেন। অথচ দর্শকরা যে প্রগতি চায় তাতো স্পষ্ট। ধনিক চিত্রব্যবসায়ীরাই তা পরিবেশন করতে এতদিন নারাজ ছিলেন। তবে তাতে এবার যখন মুনাফার সম্ভাবনা দেখা গেল তখন এদিকেও জোরকরা প্রগতি ও ধার-করা কল্পনার বান না ডাকলে হয়। (পরিচয়, আশ্বিন, ১৩৫১)

উদয়ের পথের উল্লসিত সংবর্ধনা শেষ না হতেই দেশে এল আজাদ হিন্দ আন্দোলনের উচ্ছ্বাস; আর জাতীয় চেতনার নতুন বন্যা। ব্যবসাদারী ফিল্ম-সত্বাধিকারী এটাকে ব্যবসায়ে পরিণত করে মুনাফা তুলবেন, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু দুঃখের কথা হচ্ছে এই যে, এরূপ অধিকাংশ ফিল্মই কদর্য,—যেমন কদর্য 'আমিরী' নামক বস্তি জীবনের চোরা-বাজারী ফিল্ম্-খানা। তবু এরই মধ্যে 'উদয়ের পথের' ধারাই আবির্ভূত হয়েছে 'অভিযাত্রী' (ফাল্গুন, ১৩৫৩) শ্রীযুক্ত জ্যোতির্ময় রায়ের যোজনায় ও প্রযোজনায়। ত্রুটি তাতে আছে,—অনেকটা ত্রুটিই দেশের ও পুঁজিবাদিতার অবস্থা বৈগুণ্যে,—কিন্তু 'উদয়ের পথে'র মধ্যে যে কথাবস্তু ও ভাববস্তুর দুর্বলতা ছিল 'অভিযাত্রী'তে তা রচয়িতা কাটিয়ে উঠেছেন।

শ্রীযুক্ত রাধারমণ মিত্র 'অভিযাত্রীর' যে পরিচয় দিয়েছেন (মাঘ, ১৩৫৩, 'পরিচয়') তার প্রত্যেকটি কথার সঙ্গে একমত হতে সকলে পারবেন না—গল্পাংশে এখনো নানা শিথিলতা আছে, আর ফিল্ম্-এর ফটোগ্রাফি ও অন্য বৈজ্ঞানিক ত্রুটিও যথেষ্ট। তবু রাধারমণবাবুর সমালোচনা মোটামুটি সকলের গ্রাহ্য হবে। শ্রমিক আন্দোলনের দিক থেকে শ্রমিক বন্ধুরা এ গল্পের তবু অন্তত তিনটি ত্রুটি উল্লেখ করেন (তাঁরা গল্পাংশকে ব্যক্তি চিত্র হিসাবে দেখতে সহজে চান না, বলেই): (১) মৃতকল্প শ্রেণী কখনো ক্ষমতা

বিপ্লবী শ্রেণীকে আপোষে ছেড়ে দেয় না—ছলনা-সূত্রেও না; (২) শ্রমিক সংঘাতকে রক্ত দিয়ে যাঁরা সার্থক করেন তাঁরা মধ্যবিত্ত চাকুরে নন, তাঁরা প্রায় সর্বাংশেই মজুর। (৩) 'অভিযাত্রী' যেখানে শেষ হল সেখানে নায়ক-নায়িকা পরস্পরকে স্বীকার করছে ;—কিন্তু মতাদর্শগত পরিবর্তন ও কর্মক্ষেত্রের সহযাত্রিক সাধনার জন্ম নয়, একটি শোচনীয় ঘটনার জন্ম, নায়িকার পিতার মৃত্যুর জন্ম। এসব বক্তব্য মিথ্যা নয়, কিন্তু মূল কাহিনী এসব ভাবের দৃষ্টান্ত-স্বরূপ রচিত হয় নি, যদিও শ্রমিক-শক্তির প্রতি সহানুভূতি:তেই তা উদ্বুদ্ধ। বলা নিষ্প্রয়োজন—বাঙলার গণ-আন্দোলন ও বাঙলা ফিল্ম 'উদয়ের পথে'র পরে এ ক্ষেত্রে সত্যই আরও এক পদ অগ্রসর হয়ে গিয়েছে 'অভিযাত্রী'র মধ্য দিয়ে।

বাঙলা নাট্যকলার নূতন সূচনা

[বাঙলা নাট্যমঞ্চে এক নূতন সম্ভাবনা দেখা দেয় গণ-নাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে—'জবানবন্দী'র অভিনয় থেকে। 'নবান্নের' অভিনয়ে তা সকলের কাছ থেকে অকুণ্ঠ-স্বীকৃতি আদায় করে। এখানে শ্রীযুত রঙ্গীন হালদারের লিখিত সে অধ্যায়ের আলোচনা পরিচয় (শ্রাবণ, ১৩৫১) থেকে উদ্ধৃত হল। এ-ধারায় সাধারণ রঙ্গমঞ্চে এখন দেখা দিয়েছে শ্রীরঙ্গমে দুঃখীর ইমান। লেখক]

বাঙলা নাট্যকলার উপর আমাদের অনেকের দরদ আছে। কিন্তু তা নিয়ে গৌরব করবার মত নিদর্শন আমাদের বেশি নেই। এর কারণ অনেক, তা আমরা বুঝি। যে-সব সামাজিক-রাষ্ট্রীক কারণে নাট্যকলা স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠে, আমাদের ভাগ্যে সে সব কারণ জোটেনি। আবার, এক কালে আমাদের দেশে নাট্যকলার যে বিশেষ রূপটি প্রকাশ লাভ করেছিল তার ঐতিহ্য বেঁচে নেই। বাঙলা "যাত্রা"ও মরতে বসেছে, থিয়েটারী ঢং গ্রহণ করে তা কোনো রকমে তবু টিকে থাকতে চায়। অথচ বাঙলা থিয়েটারও খুব শক্তিশালী জিনিস নয়—যদিও সমস্ত ভারতবর্ষে নাকি আমাদের 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চই' প্রধান সাধারণ রঙ্গমঞ্চ।

বাঙলা রঙ্গমঞ্চ বা বাঙলার নাট্যকলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবার দরকার এখানে নেই। বাঙলার নূতন সাহিত্যের মত বাঙলার নাট্যকলারও নূতন প্রেরণা আসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ে।

সেক্‌স্‌পীয়র পড়ে যে বাঙালী মেতে যায়, তারা নাট্যকলা সংবন্ধে উদাসীন হয়ে থাকলেই, আশ্চর্য হবার কথা হত। কাজেই নাট্যকলা সৃষ্টির প্রয়াসও প্রথম থেকেই আমরা করেছি। কিন্তু নাট্যকলা বড় বেশি রকম সামাজিক শিল্প—সাহিত্যের মত তা ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, নাট্যকলা সম্মিলিত সৃষ্টি। তাকে এজন্য সমন্বিত শিল্প বলা যায়। নাট্যসাহিত্য, অভিনয় কলা, ও প্রযোজন-শিল্প, অন্তত এই তিন কলার সমন্বয় তাতে চাই। আর চাই সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরও সহ-যোগিতা। এ যুগে বাজারের 'ভাও' বুঝে এ সব কলাকেও কাটতে ছাঁটতে হয়। দর্শক সমাজের রুচির উপর তাই নাট্যকলারও রূপ নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আর্থিক কারণেও তাই নাট্যকলা আবার জড়িত। মোটের উপর, এত বেশি পরিমাণে 'সামাজিক জিনিস' বলেই আমাদের পক্ষে নাট্যকলা সৃষ্টি সহজ হয়নি। আর তা না হলে নাট্যসাহিত্যও ঠিক লেখা হয় না—প্রত্যেক কলাই তো অন্য কলার সঙ্গে জড়িত। তথাপি, বাঙলা দেশে 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চ' চলছে; তার বাইরেও সৌখীন নাট্য পরিষদ অনেক রয়েছে। আর দু' ক্ষেত্রেই গুণীর অভাব হয়নি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাঁরা সংযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ লেখার জন্য, কেউ অভিনয়-নৈপুণ্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরেও বহু স্মরণীয় নাম রয়েছে। বাঙলার নাট্যকলা জন্মেছিল তাঁদেরই চেষ্টায় বেলগাছিয়ার বাগানে; ঠাকুরবাড়ি আর শেষ দিকে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী তাতে নূতন প্রেরণা জুগিয়েছে; আর শত শত ছোট বড় সৌখীন অভিনয় ক্ষেত্রে, পাড়ার বখাটে ছোকরারা, গ্রামের বাবুরা, কলেজের ছাত্ররা, তাকে পরিপুষ্ট করেছে।

আমাদেরই জীবনে আমরা বাঙলা নাট্যকলার তবু তিনটা যুগ দেখেছি, আজ তা স্মরণ করতে পারি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তখনো গিরীশবাবুর শেষ যুগ, অমৃতলাল বসু, দানীবাবুর যুগ চলেছে। যে স্তরের অভিনেতা, অভিনেত্রী নিয়ে তাঁরা কাজ চালাতেন, তাঁদের দর্শক সমাজও ছিল যে-স্তরের, তাতে তাঁদের শক্তিকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। রঙ্গালয়ে রঙ্গলোভী, আমোদপ্রিয় দর্শকেরা তখনকার অভিনয় দেখত, শিক্ষিত রুচি প্রায়ই তাতে তৃপ্ত হত না। কিন্তু বাঙলা নাট্যকলার ইতিহাসে এক নূতন ঘটনা 'ফাল্গুনী'র প্রথম অভিনয়, 'ডাকঘরের' অভিনয়। তার নাট্য কথা, তার অভিনয়কলা, বিশেষত তার মঞ্চসজ্জা—সূক্ষ্ম সৌন্দর্য পিপাসাকে তখন পরিতৃপ্ত করেছিল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তত সূক্ষ্ম জিনিস গ্রহণও করতে পারত না, পরিবেশনও করতে পারত না। রবীন্দ্র-

অনুপ্রাণিত নাট্যকলা সাধারণের জিনিস হল না। তবে অসাধারণের রসবোধকে তা জাগ্রত করে; আর তাতেই আবার শিক্ষিত সাধারণের রস-বোধকে উন্নত করে। সেই শিক্ষিত সাধারণের স্তরে—খাঁটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মধ্যে—তৃতীয় যুগে নেমে এসে দাঁড়ালেন শিশিরকুমার আর তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীরা। তিনি এই মধ্যস্তরে সূচনা করলেন নাট্যকলায় মধ্যবিত্তের যুগ। সেদিন মনে হয়েছিল বাঙলায় সত্যই বুঝি নাট্যকলার নবজন্ম হবে—বাঙলা নাট্যকলার এবার সত্যকারের আবির্ভাব দেখতে পাব।

তা হল না। কারণ অনেক ছিল। ছোট বড় কারণ হিসাব করে লাভ নেই। মূলের কারণটিই আজ স্পষ্ট। বাঙলার মধ্যবিত্ত কাল্‌চারের সঙ্কটকাল তখন এসে গেছে। বরাবরই তার গোড়ায় মাটি ছিল কম। তার প্রেরণা বেশিটাই আমাদের মনোভূমি থেকে নেওয়া;—আর সে মনোভূমি তৈরী হয়েছিল পাশ্চাত্য জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কে, সঙ্ঘাতে। বাঙলায় সেই প্রেরণাতে সাহিত্যসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু সাহিত্য মোটামুটি একজনেই সৃষ্টি করে, শিক্ষিত লোকেরা পড়ে। নাট্যকলা কিন্তু দশজনের জিনিস, তার সৃষ্টি হয় কলা-সমন্বয়ে; আর তার সার্থকতা আবার এক বড় দর্শক-সমাজের গ্রহণ শক্তির উপর নির্ভর করে। এই কারণেই বরাবর আমাদের নাট্যকলা দুর্বল ছিল। শুধু মধ্যবিত্তের আসরও নাট্যকলা-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট প্রশস্ত আসর নয়। তাতেও আবার শিশির-কুমার যখন এলেন তখন সেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে ভাঙন ধরেছে—বাঙলার মধ্যবিত্তদের তখন নিজের শক্তিতেও আস্থা নেই। আর ইউরোপের যে জীবন ও সৃষ্টিক্ষেত্র থেকে তারা প্রেরণা আহরণ করত, ইউরোপের সেই জীবন ও সৃষ্টিক্ষেত্রেও তখন ভাঙন ধরেছে। শিশিরকুমারের 'মধ্যবিত্ত' বাঙলা নাট্যকলা সৃষ্টির চেষ্টা—শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীর জন্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—খানিকটার বেশি তাই সার্থক হতে পারল না। কারণ, নাট্যকলা অমন একটা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সবল ও স্বাভাবিক শ্রী লাভ করতে পারে না—বিশেষত যখন তার আসল সামাজিক পরিবেশ আগেকার মতই রয়েছে প্রতিকূল, তার সঙ্কীর্ণ আসরেও ভাঙন ধরেছে, অন্যদিকে নূতন কালের সবাক্‌চিত্র এসে তাকে সকল ক্ষেত্রেই কোণঠাসা করছে।

এই তিন যুগের পরে বাঙলা নাট্যকলা দেখে একটা কথায় আমরা বুঝেছিলাম—বাঙলা নাট্যকলা সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না। অনেক দেশেই নাট্যকলার এ দশা ঘট্‌ছে। কারণ, অনেক দেশেই

কলাবিদের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যোগাযোগ কমে আসছিল। বাঙলা দেশে এই বাঙলা নাট্যকলার ও বাঙালীর যোগাযোগ বরাবরই ছিল সামান্যতম। তাই দু' একটি নাটক ও দু'একটি অভিনয় ছাড়া সর্বত্রই ছিল একটা রোমাণ্টিক আবহাওয়া স্বষ্টির চেষ্টা। এমন কি, আমাদের সামাজিক নাট্য ও অভিনয়ও বাস্তব জীবনকে বড় স্বীকার করতে চাইত না।

কিন্তু একটা কথা, জনগণ এই নাট্যকলা চায় না—এ কথা বলাও হবে ভুল। গ্রামে নগরে যারা সৌখীন দলের অভিনয় দেখেছেন, তাঁরাই জানেন জনগণ এ সব নাটকের অভিনয় দেখতেও কত উৎসাহ পায়। হয়ত সাজ-পোশাক আলো-চমক, এ সবই তাদের সরল মনে ভালো লাগে। কিন্তু তারা শুধু 'যাত্রাই' চায়, 'ভাসান গানই' বোঝে, 'কীর্তনেই' আনন্দ পায়, এ কথা বল্‌লে ভুল করব। দেখ্‌ছি সে সব পরিচিত বিষয়বস্তু ও পরিচিত শিল্পপদ্ধতি যতই পরিচিত হোক আজ তাদের সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পারে না। কাল বদলেছে, তাদের রুচি ও দৃষ্টিও জানা-না-জানায় বদ্‌লেছে ;—সিনেমা গ্রামোফন কোম্পানি তা বুঝেই ব্যবসা করছে। কিন্তু জনগণেরও রস-পিপাসা আছে, সে রস-পিপাসা নতুন কিছু চায়। সেই জিনিসই আমরা দিতে পারছি না—এমন কিছু যার বিষয়বস্তু (content) তাদের কাছে নিতান্ত "পরের জিনিস" বলে মনে হবে না, এবং যার শিল্প-পদ্ধতিও (form) অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বলে তাদের কাছে ঠেক্‌বে না।

"ভদ্র"-নাট্যের এই বানচাল অবস্থা থেকেই বোধ হয় গণনাট্যের প্রয়োজন আমরা সকলেই উপলব্ধি করেছিলাম। সেই গণনাট্য আন্দোলনের পুঁথিপড়া বিদ্যা নিয়ে অপেক্ষাও করেছি। কৌতূহল ছিল, কৌতুকও বোধ করেছি, একটু বিদ্রূপের ভাবও মনে মনে পোষণ না করতাম তা নয়। তবু বাঙলা নাট্যকলার প্রতি দরদ ছিল। হঠাৎ এবার কলকাতায় বাঙলার 'গণনাট্য সঙ্ঘের' অভিনয় দেখে আমরা কেউ কেউ আশান্বিত হয়ে উঠেছি। মনে হল, বাঙলা নাট্যকলার অন্তত একটা চতুর্থ যুগের সূচনা দেখছি।

এই সঙ্ঘ আর তার অভিনয়কলার নাম শুনেছিলাম। জানতাম এর আরম্ভ বড় এক বাস্তব রাজনৈতিক সঙ্কটের টানে। শুনেছিলাম এর প্রকাশ ঘট্‌ছে কঠিনতর এক বাস্তব সামাজিক সঙ্কটের টানে। পড়েছিলাম অনেক রসিক ও গুণীর এঁদের অভিনয়াদি সম্পর্কেও প্রশংসার কথা।

এদেশে গণনাট্য সঙ্ঘের উৎপত্তির ইতিহাস জানতাম। যাঁরা এর প্রথম

প্রবর্তক তাঁরা জেনে-না-জেনে দুটা জিনিস বুঝেছিলেন—প্রথমত, নাট্যকলা কলা হিসাবেও জনমুখাপেক্ষী, জন-সংযোগ ছাড়া তার স্ফুরণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য কলার অপেক্ষাও নাট্যকলার সামাজিক প্রভাব বেশি—শুধু মাত্র 'বিশুদ্ধ' রসোপভোগের জিনিস তা নয়। কলকাতায় ১৯৪০ সালে ইয়ুথ কাল্চারাল ইন্‌ষ্টিটিউট্ এই উপলব্ধি থেকে জন্মে। বোম্বাই-এ ১৯৪২ সালে পণ্ডিত জওহর-লালের আশীর্বাদ নিয়ে জন্মে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। দু'এরই পিছনে ছিল রাজনৈতিক প্রেরণা, সামাজিক দায়িত্ববোধ আর শিল্পের প্রতি অনুরাগ। কিন্তু বাঙলার শিল্পীদের দৃষ্টি ছিল শিল্প সৃষ্টির দিকে, বাঙলার প্রগতিকামী মধ্যবিত্ত সমাজে তাঁদের একটা আসর ছিল তৈরী। বোম্বাইর শিল্পীরা বিলাতের Unity Theatre-এর কায়দায় শ্রমিক-শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি রাখেন, বোম্বাইর শ্রমিকশ্রেণী ছিল তাঁদের লক্ষ্যবস্তু। দুই প্রয়াস পরে সংগঠনের দিক থেকে একত্র হয় এবং ক্রমে শিল্পকলার দিক থেকেও তাদের সংযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাঙলার শিল্পীরা পল্লী গীতি, জন-সংগীত, প্রভৃতিকে উদ্বোধন করতে অগ্রসর হয়। আর মন্বন্তর এলে তার সত্যকে আশ্রয় করে অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি পরিবেশন করে। সাহায্যের জন্য তাদের ডাক পড়ে পাঞ্জাবে, নূতন দর্শক সমাজের জন্য নূতন-শেখা হিন্দু-স্তানীতে তাঁরা অভিনয় করেন, আর, বাঙলার জন্য সাহায্য নিয়ে আসেন প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা। কিন্তু বড় কথা, তাঁদের অভিজ্ঞতার পরিধি এসূত্রে বাড়ে। সে পরিধি আরও বাড়ল যখন জামসেদপুর ছাড়িয়ে তাদের অভিনয়ের জন্য ডাক পড়ল বোম্বাই উপকূলে। নূতন করে তাঁদের শিল্পজ্ঞানকে পুষ্ট করতে হল, যাতে একই কালে সেখানকার গুণী সমাজ তৃপ্ত হয়, আবার শ্রমিক সমাজ অনুপ্রাণিত হয়। তাঁরা বাঙলার দুস্থদের জন্য সাহায্য পান দেড় লক্ষ টাকা। বোম্বাইর শিল্প সমালোচকেরাও বুঝলেন গণনাট্য শিল্প হিসাবেও, দাঁড়িয়েছে।

কলকাতায় অভিনয় দেখে আমাদের যা মনে হল তা এই—বাঙলা নাট্যকলার একটা নূতন আরম্ভ দেখলাম। 'ফাল্গুনী' 'ডাকঘরে' যে সূক্ষ্ম শিল্প পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছিল, তা নাট্যকলার মূল সত্যকেই যেন ভুলে যেতে চেয়েছিল। জন-সমাজ সে রস গ্রহণ করতে পারে না। 'ফাল্গুনী'তে তাদের চেনা বাউলের মুখে তারা আধ-চেনা সুরের গান শুনছিল! কিন্তু তার কথাবস্তু ও তার অতি হেঁয়ালি কথাবার্তা তারা এক বর্ণও বুঝতে পারে না। বাউল আর সংগীতের কাঠামোতে রবীন্দ্রনাথ তার নাটককে জনতার চেনা 'যাত্রার' রূপ খানিকটা দিচ্ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাউলও রবীন্দ্রনাথই। অসামান্য সে, অতি

সূক্ষ্ম রসের রসিক। বুঝলাম, সে সূক্ষ্মতা সাধারণের জন্য নয়। সে সূক্ষ্ম মঞ্চসজ্জা—যা দেখে তখন বিমুগ্ধ হয়েছিলাম—বুঝলাম, তাও বড় বেশি অসাধারণ। সে নাট্যকলা জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখে। এবার বুঝলাম, বাঙলা নাট্যকলা—সেই শিক্ষিত বাঙালীর নাট্যকলা 'শিশির যুগও'—জনসমাজের পাশ কাটিয়ে যায়। শিশিরকুমারের 'মধুসূদন' দেখে সেদিনও বিমুগ্ধ হয়ে ফিরেছি। গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় দেখে বুঝছি—কোথায় ছিল মধুসূদনের, শিশিরকুমারের ট্রাজিডি—বাঙলার সমস্ত "ভদ্র" নাট্যকলার ট্রাজিডি। ইউরোপীয় ধনিকতন্ত্রের যুগের নাট্যসাহিত্যও তার অভিনয়-কলা, তার প্রযোজন বিদ্যাকেই সর্বস্ব করে আমরা এদেশে তখন গ্রহণ করেছিলাম। এদেশে মধুসূদন, শিশির-কুমার বা আমরা কেউ বাস্তবক্ষেত্রে সেই ধনিকতন্ত্রের সুস্থ প্রকাশ দেখিনি। চারদিকে দেখলাম তার সাম্রাজ্যবাদী রুক্ষ দৌরাত্ম্য,ঔপনিবেশিক উপদ্রব। পেলাম না বুর্জোয়ার সেই সমাজ, সেই নাট্য সাহিত্য, সেই নাট্যকলা, সেই প্রযোজন-দক্ষতা। তাই মধুসূদনের প্রতিভা তার প্রকাণ্ড প্রকাশ সত্ত্বেও ট্রাজিডি হয়, শিশিরকুমার তাঁর আশ্চর্য শক্তি ও একক সার্থকতা সত্ত্বেও ট্রাজিডি থাকেন। আমরা পথ পাই না-প্রকাশের, না-সার্থকতার। 'ভদ্র' নাট্যকলা তাই হয়ে ওঠে বিদ্রূপের বস্তু।

'গণনাট্য সঙ্ঘের' অভিনয়ে দেখলাম ত্রুটি অনেক, একটা সমন্বিত শিল্প এখনো গড়ে ওঠেনি। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে—সমস্ত জুড়ে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। একজন নায়ক বা একজন অভিনেতাকে কেন্দ্র করে আর নাটক ও নাট্যকলা আবর্তিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত অতিরিক্ত রকমের ব্যক্তি-কেন্দ্রিক (individualistic) অভিনয় কলার পরিচয় রেখে গেছেন। এবার এই প্রথম দেখলাম অভিনয়ে, সংগীতে, সমস্ত জুড়ে একটি ঐকরীতির প্রয়োগ। একজনই শুধু অভিনয় করেন আর সকলে হয় পার্শ্বচর; এ যেন আমাদের দেখা অভ্যাস হয়ে উঠছিল। অথচ সমস্ত নাট্যকলার মূল সূত্রই তার বিরোধী। সে সূত্র দাবী করে সমন্বয়—সমগ্রের সম-বিকাশ। এবার গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয়ে এই নূতন নীতিরই প্রতিষ্ঠা দেখলাম। প্রযোজন-বিদ্যায়ও টেকনিকের খুঁটিনাটি অপেক্ষা চেষ্টা দেখলাম সমস্তকে পরিপুষ্ট করবার। 'মহামারী নৃত্যে' নেপথ্যে সংগীত আর ক্রন্দন আর মঞ্চে আলো আঁধারের সন্নিবেশ তার সুন্দর নিদর্শন। আর সঙ্গে সঙ্গে কি নাট্যকলায়, কি অভিনয়ে, কি মঞ্চ সজ্জায় দেখলাম এক বাস্তবতা,

জীবনমুখিতা। ফলে সমস্ত অভিনয়ে একটা অদ্ভুত সবলতার সঞ্চার হয়েছে—আগেকার যুগের চমক, চটক ও রোমান্সের স্থানে এসেছে সহজ বলিষ্ঠ জীবন। তার সেই অতিসূক্ষ্মতারই যেন একটা প্রতিবাদ জনতার বলিষ্ঠতা; স্বাভাবিকতার যেন একটা ইঙ্গিত তাদের এই সামগ্রিক ও বাস্তব অভিনয় কলার মধ্য দিয়ে দর্শককেও সচকিত ও সচেতন করে তোলে—বুঝি, বাঙলা নাট্যকলা বাঙালী জীবনের কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে।

তারই একটা প্রমাণ রয়েছে এই নাট্যকলার সমস্ত পরিকল্পনায়। ঘরে বসেই আমরা অভিনয় দেখছিলাম। তার অর্থ বাইরে থেকে নিজেদের একটু স্বতন্ত্র করে নিয়ে দেখছিলাম অভিনয়। জীবনযাত্রার থেকে, বাস্তবের থেকে একটু আড়াল রচনা করে দেয় এরূপ ঘরের দেয়াল। তাতে সুবিধাও আছে অসুবিধাও আছে। খাঁটি জননাট্য এ আড়াল চায় না, তা মুক্ত প্রান্তরে মানুষের চোখের সামনে ফুটতে পারলে তবেই মনে করে, সার্থক হলাম। বাঙলা 'যাত্রা' আমাদের জনতার এ কারণেই বেশি নিজের জিনিস হতে পারত। এ কালের 'মুক্ত প্রান্তরে অভিনয়' "Open Air Theatre", সেই গ্রীক অভিনয় পদ্ধতি, Passion Play, ও আমাদের 'যাত্রা' 'রামলীলা' প্রভৃতির সেই মূল সত্যটিকে আবার ঊর্ধ্বতর স্তরে স্বীকার করে নিতে চায়, দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন করতে চেষ্টা করে। ঘরে বসে গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে বুঝছিলাম, এ অভিনয়ও মুক্ত প্রান্তরের উপযোগী। শুনেছিলাম, সত্যই মুক্ত প্রান্তরে অভিনয় করতে পারলে শুধু এদের অভিনয়ের উদ্দেশ্য যে বেশি সিদ্ধ হয় তা নয়, এদের অভিনয়-কলাও নাকি স্ফূর্ত হয় বেশি। নাট্যকলার এই অবরোধ-মুক্তি বাঙলা নাট্যকলার ইতিহাসে তাই আর এক শুভ সূচনা।

ঠিক এসব ধারণা, নীতি ও রীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই যে নূতন নাট্যসাহিত্য রচিত হবে, তা না উল্লেখ করলেও চলে। কারণ, নইলে নাট্যকলার মত সমন্বিত শিল্প রূপ লাভই করত না। এই নূতন নাট্যসাহিত্য সৃষ্টির যে সূচনা দেখলাম তাও তাই লক্ষ্য করতে হয়। দেখলাম—যে নাটক এরা অভিনয় করছেন তা সাধারণ মানুষের সাধারণ কথা। উদ্দেশ্যে তার স্পষ্ট। তাতে ছলনার চেষ্টা নেই। এই উদ্দেশ্য স্বীকার করতে লেখক ও শিল্পীরা কেউ কুণ্ঠিত নয়। তারা বলতে চায় না, 'না, না, আমাদের উদ্দেশ্য নেই। আমরা শুধু শিল্পের জন্য শিল্প সৃষ্টি করি।' বরং এইটাই

বলতে চায়, 'আমরা শিল্প সৃষ্টি করি; কারণ, আমাদের উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে, আদর্শ আছে।' এই অকুণ্ঠ সত্যের বলেই তারা সাধারণকে তৃপ্ত করে, আর দৃষ্টিবান সমালোচকের মধ্যেও স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। এরূপ সমালোচকেরা বোঝেন—আমাদের 'বিশুদ্ধ শিল্প' পরিবেশনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি, তারপর প্রতারিত করা হয়নি প্রচার-দৃশ্য দিয়ে। তাঁরা জানেন, 'এরা দিতে চায় বাস্তব শিল্প; আমরা দেখ্‌ব ঠিকমত প্রকাশ হল কিনা জীবন।'

এদের নাট্যসাহিত্যে কোথাও তাই ছলনা নেই। বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'জবানবন্দী'তে তাই নাটকীয় হবার চেষ্টা নেই—গান নেই, হাসি নেই, স্মার্ট কথাবার্তা নেই, আছে একেবারে সহজ, সুস্পষ্ট ঘটনা। গৃহ ছেড়ে একটি কৃষক পরিবার এল শহরে অন্নের খোঁজে, অনাহারে তাদের মধ্যে স্নেহ-প্রেমের বন্ধন দুদিনে ছিঁড়ে যেতে লাগল, ছোট ছেলেটি মরল, কৃষকবধূ দেহ বিক্রয় করলে, আর পরিবারের বৃদ্ধ কর্তা মারা গেল চোখে নিয়ে তার ক্ষেতভরা ফসলের স্বপ্ন। চার দৃশ্যে এক অঙ্কে এক ঘণ্টার মধ্যে এই নাটকের অভিনয় হয়। এ নাটক নাট্যসাহিত্য হিসাবে যে সার্থক তা দর্শকদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। নাট্যসাহিত্যের প্রধান মানদণ্ড তা'। এ নাটকের শক্তির উৎস হল তার সত্যনিষ্ঠা, ঘটনা আর বলিষ্ঠ সংলাপ। এর ত্রুটি সম্ভবত এই যে, তাতে নিঃশ্বাস ফেলবার কোনো অবকাশ নেই—হাসি নেই; গান নেই, ট্রাজিক রিলিফ্ কোথাও মেলে না। হয়ত নাট্যকার দিতেও চান না।

তবু 'জবানবন্দী' পুরো নাটক নয় একে চিত্র বা নক্‌সা বল্‌লেই ঠিক বলা হবে। লেখক নতুন নাটক রচনা করেছেন 'নবান্ন'। তা চার অঙ্কের নাটক, তাতে অনেক দৃশ্য, অনেক ঘটনা। 'অরণি'তে তা ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে। তার বিষয় বস্তুও এই মন্বন্তর; মন্বন্তরের ক্রমিক প্রকাশ, প্রসার ও পরিণতি তিনি এই নাটকে তুলে ধরেছেন। নাট্যসাহিত্য সংবন্ধে লেখক যেরূপ দৃষ্টিশক্তির ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, 'নবান্নে' তার স্ফুরণ দেখছি। এবার তা নিশ্চয়রূপে সার্থক হবে অভিনয়ে।

কারণ, আশার কথা আছে। বাঙলার লেখকদের মতই অভিনয় শিল্পীরাও অনেকেই 'গণনাট্য সঙ্ঘের' সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন। শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই ছিলেন এঁদের সভাপতি। গণনাট্যের মধ্যে তাঁরাও

একটা নূতন সম্ভাবনা দেখ্‌ছেন। সাহিত্যিক ও রঙ্গমঞ্চের কর্ণধারদের এই শুভ সম্মেলন ঘটলে বাঙলার নাট্যকলার এই চতুর্থ যুগের সূচনা ব্যর্থ হবে না। আমরাও দেখব—এবার বাঙলা নাট্যকলা বাঙালীর নাট্যকলা হয়ে উঠ্‌ল।

গণনাট্য সঙ্ঘের নৃত্যাভিনয়

মাঘ মাসের (১৩৫১) শেষ সপ্তাহ ও এই ফাল্গুনের প্রথমার্ধ জুড়ে যে সব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এ দেশে হয়েছে, তার মধ্যে কলকাতায় 'ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের' নৃত্যোৎসবটিকেই প্রধান স্থান দিতে হবে। এই নৃত্যোৎসব দেখে আমরা সকলেই ভারতবর্ষের লোক-সংগীত ও লোকনৃত্যের একটা নূতন পরিচয় লাভ করেছি, সকলেই উপলব্ধি করেছি—ভারতের লোক-জীবন কত সুন্দর সম্ভাবনাময়।

কথাটা যে কত সত্য, তা বুঝবার জন্য একদিনকার কথাই বলি। সে দিন দু'জন খ্যাতনামা বন্ধুর পাশে বসে এই নৃত্যোৎসব দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল (১৩ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার)। তাঁদের একজন লেখক-সম্পাদক আর একজন এক প্রধান ঔপন্যাসিক।

অভিনয় আরম্ভের প্রথম দিকে আমরা বিলম্বে আগত দর্শনার্থীদের যাতায়াতে একটু বাধা পাচ্ছিলাম।...

নৃত্যোৎসব আরম্ভ হল। দর্শনার্থীদের বাধা সত্ত্বেও উদ্বোধন-সংগীত বন্ধুদ্বয়ের ভালো লাগল। 'দামামার আহ্বান' দেখে সম্পাদক নিজ থেকে বললেন, 'সুন্দর'। তারপর বললেন, 'দামামা-বাদক আরও একটু পেশী-বহুল হলে আরও ভালো হত'। নিজের মতামত দিয়ে আমি তাঁদের উপভোগে বিন্দুমাত্র বাধা সৃষ্টি করতে চাইনি, তাঁদের স্বতঃউচ্ছ্বসিত মতামতই শুনতে লাগলাম। হায়দ্রাবাদের বেদে নাচ 'লাম্বাডি নৃত্য' দেখে দুইজন সাহিত্যিকই তন্ময় হয়ে গেলেন। সম্পাদক-বন্ধু তা শেষ হতে বার বার বল্‌লেন, 'অপূর্ব'। উপন্যাসিক-বন্ধু সানন্দে বললেন, 'চমৎকার'।

এল তারপর শচীন্দ্রশঙ্করের একক নৃত্য—'তার মৃত্যু হল অনাহারে'। বন্ধুদ্বয়ের তা ভালো লাগলো। এলো 'ধোবী নৃত্য'—বুঝলাম বন্ধুরা জমে গেছেন। তারপর হল 'তাঁরা আবার মিলিত হোন্'। গান্ধী-জিন্না সাক্ষাৎকার নিয়ে এটি

রচিত; সেই সাময়িক কাহিনী পেয়েছে নৃত্যে-গানে রূপ। শেষ হতে সম্পাদক-বন্ধুই সপ্রশংস চোখে বললেন, 'ভালো হয়েছে—তবে মতটা ভালো নয়'। উপন্যাসিক বন্ধুও সায় দিলেন সস্মিত মুখে, 'হাঁ; তবে হয়েছে ভালো'। তারপর 'যৌথ কৃষির নৃত্য'। সম্পাদক ও উপন্যাসিক দুই বন্ধুই তখন উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন, তাঁদের চোখে মুখে আর আনন্দ ধরে না।

দশ মিনিট বিরামের পর হল 'রামলীলা'। পশ্চিমের রামলীলার অভিজ্ঞতা আছে ঔপন্যাসিক বন্ধুর। যখন নৃত্যগীত রঙ্গমঞ্চে জমে উঠতে লাগল নিজ থেকেই তিনি বললেন—'এবার রামলীলার আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছে'। তারপর যখন শেষ হল—হাসি মুখে বললেন, 'বেশ নিখুঁত হয়েছে'। শেষ নৃত্য 'ভারতের মর্মবাণী'। তা শেষ হল যখন তখন সম্পাদক-বন্ধু যেন উন্মনা হয়ে গিয়েছেন, আর ঔপন্যাসিক-বন্ধু হয়েছেন উল্লসিত।

দাঁড়িয়ে উঠে বেরুতে বেরুতে ঔপন্যাসিক বন্ধু সোৎসাহে বললেন, 'অদ্ভুত'। আমি জানতে চাইলাম—সমালোচক হিসাবে কি খুঁত দেখলেন তাঁরা। ঔপন্যাসিক-বন্ধু বললেন, 'গলা বাড়িয়ে দেওয়া (রামলীলায়?) বোধ হয় লোকনৃত্যে দেখিনি—ঠিক জানি না। তা হলেও খুব ভালো লেগেছে।' সম্পাদক-বন্ধু বললেন, 'ভারতের মর্মবাণীর গান ও নৃত্য ভালো, কথা কিন্তু দুর্বল। আর সমস্ত জিনিসটা সংক্ষিপ্ত মনে হয়! তা ছাড়া, তাতে বাঙলা দেশই প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু সব সত্ত্বেও অদ্ভুত।' ঔপন্যাসিক-বন্ধু কিন্তু ঐ ঐতিহাসিক পর্বকে দীর্ঘতর করবার পক্ষপাতী নন। বললেন, 'তাতে একঘেয়ে হয়ে উঠবে জিনিসটি।'

সম্পাদক-বন্ধু লেখকও। বললেন, 'ভারতের মর্মবাণীর মত একটি দু'ঘণ্টার নাটক আমাদের 'সঙ্ঘ' পরিকল্পনা করেছে। আমি লিখেছি গান, আর একজন লিখেছে গদ্যাংশ।' সম্পাদক-বন্ধুর গৃহেই চলেছিলাম—তিনি নিজের লেখা নিয়ে এলেন, পড়ে শোনালেন। দুটি কবিতার অধ্যায়—একটিতে ইংরেজ আগমনের পূর্বে ভারতবর্ষের পল্লীবাসী, তাঁতী, কুলনারী প্রভৃতিদের গীত—'দিল্লী অনেক দূর'। আরটি ইংরেজ আগমনের পরে তাঁদের গীত—অতিথিকে সম্বর্ধনা, অতিথি উত্তরে খুঁজছে মুনাফার ব্যবসা।* মোটামুটি বেশ কাব্যরস আছে কবিতাগুলোতে। পাঠ শেষ হলে ঔপন্যাসিক-বন্ধু বললেন, 'বেশ, এটা অভিনয় করো না?' সম্পাদক-বন্ধু বললেন, 'আমাদের লোক কই?'

* কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের উদ্যোগে অভিনীত 'অভ্যুদয়ে' পরে এসব গানই স্থানলাভ করেছে। লেখক।

আমি জানালাম—শৃঙ্খলানুবর্তী ও জনশক্তিতে বিশ্বাসী বলে ছ মাসেই গণনাট্য সঙ্ঘের শিল্পীরা এ সব শিখেছে। অন্যেরাও নিশ্চয়ই তা পারবে।

রাত হয়েছে, বিদায় নিচ্ছিলাম। ঔপন্যাসিক-বন্ধু বললেন, 'এই তো নাটকের বিষয়বস্তু। আমরা রামায়ণের মহাভারতের কাহিনী নিয়ে কবিতা-নাটক লিখি। কেন লিখি? কারণ, লোকের মনে সে জিনিস একটা ক্ষেত্র তৈরী করে রেখেছে। সমস্ত ভারতবাসীর মনে তেমনি তৈরী হয়ে আছে আজ এই রসের ক্ষেত্র—ভারতবর্ষের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় ও পরাধীনতার বেদনায় সে মন পরিপূর্ণ। এ নিয়েই নাটক লিখব আমি—কিন্তু লিখব কি? নাট্যশালার কর্তাদের জন্য লিখতে ইচ্ছা করে না'।

সেই সমস্যাও জানি। সাধারণ রঙ্গালয়ের কর্তারা আজ 'নবান্ন' অভিনয় করবার জন্য রঙ্গশালা ভাড়া দিতেও চায় না। বলে—নবান্ন অভিনয়ে তাদের ব্যবসায়ে ক্ষতি হয়। বললাম বন্ধুকে, 'আপনি নাটক লিখুন। গণনাট্য সঙ্ঘ অভিনয় করবে।'

বিদায় নিলাম। দেখলাম লোক-কলায় উদ্বুদ্ধ দুজন সাহিত্যিককে; একজন একটু উন্মনাও, আর একজন তেমনি উল্লসিত।

পরদিন গণনাট্য সঙ্ঘের দু'একজন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কি, বললেন সম্পাদক?' যা শুনেছি আগে তা'ই বল্‌লাম।

তাঁরা জানতে চাইলেন, 'কি লিখবেন সম্পাদক?'

হাসলাম। অনুমান করতে পাবি।

অনুমান যে মিথ্যা হয়নি তা দেখলাম 'শনিবারের চিঠি' ফাল্গুন সংখ্যায়। সেই সম্পাদক-লেখক ছিলেন সজনীকান্ত দাস, আর ঔপন্যাসিক-বন্ধু 'বনফুল'।

[ফাল্গুন, ১৩৫১]

নন্দলালের কংগ্রেসের চিত্রমালা

কলকাতার শিল্প-রসিকদের পক্ষে বিশেষ সৌভাগ্য তাঁরা শিল্পগুরু নন্দলাল বসুর অঙ্কিত হরিপুরা কংগ্রেসের চিত্রমালা আবার এখানে দেখতে পেয়েছেন। ফেব্রুয়ারী মাসের শেষ সপ্তাহে সে চিত্রমালার একটি প্রদর্শনী হচ্ছে শ্রীযুক্ত নির্মল চন্দ্র চন্দ্রের বাড়ির দোতলার বারান্দায়।

হরিপুরার পূর্ব থেকেই কংগ্রেস গ্রাম-যাত্রী হয়। ফৈজপুরা থেকেই তার বার্ষিক অধিবেশন গ্রামে হয়, হরিপুরায় সেই গ্রামযাত্রা আরও সার্থক করবার আয়োজন হয়েছিল। শিল্পগুরু নন্দলাল গ্রহণ করেন আপনার তুলিকাযোগে তাকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করার ভার। গ্রামযাত্রী কংগ্রেসের মর্মকথা তাঁর শিল্পী মনকে স্বভাবতই আকর্ষণ করে। আমরা সকলেই জানি, অবনীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া যাঁদের জীবন-দর্শন নন্দলালকে বিশেষ রকমে প্রভাবিত করে তাঁরা হচ্ছেন গান্ধীজী, শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ। এদিক থেকে তাঁর ও রলাঁর জীবন-যাত্রায় একটা মিল আছে—তা ভুলবার নয়। তবে রলাঁর জীবন-জিজ্ঞাসা অগ্রসর হয়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত এক আত্মঘোষণায় স্থির হয়—I WILL NOT REST ; সে কথার এখানে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু স্মরণীয় এই যে, গান্ধীজীর সাধনা শিল্পী ও শিল্প-রসিকদের চিত্তে কিরূপ সাড়া জাগিয়েছে। হরিপুরা কংগ্রেসের চিত্রমালায় নন্দলাল সেই মর্ম কথাকে রূপ দিয়েছেন :—ভারতবর্ষ তো পল্লীবাসীই, তার সাত লক্ষ গ্রামে সে তার আসন বিছিয়ে দিয়েছে। কত রাজা এল, গেল ; কিন্তু ভারতবর্ষের পল্লীকেন্দ্রিক সেই জীবনযাত্রা অব্যাহত রয়েছে—সেই ফল ফুল গাছ, সেই গরু আর ছাগল, সেই পাতার আড়ালে পাখী, —তার সব রয়েছে তেমনি। সেই ঘরের বধূ সহজ প্রসাধন করছে, সেই চাষী করছে চাষ, তাঁতী বুনছে তাঁত, কোদালি চালাচ্ছে গাঁয়ের মজুর ; ধুনুরি তুলো ধুনছে, বুটী তুল্‌ছে বুড়ো ওস্তাদ চোখে চশমা এঁটে, গাই দুইছে আহিরিণী গোয়ালিনী, ধান কুটছে গ্রামের বউ, দঙ্গল হচ্ছে কুস্তীগীরে কুস্তীগীরে, সেই পুরনো দিনের লাঠিয়াল, সড়কিওয়ালারা খেলা দেখাচ্ছে, বাজনা বাজাচ্ছে,—ঢোল, একতারা, সারাঙ্গি—আমাদের পল্লীর শিল্পী। এইতো ভারতবর্ষ, এই তার চিরদিনকার জীবনযাত্রা—যার উপরে ইংরেজের মার্কা পড়েনি, শহরের ছাপ নেই, শিল্প যুগের কোনো দাগ লাগেনি। এই ভারতবর্ষই গান্ধীজীর প্রিয়, এই ভারতবর্ষকেই নন্দলাল তুলির টানে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সৈনিকদের সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলতে যত্ন করেন হরিপুরায়।

কি আশ্চর্য সেই তুলির টান। দেখে দেখে যেন দেখা শেষ হয় না। এমন ছন্দোময় রেখার লীলা বড় দেখা যায় না। সেই দেশী রঙ্‌ যেন দেশকে ফুটিয়ে তুলছে। 'পাটার' মত ছবি ; অঙ্কন পদ্ধতিতে এক একবার মনে পড়ে অজন্তার চিত্রাবলীর কথা, আবার মনে পড়ে আমাদেরই পটুয়াদের কথা ; কিন্তু মনে না পড়ে পারে না তবু নন্দলালকে। এই চিত্রাবলীতে রয়েছে সেই শিল্পীর অম্লান স্বাক্ষর।

কেউ বলবেন—"তা নয় হল, কিন্তু এই কি ভারতবর্ষের সাক্ষ্য? শুধু গ্রামই কি ভারতবর্ষ, শহর নয়? উজ্জয়িনী নেই? নেই বিদিশা, দশার্ণা, নেই বারাণসী পাটলিপুত্র, নালন্দা তক্ষশীলা? কিংবা কলিকাতা বোম্বাই?" আবার কেউ বলবেন, "তাও নয় হল, কিন্তু বিলিতী এমব্রয়ডারী ঘেরা পথ দিয়ে কলকাতার ধনিকগৃহের দ্বিতলে দাঁড়িয়ে সিগারেট-পায়ী আমাদের জন্য খোলা প্রদর্শনী—গান্ধীজীর গ্রামোদ্যোগের সঙ্গে এরই বা কি সঙ্গতি আছে, আর কি করেই বা একে বলা যাবে 'লোকগত শিল্প?' এমনি ধারা বাঁকা তর্ক না শুনেছি তা নয়। দুঃখের বিষয় তাঁরা বলেন না—লোকশিল্প বলতে তাঁরা কি বোঝেন। নন্দলাল শিক্ষিত শিল্পী বলেই কি লোকশিল্প সৃষ্টি করতে অক্ষম? শহরের লোকদের সামনে আমাদের লোকশিল্পের বা গ্রাম-জীবনের কোনো উপদান উপস্থিত করলেই কি সে চিত্র বা সংগীত বা নৃত্য আর লোকশিল্প হবে না? তা হলে তো হরিপুরার মতো লক্ষ লোকের সমাবেশক্ষেত্রেও এরূপ চিত্রাঙ্কনের কোনো সার্থকতাই নেই—তার প্রদর্শনী খোলার কথা তো ছেড়েই দিলাম। শুধু পল্লী-বাসী পটুয়ার হাতেই কি লোকশিল্প তার গতানুগতিক পথে ফুটবে? তা হলে তো তার প্রাণ শেষ হয়ে যাবে—যেমন গেছে আমাদের পটুয়াদের শিল্পের প্রাণ। বরং পল্লীশিল্পের ভিতরে যে প্রাণ আছে এ কালের শিল্পীর প্রয়াস হবে নতুন করে তাকে মুক্তি দেবার, অতীত ও বর্তমানের রূপদক্ষতায় তাকে পরিপুষ্ট করার,—পল্লীশিল্পের ধারাকে তিনি বইয়ে দেবেন সামনের দিকে—অতীতের আবর্তে আবদ্ধ হতে না দিয়ে এগিয়ে দেবেন বর্তমান থেকেও ভবিষ্যতের দিকে। নন্দলালও অতীত যুগকে এ ভাবেই এ কালের মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে দিতে চান।

কোনো শিল্পকে 'লোকগত' বলব, না 'পরলোকগত' বলব, 'পল্লীশিল্প' বলব, না 'নাগরিক শিল্প' বলব—এ সব প্রশ্ন অনেক সময়েই উদ্দেশ্যমূলক। তার বিচার-বিবেচনায় অন্তত দেখতে হবে—সেই শিল্প নিদর্শনের মর্মবস্তু (content) লোকের মর্মকথা কি না, তার রূপরীতি (form) লোকগত কি না; আর আসল কথা—কি সেই শিল্পের লক্ষ্য। এ সব দিকে শিল্পের নিজের সাক্ষ্যই যথেষ্ট—দর্শক, বা শ্রোতাদের মনে কি ভাব সে সঞ্চার করে—যেই হোক সে দর্শক। মনে করিয়ে দেয় কি তার লোক-জীবনের কথা, জনতার সুখদুঃখের কথা, তার বাস্তব রূপ ও ভাবী সম্ভাব্যতার কথা? তা হলে নিঃসন্দেহ তা লোকশিল্প—নিঃসন্দেহ সৃষ্টিশীল সৃষ্টি। [ফাল্গুন, ১৩৫১]

যামিনী রায় ও "জাতীয়" চেতনা

শিল্পাচার্য যামিনী রায়ের চিত্রপ্রদর্শনী বৎসরের পর বৎসর এদেশের শিল্প-রসিকদের একটি প্রধান আকর্ষণ-স্থল হয়ে উঠেছে। এবারও (পৌষ মাস, ১৩৫১) যামিনী রায়ের গৃহে খান তিন-চার ঘরে তিনি তাঁর চিত্রপ্রদর্শনী উন্মুক্ত করেন। ছোট ঘরে, আর বারান্দায় সর্বত্র চিত্র আর নানা চিত্রিত শিল্পবস্তু; আলোকে উজ্জ্বল প্রাচীর থেকে সব কথা কয়ে ওঠে। চারিদিকে কত রঙ্। রঙ্ আর রঙ্—যেন কোথাও ছেদ নেই। ঢুকতেই এই কথাটা মনে হয় বেশি—যেন কোন দেশী মেলার সুসজ্জিত ষ্টলে ঢুক্ছি। হয়ত তার জন্য দায়ী দর্শকেরাও। নানা জাতির নানা দেশের সুবেশ ও সুবেশিনী দর্শনার্থী,—পথে তাদের গাড়ির ভিড়, ঘরে তাদের উৎসাহিত চলাচলের ভিড়—এর মধ্যে নিজেকেই মনে হয় অবান্তর। প্রাচীরে প্রাচীরে এক রূপ জীবন-দর্শনের স্বাক্ষর, এক জীবন-যাত্রার সাক্ষ্য; আর তাদের সাম্‌নে জীবন্ত নর-নারীর অন্যরূপ জীবন-দর্শনের, অন্যরূপ জীবনযাত্রার প্রত্যক্ষ প্রমাণঃ—এর মাঝখানে আমি,—যে প্রাচীরের জীবন দর্শনকেও আপনার সর্বস্ব বলে বুঝি না; চতুর্দিকের নর-নারীকেও আপনার বলে মানি না। তাই নিজেকে মনে করি একান্ত—মেলার দর্শনার্থীর মত একা। শিশুর সরল বিস্ময় নিয়ে নিজে দেখলে হয়ত একভাবে ঐ জীবন-দর্শনের সঙ্গে নিজের অভিন্নতা বুঝতে পারতাম; অতিবিদগ্ধের মত সুমার্জিত দৃষ্টি নিয়ে দেখলেও হয়ত দেখতে পেতাম এ সবের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তা। কিন্তু আমি শিশুও নই, অতি-মার্জিত মানুষও নই—এ দেশের এ কালের সাধারণ মানুষ। সেই সাধারণ মানুষের সাধারণ বুদ্ধি ও অনুভূতি দিয়ে যামিনী রায়ের চিত্র-প্রদর্শনী দেখি—এবং সাধারণ মানুষের মত করেই আনন্দও তাতে পাই।

যামিনী রায়ের নিজের অঙ্কনরীতি আজ সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁর সেই পুরোনো ধরনের আঁকা চিত্রাবলী এবারও রয়েছে, যেন পুরনো চিত্রের নতুন সংস্করণ। যামিনী রায়ের ক্রেতারা নাকি তাতে দুঃখিত। তাঁদের কেনা জিনিস একমাত্র তাঁদেরই ঘরে থাকবে, এই তাঁদের প্রত্যাশা। যুগটা একচেটিয়া কারবারের যুগ—ধনিকতন্ত্রের ঝোঁক হল ব্যবসাপত্র থেকে সংস্কৃতিকে পর্যন্ত একচেটিয়া করে ফেলা। কিন্তু যামিনী রায় তাঁদের নিরাশ করেন—তিনি আমাদের সেকেলে (প্রাগ্‌-ধনিক যুগের) পটুয়া বা কুমোরের মত এক ধরনের চিত্রই বারবার আঁকেন—সংস্করণ নতুন, কিন্তু তবু এক ধরনের যে। যাক,

নতুন সংস্করণ হওয়াতে যাঁরা যে চিত্র ভালবাসেন তাঁরা অনেকে তা কিনতে পারেন। কোনো চিত্র শুধু কোনো ভাগ্যবানের প্রাচীরেই বন্দী থাকবে না। সে তার যশোদার-কৃষ্ণই হোক্ কি গোপনীই হোক্। এটা আমরা ভালোই মনে করি। তা ছাড়া, যামিনী রায়ের চিত্রের দামও তুলনায় কম— যদিও তাঁর ক্রেতারা অনেকেই বিদেশী ও বিত্তবান। এদিকেও যামিনী রায়ের সুবিবেচনা সাধারণের শিল্পরুচি উন্নয়নের সহায়ক। এবারকার 'প্রদর্শনীতে' যামিনী রায়ের দেশী ধরনের চিত্র ছাড়াও বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য খৃষ্ট বিষয়ক চিত্রাবলী, আর তাঁর নানা ল্যাণ্ডস্কেপ। কিছুকাল ধরেই শিল্পী এ সব দিকে মন দিয়েছিলেন। প্রথম দিকে মনে হয়েছিল তাঁর খৃষ্ট চিত্রমালায় গথিক্, বাইজেন্টাইন বা অনুরূপ পদ্ধতির ছাপ রয়েছে—এখন মনে হয় তা আমাদের দেশী পটের মত হয়ে উঠছে, আমাদের নিজস্ব হচ্ছে। ল্যাণ্ডস্কেপে কিন্তু এখনো ফরাসী শিল্পীদের ছাপ স্পষ্ট, সিজান, ভান গোগের কথা বিদগ্ধদের মনে পড়ছে। তবে যামিনী রায় তাতে কোথায় পৌছবেন তা ঠিক নেই।

শিল্পী যামিনী রায় কোথা থেকে যাত্রা শুরু করে কোথায় এসে পৌচেছেন—এ ইতিহাসে অবশ্য লাভ নেই। যখন প্রথম তিনি এই নূতন জগতে প্রবেশ করলেন তখন দু'জন শিল্প রসিকের থেকে সে বার্তা আমরা শুনেছিলাম—শ্রীযুক্ত নীরদচন্দ্র চৌধুরী ও অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়। শিল্পীর গৃহে তাঁর শিল্প নিদর্শন তখন দেখেছি, তাঁর নিজের মুখেও শুনেছি—এ শুধু তাঁর নিজের জগৎ নয়, আমাদের জাতির সহজ ও স্বাভাবিক জগৎ এটাই। আমাদের সাধারণ দৃষ্টিতে তখন মনে হয়েছিল তিনি বাঙলার পটের পদ্ধতিতে নিজের প্রকাশ পথ পরিষ্কার করেছেন। তারপর থেকে যামিনী রায় সে পথ ধরে চলেছেন—চলেছেন, থেমে থাকেননি। তিনি কেবলই বাহুল্য বর্জন করে সহজ থেকে সহজতর হতে চাইছেন, রূপকে বন্দী করতে চাইছেন সরলতর রূপের নিয়মে, আপনাকে প্রকাশ করতে চাইছেন স্ব-ভাবগত নিয়মে, মানে জাতির স্বভাবগত পদ্ধতিতে। তিনি মনে করেন এই তাঁর স্বধর্ম, কেন না, এইটাই আমাদের জাতির পক্ষে স্বধর্ম। আমরা এই ভাবেই নিজেদের প্রকাশ করেছি, এই ভাবেই আমাদের পক্ষে কথা বলা সম্ভব;—আমরা "ওদের মত" নই, সে জীবন-যাত্রা আমাদের নয়, সে জীবন-দৃষ্টিও আমাদের নয়; সে জীবন-ধর্ম আমাদের পক্ষে পরধর্ম। এই দিক থেকে দেখলে—যামিনী রায়ের শিল্পকলা 'লোকগত' তো নিশ্চয়ই, তা একেবারে নিভাঁজ "জাতীয়" শিল্প। মানে, আমরা যদি সত্যই জাতি-মানসকে চিন্‌তাম তা

হলে এ শিল্পকেই বলতাম "জাতীয় শিল্প।" কিন্তু দেখা যাচ্ছে—আমাদের যারা জাতীয়তাবাদী, তাঁরা এ শিল্পে উৎসাহী নয়, এবং সাধারণ লোক আজ অন্তত আর এ শিল্প দেখে চিনতেও পারে না। তার কারণ বলা যেতে পারে এই—জাতীয় মন যদিও বদলাতে পারে না, বদলায়নি, তবে জাতীয় ধর্ম থেকে বিচ্যুত হয়ে সাময়িকভাবে আমরা এবং লোক-সাধারণও সেরূপ সাময়িকভাবে স্বধর্ম খুইয়েছি।

কিন্তু দেখা গেল—যারা এ জাতির কেউ নয়, তাঁরাই যামিনী রায়ের শিল্পকে সমাদর করছেন! বলা যেতে পারে তার কারণ—তাঁরা তাঁদের 'স্বধর্ম' হারান নি; তাই অন্যের ধর্মের'ও মানে বুঝতে পারেন—যেমন, তাঁরা নিগ্রো আর্ট বুঝতে পারেন, চীন আর্ট বুঝতে পারেন। আমাদের আর্টও তাই বুঝতে পারেন। কিন্তু আরও কারণও থাকতে পারে। শিল্পের এমন কোনো একটা মৌলিক সত্য আছে কি, যার দরুন তা পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্যে ঢাকা পড়ে না, বাহ্যবস্তুর বাহ্য সাক্ষ্যের উপরে তা অন্তত নির্ভর করে না? তা থাকলে যে কোনো জাতির ও যে-কোনো কালের মানুষ সেই মৌলিক মাপকাঠিতে যে কোনো শিল্পকে বুঝতে পারবে। তখন দেখা যাবে—শিল্পীর স্বধর্ম, তার জাতির 'স্বধর্ম' এ সব গৌণ, —আসল হল 'শিল্পের ধর্ম।' এ কথা সত্য হলে—যামিনী রায় যাই বলুন—ইউরোপীয় শিল্প-রসিকরাও তাঁর শিল্পকে সহজে মানতে পারে—মূল সেই শিল্প-ধর্মের স্বাক্ষর যদি তাঁর চিত্রে পড়ে। ঠিক এই জন্যই এ দেশেরও যাঁরা পরিশীলন্-কুশল রসিক—সর্বাপেক্ষা বিজাতীয় তাঁরাই হলেন যামিনী রায়ের শিল্পের সর্বাপেক্ষা বেশি সমজ্‌দার! তাঁরা অনেকেই জাতি-চিত্ত, জাতীয় ভাবধারা থেকে বিচ্যুত, —যামিনী রায়ের মতে তাঁদের উপরই পরধর্মের প্রভাব পড়েছে বেশি। তাঁর এই সর্বাপেক্ষা বেশি "জাতীয় শিল্পের" এদেশে কিন্তু সর্বাপেক্ষা বেশি গুণগ্রাহী তাঁরাই। কিন্তু তাঁদের এই উৎসাহ খাঁটি, না মেকি? হয়ত দুইই—কতকটা রোজার ফ্রাই, ক্লাইব্‌ বেল্‌ প্রমুখদের শিল্প-নজিরের ফলে তাঁদের এ দৃষ্টি জন্মেছে, কতকটা এদেশে পিকাসো, মাতিস্‌ আবিষ্কারের নেশায় তাঁরা উৎসাহী। আবার এও ঠিক, শিল্পীর মতবাদ যাই হোক্, যামিনী রায়ের শিল্পে তাঁদের রসবোধ নিশ্চয়ই তৃপ্ত হয়।

আমাদের মত সাধারণ মানুষ কিন্তু পটকেই চরম সৃষ্টি বলে বোঝে না; এমন কি, আমাদের জাতীয় প্রাণ যে একমাত্র ওই ভাবেই আপনাকে প্রকাশ করতে সক্ষম, তাও অনুভব করি না—হতে পারে, পরধর্মের ছাপ আমাদের মনে

পড়েছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ হিসাবে আমরা অনন্তনির্ভর গুণ বা abstract qualities-কেই শিল্পের একমাত্র স্বীকার্য বলে বুঝি না। আমরা রূপ দেখি, কিন্তু অত সূক্ষ্ম করে ব্যঞ্জনাময় রূপ বা significant forms-এর তত্ত্ব বুঝি না। অনেকটাই আমরা বস্তুরূপের দ্বারা প্রভাবান্বিত, তা দিয়েই শিল্পের রূপকে বিচার করি। আমাদের উপহাস করা যেতে পারে, আমরা ফটোগ্রাফ দেখলেই পারি। কিন্তু সে উপহাসও উপহাস্য। কারণ শিল্প যে ফটোগ্রাফ্ নয়, এটুকু আমরা বুঝি। দেশী হাটে বাজারে মেলায় লক্ষ্মীর সরা, কিংবা চালচিত্র, আল্‌পনা এ সব দেখে এখনো সুখ পাই; তবু বস্তুরূপকে অগ্রাহ্য করলেই শিল্পের চরম হয় তা মানি না। কিন্তু তথাপি আমরা স্বীকার করব যামিনী রায়ের শিল্প প্রদর্শনীতে গিয়ে তাঁর চিত্রাবলী দেখে, এমন কি, তাঁর ল্যাণ্ডস্কেপ্‌গুলি দেখেও পরম আনন্দলাভ করেছি। আমরাও বুঝি, যামিনী রায়ের শিল্প-বলে বাঙলা দেশ চিত্রকলা-জগতে এক নূতন স্বীকৃতির অধিকারী হয়েছে।

'শিল্পের ধর্ম' 'জাতীয় মানস,' বা 'শিল্পীর স্বধর্ম'—প্রভৃতি কথা থেকে নানা রকমের রহস্যবাদ জন্ম লাভ করে। আমরা সাধারণ মানুষেরা তাতে বিভ্রান্ত হই। দরকার বরং এভাবে আমাদের বিভ্রান্ত না করে আমাদের দৃষ্টি ও অনুভূতিকে স্বচ্ছ করে তোলা—ধর্মাধর্ম আপনা থেকেই তারপরে একদিন স্থির হয়ে যাবে। অথবা ধর্মস্য তত্ত্বং চিরদিনই থাকবে নিহিতং গুহায়াং। [ফাল্গুন, ১৩৫১]

"সম্পাদক" সম্মেলন

ভারতবর্ষের সংবাদপত্র সম্পাদকদের সম্মেলন হয়ে গেল এবার কলকাতায় ২৭শে, ২৮শে জানুয়ারী (১৯৪৫)। 'বোম্বাই ক্রনিকেলের' মিঃ ব্রেল্‌ভি ছিলেন সভাপতি; 'বসুমতী'র শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ছিলেন অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি। সংবাদপত্রের এখনো যে দুর্দিন যাচ্ছে, সম্মেলনের সম্পাদক তাঁর রিপোর্টে সে-সব কথা এবং সংবাদপত্রের উন্নতির অন্যান্য প্রশ্ন স্বাধীনতাবাদী সম্পাদকের মতই স্পষ্ট ও সহজভাবে আলোচনা করেছেন। হেমেন্দ্রপ্রসাদ বাবু বলেছেন বাঙলার সংবাদ পত্রের ইতিহাস; বেশ সুন্দর ও তথ্যবহুল সেই আলোচনা।

সংবাদপত্রের যে-সব দুর্ভাগ্যের কথা আলোচিত হয়েছে আমাদের বিশ্বাস তার

অনেকগুলোরই মূলে আছে জাতীয় দুর্ভাগ্য—মানে, সাম্রাজ্যবাদী শাসন। যেখানে জাতিরই স্বাধীনতা নেই, সেখানে মুদ্রাযন্ত্রের বা সভা-সমিতির স্বাধীনতা থাকবে কতটুকু? অন্তত গণতান্ত্রিক অধিকার থাকলেও সংবাদপত্র কতকটা নির্ভয়ে চলতে পারে। এই যুদ্ধকালে নানা জরুরী আইনের ফলে সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ ও সম্পাদকরা একেবারে নাগপাশে বাঁধা পড়েছেন—কি সংবাদ সংগ্রহে, কি সংবাদ প্রকাশে, কিংবা সম্পাদকীয় মন্তব্যে, প্রবন্ধে, কিছুতেই তাঁরা একটা যুক্তি-যুক্ত অবকাশও পাচ্ছেন না। এই রাষ্ট্রীয় দুর্ভাগ্যের অবসান না ঘটলে সংবাদ-পত্রের দুর্ভাগ্য একেবারে ঘুচবে না। আমাদের দেশের সংবাদপত্র সেবীরা অবশ্য এই সত্য ভালো করেই জানেন। কারণ, এ দেশের সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছিল এই প্রেরণায়—রাষ্ট্রীয় অধিকার আয়ত্ত করতে হবে। সম্পাদকরাও তখন সকলেই এই উদ্দেশ্যে নেমেছিলেন সংবাদসেবায়, দেশসেবার ইচ্ছায়। এ ঐতিহ্য পরম গৌরবের।

সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের প্রয়াস ও প্রস্তাবে তাই দেশের জনসাধারণের সম্পূর্ণ সমর্থন আছে, তা তারা সর্বান্তঃকরণে জানাতে পারে। কিন্তু তারপর দেশের লোক দু'একটি কথা এই 'সম্পাদকমণ্ডলীকে' নিবেদন করতে চায়। সংক্ষেপে তা এই: এই দুর্ভাগ্যের মধ্যেও ভারতীয় সংবাদপত্রের কর্তৃপক্ষ যতটুকু তাঁদের কর্তব্য পালন করতে পারতেন তা করেছেন কি? কথাটা পরিষ্কার করে বলি। প্রথম, কাগজের অভাব পড়ল (অবশ্য তাতেও কেমন ভাবে চোখে-না-দেখা দৈনিকের নামে কোটা পাওয়া যায়, তা'ও আমরা জানি), কাগজের আয়তন কমল, দাম বাড়ল। ফলে দেশের লোক অনেকে কাগজ কিনতে পায় না, কিনবার অবস্থাও হারায়। অন্যদিকে সরকার থেকে বিজ্ঞাপনের হার ও স্থান বাড়িয়ে দিয়ে সংবাদপত্রের আর্থিক উন্নতির 'রাজপথ' খুলে দিল। মানে, দেশের লোকের কাগজ পড়বার অধিকার খর্বিত করে কর্তারা কাগজওয়ালাদের মুনাফা বাড়িয়ে দিলে। নিশ্চয়ই, তাহলে আর্থিক দুর্ভাগ্য সংবাদপত্রের ঘটেনি। দ্বিতীয়ত, সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের কথা। সত্যই কি এদিকে সম্পাদকেরা দায়িত্ব পালন করেছেন? চোরা-বাজারের ব্যাপারে গান্ধীজীও বিচলিত হয়েছেন; কিন্তু বিড়লাদের চটের ও কাপড়ের কারবার, সিংঘনিয়াদের কয়লার ব্যাপার, কলকাতায় ও বাঙলায় চালের, এমন কি নিউজ প্রিণ্টের চোরাবাজারের যে সব সংবাদ দেশবাসীকে জানানো উচিত ছিল, তা কোন্ সংবাদপত্রে কতটুকু বেরিয়েছে? সংবাদ সংগ্রহ ও প্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কি তার সত্বাধিকারীর স্বাধীনতা—দেশের সামনে যে সংবাদ ইচ্ছা পরিবেশন করবার, বা না করবার?

এইখানেই তৃতীয় কথাটি এসে গেল : সংবাদপত্রে সত্যই সম্পাদকের স্থান কোথায় ? কথাটা বাঙলাদেশের সম্পাদকদের পক্ষে অবশ্য বিশেষভাবেই জিজ্ঞাসা করা উচিত। সংবাদপত্রের পুরনো যুগ এদেশে অস্ত গেছে, আজ এদেশে সাবাদপত্রের উদ্দেশ্য সংবাদ সেবা নয়, উদ্দেশ্য সংবাদ ব্যবসা। অবশ্য অনেক ব্যবসায়ের অপেক্ষাই এটা বেশি দায়িত্বপূর্ণ কাজ, গৌরবের কাজ। কিন্তু কথা এই —এ কাজে সম্পাদকের স্থানটা কোথায় ? বাঙলাদেশে আসল সম্পাদক আজ হয় বেনামী থাক্‌তে বাধ্য, নয় নাবালক থাক্‌তে স্বীকৃত ; স্বাধীন সাংবাদিক-সম্পাদক আজ বড় নেই। অন্য প্রদেশেও অনেক সম্পাদকই কর্তৃপক্ষের ভৃত্য, তবে হয়ত তাঁদের সম্পাদকত্ব ও সাবালকত্ব বরদাস্ত করা হয়। ধনিকতন্ত্রের আর একটু বিকাশ বাঙলাদেশে না ঘটলে জমিদারী মেজাজেই সংবাদপত্র-কর্তৃপক্ষও চলবেন, এবং মনে করবেন—সম্পাদক তাঁর নায়েব বা মুন্সি। ধনিকতন্ত্রের আরও একটু বিকাশ ঘটলে তিনি বুঝবেন যে, ব্যক্তিত্ববান্ সম্পাদককে কতকটা স্বাধীনতা দিলে লোকে সম্পাদকীয় মন্তব্যে গুরুত্ব আরোপ করে, সংবাদপত্রের সত্বাধিকারীরই মুনাফা তাতে বাড়ে। কিন্তু সংবাদপত্রের সেই ধনিকতান্ত্রিক স্তরও অন্য প্রদেশে কি সত্যই আস্‌ছে ? সংবাদপত্র সম্পাদক সম্মেলনের ষ্ট্যাণ্ডিং কমিটি ও কর্তৃপক্ষের হিসাব জানি না ; নিশ্চয়ই তাঁরা আসলেও সম্পাদক, সত্বাধিকারী বা সত্বাধিকারীর ম্যানেজার মাত্র নন, এইরূপই হওয়া বাঞ্ছনীয়। সম্পাদক সম্মেলন তাই সংবাদপত্রে সম্পাদকের স্থানটা কোথায়, তা চিহ্নিত করবার চেষ্টা করবেন, এইটাও আশা করা যায়। [ফাল্গুন, ১৩৫১]

ছাত্রসমাজ ও পরীক্ষা

পরীক্ষাগারে ছাত্রদের অসংযত ব্যবহার দেখে সম্প্রতি শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ বিচলিত হয়ে পড়েছেন। বি-কম্ ও ডাক্তারি পরীক্ষায় ছাত্ররা পরীক্ষাগৃহেই বিঘ্ন উৎপাদন করে ; মফঃস্বলেও তৎপূর্বেই কোথাও কোথাও পরীক্ষাগৃহের পরিদর্শক বা ইন্‌ভিজিলেটর নানা ভাবে লাঞ্ছিত হয়েছেন। ব্যাপারটা অবশ্য এখন চরমে উঠ্‌ছে তাই সকলেই অবহিত হয়েছেন। কিন্তু এবিষয়ে একটু গভীর ভাবে ভাবা দরকার। পরীক্ষা ও পরীক্ষাপদ্ধতি বিষয়েই একটা সংশয় আছে। এ ভাবে সত্যই ছাত্রের পরীক্ষা সম্ভব হয় কিনা, তা অনেকেই সন্দেহ করেন। বিশেষত

যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থী সংখ্যা হয় হাজারে হাজারে, পাশ করাতে হয় গুণানুসারে শুধু নয়, সংখ্যানুপাতে,—শতকরা ৬০ বা ৬৫ এমনি নানা অনুপাতে —পরীক্ষকও আর গুণানুসারে নিযুক্ত হন না, নানা ভাগ্য-বৈগুণ্যে নিযুক্ত হন, তখন "পরীক্ষা" সত্যই অসম্ভব। তাতে সুবিচারও হয় না। আমরা ব্যক্তিগত ভাবেই জানি—যে-পরীক্ষার্থীকে একজন পরীক্ষক ২৯ দিচ্ছেন, না জেনে আর একজনই তাকে ৫২ দিতে প্রস্তুত; একজনের বিচারে যে পাচ্ছে ৬২, অন্য জনের বিচারে সেই ৮৪ পাওয়ার যোগ্য। অর্থাৎ ছোট, বড়, মাঝারি, কারও প্রতি সত্যকারের সুবিচার এই পদ্ধতিতে হয় কিনা সন্দেহ। গড়ে একটা রাফ্ জাস্টিস্ হলে মনে করতে হবে, তা'ই যথেষ্ট। কিন্তু তাতেও পারস্পরিক তফাৎ সুনিশ্চিত রূপে নির্ধারিত হয় না। তাই পরীক্ষার উপর অশ্রদ্ধা জন্মে। ভারতবর্ষের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়েও যে অবস্থা অন্যরূপ তা নয়। এই মৌলিক ত্রুটি মেনে নিয়েই তবু আমরা পরীক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করি—দেখি তবু যথাসাধ্য তা যেন ন্যায়োচিত হয়। কিন্তু সেদিকেও যে অধোগতি ঘটেছে তা হঠাৎ ঘটেনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় বিশেষ বিশেষ স্থলে পক্ষপাতিত্বের কথা অন্তত আমরা পঁচিশ বছর ধরে শুনছি। পরীক্ষার প্রশ্নপত্র পূর্বাহ্নেই প্রকাশিত হয়ে পড়তে শুরু করে ১৯১৭ থেকে—একেবারে সেই ফুটো বন্ধ করা গিয়েছে কি? 'এম-এর' 'নাইন্থ্ পেপারের' কথা ছাত্র ও অধ্যাপকবর্গ সকলেরই সুবিদিত। এ ভাবেই ছাত্র ও অভিভাবক মহলে পরীক্ষার প্রতি শ্রদ্ধা আরও কমে এসেছে। বছরের পর বছর যেমন এই অশ্রদ্ধার জন্য ছাত্রদের পরীক্ষাগৃহে ন্যায়বোধ কমেছে, অধ্যাপক ও কর্তৃপক্ষের তেমনি শিথিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। অসাধুতা আজ শুধু পরীক্ষার্থীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা কক্ষে তা ছড়িয়ে পড়েছে!

তাই বলে প্রতিবিধান করতে দেরী করা আর উচিত নয়। কারণ, হাজার হোক্, যতই এই শিক্ষাপদ্ধতির নিন্দা করি—আমরা জানি এই শিক্ষায়ও আমরা অন্তত সত্যকারের শিক্ষার মর্যাদা বুঝতে পারি, আর জানতে পারি আমাদের জাতীয় অমর্যাদার স্বরূপ। [জৈষ্ঠ্য ১৩৫২]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপরিচালনার উপর বাঙলা দেশের বর্তমান ও ভাবী সংস্কৃতি অনেকাংশে নির্ভর করে। এমন কি, বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা থেকে বাঙলার মধ্যবিত্ত সমাজের অবস্থা ও বাঙলার ভদ্র সংস্কৃতির অবস্থাও খানিকটা বুঝতে পারা যায়। তাই কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আগামী বৎসরের বাজেটে সাড়ে চয় লক্ষ টাকা ঘাটৃতি দেখে সবাই চিন্তিত হয়েছেন। সরকারের থেকে ঐ ঘাট্‌তির টাকা দেশবাসী দাবী করছেন। সন্দেহ মাত্র নেই যে, এত বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিচালনার জন্য যেরূপ আর্থিক সাহায্য সরকারের করা উচিত, কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেরূপ সাহায্য পায় না। আর এই দরিদ্রের দেশেও বিশ্ববিদ্যালয়ের খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্য না হলে তার সুপরিচালনা সম্ভব নয়।

অবশ্য সুপরিচালনা জিনিসটি শুধু মাত্র টাকার দ্বারাও আয়ত্ত করা যায় না। বরং দুঃখের সঙ্গেই মানতে হবে, কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক কাজে টাকার অভাব ঘটেনি, তবু ঘট্‌ছে পরিচালনা-শক্তির অভাব। তার কোনো কোনো দিকে আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষেরও দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এ সম্বন্ধে তাঁদের শিথিলতা ও অক্ষমতা এ দেশীয় আমলাতন্ত্রের শিথিলতা ও অক্ষমতার থেকে কোনো অংশে কম নয়। চোরা কারবারী ও চোরা কর্মচারী দেশ দখল করে বসায় ব্রিটিশ আমলাতন্ত্র শেষ পর্যন্ত নিজেও বিপন্ন বোধ করছে; বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা ব্যাপারে দুর্নীতি চরমে ওঠায় বিশ্ববিদ্যালয়েরও ছোট বড় কর্তারা এখন বিব্রত বোধ করছেন। দেখছি, ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পাঠ্যসংস্কারের কথা তাঁরা এ সম্পর্কে চিন্তা করছেন। হয়ত আরও অন্য দিকেও তাঁরা অবহিত হচ্ছেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রশ্ন শুধু মাত্র দু'এক পাতায় আলোচনা করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। বড় করে আলোচনার যে সার্থকতা আছে, তা-ও আমরা ঠিক বুঝি না। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়-কমিশনের সুবিখ্যাত রিপোর্ট অনুযায়ী সংস্কার পঁচিশ বৎসরেও কিছুই করা হয়নি। অথচ এই পঁচিশ বৎসরে এই পৃথিবী এত পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে যে সেই পাণ্ডিত্যের পোকায়-কাটা বিধান দিয়ে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই আর চলতে পারে না। আশ্চর্যতর তবু এই—আরও আগেকার কার্জনি আইনে বিশ্ববিদ্যালয় চলেছে সম্পূর্ণরূপে সরকারের মনোনীত

কর্তাদের নিয়ে। বাঙলাদেশে অনেক জনপ্রিয় মন্ত্রী ও ভাইস্‌চ্যান্সেলর এলেন, তাঁরা মাধ্যমিক শিক্ষার নিষ্ফল বিলগুলি নিয়ে দেশের দূষিত আবহাওয়াকে যথাসম্ভব নিজেদের বিষে আরও বিষাক্ত করে গিয়েছেন, কিন্তু কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় সেই কার্জনি আইনের জোরে চল্‌ছে তেমনি—ভারতে সাম্রাজ্যবাদের মত।

সাম্রাজ্যবাদের আওতায়, আমরা দেখছি, সৃষ্টি হয় ছোটবড় জমিদার তালুকদার নকল সামন্ত-মালিক। কার্জনি আইনে বিশ্ববিদ্যালয়েও তেমনি জমিদার-তন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থাৎ বাঙলার বিশ্ববিদ্যালয় একেবারে বাঙলাদেশে ইংরেজ শাসনের একটি চিত্র—সেই শাসনের আসল রূপ হল জমিদারতন্ত্র। তাতেই মুশ্‌কিল হয়েছে বেশি—এই কায়েমিস্বার্থবানরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জনি আইন পরিবর্তনের বা সত্যকার সংস্কারের প্রয়োজন বোধ করেন না, যেমন বাঙলার জমিদাররাও বোধ করেন না বাঙলার ভূমিসংক্রান্ত আইন কানুনের পরিবর্তন। দেশের সাধারণ লোকও প্রতারিত হয়। তারা মনে করে, আইন যাই থাক্‌ আপাতত দেখছি মালিকানা আমাদের দেশীয় জমিদারদের হাতে; এইটাই লাভ। নইলে তো খাশ মহলের প্রজা হয়ে আরও মার খেতে হত। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভুরা এই ভয়টার বেশি সুযোগ নিতে পারেন, নেনও। কারণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সাধারণ লোকের সম্পর্ক নেই, ভদ্রসাধারণই হচ্ছে তার চক্ষে সাধারণ। এই ভদ্রসাধারণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয়, বহুলাংশে হিন্দু। তাদের মনে ভয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে জমিদারীতন্ত্র শেষ হলে হয়ত আসবে নবাবী আমল অথবা পাকিস্তান। তাই হিন্দুস্থানী জমিদারতন্ত্রকেও ভদ্রসাধারণ পুষ্ট করেন। অনেকের ব্যাক্তিগত স্বার্থও তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে—যেমন পড়ছে বাঙলার জমিদারী প্রথার সঙ্গে ভদ্রলোকের স্বার্থ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এই মূল সংস্কার না হতে কতটা শিক্ষা সংস্কার সম্ভব তা জানি না। অন্তত জমিদারী প্রথার "জড়" না ছাড়ালে বাঙলার সংস্কৃতি ঠিক সম্পূর্ণ হবে না, সর্বাঙ্গীণ ও সার্বজনীন হবে না; তা আমরা বেশ উপলব্ধি করি। বিশ্ববিদ্যালয়েও যতই এই প্রথা চেপে থাক্‌বে, ততই শিক্ষা ও সংস্কৃতি দু'এরই সংকট দিনে দিন জ্যামিতিক নিয়মে তীব্রতর হয়ে উঠবে। তথাপি এ প্রথা উচ্ছেদ সাপেক্ষেও কিছু কিছু সংস্কারে হাত দিতে হবে—নিতান্ত দায়ে পড়ে। সেদিক থেকেও বিশ্লেষণ করলে দেখি—সমস্যা সহজ নয়। ছাত্র, শিক্ষক, শিক্ষা পদ্ধতি এবং সর্বশেষে বাঙলার সামাজিক

ভাঙন,—এ সব পরস্পরে মিলে আজকের এই শোচনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে ; আর সে অবস্থার মূল রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের জমিদারীতন্ত্রে ; এই অবস্থা ক্রমান্বয়ে কঠিনতর হয়েছে এই জমিদারদের গত পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের পরিচালনার ফলে।

বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু আমলাতন্ত্রের মতই যেমনি নিজের কীর্তি দেখে আজ চমকিত হচ্ছেন, তেমনি আবার আমলাতন্ত্রের মত গতানুগতিক ভাবে সে ইতিহাসের অনুবর্তন করছেন। একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিচ্ছি। অতি স্ফীত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় মাথাভারী আমলাতন্ত্রের মত অচল। কোন্ সাহসে এমনি সময়ে তাঁরা আবার জর্ন্যালিজমের বা বার্তাবিদ্যার ফ্যাকালটির ভার গ্রহণ করছেন? সত্য বটে, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় এ বিদ্যার ভার নেয়। কিন্তু সে সব বিশ্ববিদ্যালয়ের কি এ দশা? না, সে সব দেশে জর্ন্যালিজমেরই এ-দশা?

কথাটা সংক্ষেপে বোঝা দরকার। বার্তাবিদ্যা এ-কালের এক বড় বিদ্যা। তার প্রসার সর্বত্র ঘটছে। এ যুদ্ধের পরে তার আরও বিস্তৃতি অবশ্যম্ভাবী। সংবাদসেবা আমাদের দেশে ছিল স্বদেশসেবার একটা দিক। ইতিহাসের নিয়মেই তা হয়েছে এখন সংবাদব্যবসা। বড় বড় ব্যবসায়ীরা সংবাদপত্রের অধিকারী হচ্ছেন, আবার বড় বড় সংবাদপত্রের মালিকেরা হচ্ছেন অন্য ব্যবসায়ীর সহযোগী। এইটাই নিয়ম। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের আওতায় অনিয়মই হয় নিয়ম, এদেশে সংবাদব্যবসায়ীও সোজা পথে চলেন না। বাঙলাদেশে সংবাদসেবীর যে অধোগতি ঘটল তার কারণ—সংবাদপত্রের অধিকারী সস্তা বুদ্ধিজীবী যথেষ্ট পান, আর সস্তা বুদ্ধিজীবীও সংবাদপত্রকে তাঁর একমাত্র জীবিকা বলে গ্রহণ করেন না। তাঁরা অধ্যাপনা হতে বেতার বক্তৃতা, ইনসিওরেন্সের দালালি বা ব্যবসায়ী সঙ্ঘের গুপ্তচরবৃত্তি কিছুই করতে কুণ্ঠিত নন ; সংবাদপত্রের মালিকও নিজের মুনাফা, নাম, শাসন ও প্রভাব তাঁদের মারফতে বাড়াতে সুবিধা পান বেশি। সংবাদপত্রের মালিক ও সাংবাদিকদের সঙ্গে জমিদার ও বণিক দলের স্বার্থসম্পর্ক ঘনিষ্ঠ। আর সেই সম্পর্কের একটা বড় মিলনকেন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাই, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্ন্যালিজমের শিক্ষার এই ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে সংবাদপত্রের মুখ বন্ধ করা হচ্ছে, সাংবাদিকদেরও বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে, আবার বুদ্ধিজীবী মহলের মুখবন্ধেরও আয়োজন করছেন এভাবে সংবাদপত্রের মালিকেরা!

বলা বাহুল্য সংবাদ-বিদ্যা শিক্ষার আয়োজন নিঃসন্দেহে করতে হবে। কিন্তু সে-আয়োজন স্বতন্ত্র কোনো নতুন প্রতিষ্ঠানে হতে পারে। অনেক দেশেই তা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়েই হতে হবে এমন কারণ নেই। আমরা জানি, ফিল্‌ম সায়েন্স ও ফিল্‌ম আর্টও শিক্ষার ব্যবস্থা হওয়া উচিত; সেলস্‌ম্যানশিপ শিক্ষারও ব্যবস্থা দেশে থাকা চাই। তা, সবই কি বিশ্ববিদ্যালয় করবে? বিশেষত, কল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয় মেদবৃদ্ধিতে যখন অচল তখন এ সাহস করে কেন? কিছু লোককে চাকৃরি দিয়ে এই জমিদার-তন্ত্রের পোষক করার জন্য? সংবাদপত্রগুলোকেও তাঁদের অধিকতর বন্ধুতে পরিণত করার জন্য? বিশ্ববিদ্যালয় আত্মসংস্কার না করে আর যেন অন্য কাজে হস্তার্পণ না করেন। [আষাঢ়, ১৩৫২]

"গৃহযুদ্ধের" পর্বারম্ভ

"বাইশে শ্রাবণ," ৭ই আগস্ট, রবীন্দ্রনাথের মহাপ্রয়াণের দিন। এমন বাঙালী প্রতিষ্ঠান বোধ হয় নেই যেখানে সে-সপ্তাহে আমরা কবির দানকে স্মরণ করি নাই, সগৌরবে ভাবি নাই সে দানে আমাদের প্রত্যেকের মন বুদ্ধি কতটা সুন্দর ও প্রসারিত হয়েছে; বাঙালী জাতির স্থান পৃথিবীর আসরে কতটা সুনিশ্চিত হয়েছে; আর মহামানবতার দিকে সকল মানুষেরই যাত্রাপথ কতটা সুপ্রশস্ত হয়েছে। সে-সব কথার প্রতিধ্বনি তখনো মিলিয়ে যায় নাই; শ্রাবণ মাসও ফুরায় নাই, আগস্ট মাসতো শেষ হয়ই নাই;—অমনি ১৬ই আগস্ট (১৯৪৬), ৩২শে শ্রাবণ (১৩৫৩), আমরা কলকাতা শহরের বাঙালী সভ্যতার এক আত্মঘাতী অধ্যায় আরম্ভ হতে দেখলাম, অন্তত চারদিন ধরে দেখলাম ইতরতার অভিযান। আর আজ (২৩শে আগস্ট) সাত দিন পরেও দেখছি তারই ক্লেদাক্ত আশঙ্কা ও উত্তেজনা। সাধারণভাবে অনুশোচনা এখনো দেখি না, সুস্থ বাস্তব দৃষ্টিরও সাধারণত পরিচয় এখন পর্যন্ত পাই নাই। যা মনে মনে আশঙ্কা করা গেছল হয়ত এবার তাই আরম্ভ হল—আমাদের বিশ বৎসরের পুরনো 'সাম্প্রদায়িক সমস্যা' এবার বুঝি 'গৃহযুদ্ধ' বা 'সিভিল ওয়ারের' পর্বে এসে ঠেকেছে। এ-আশঙ্কা মিথ্যা হলেই জাতির সৌভাগ্য, সংস্কৃতির স্বস্তি, তা না বল্‌লেও চলে। আর মিথ্যে

না হলে—আগামী বিশ বৎসর কেন, হয়ত আরো দীর্ঘকাল চীনের মত এদেশেও আমরা সাম্‌নে দেখছি 'গৃহযুদ্ধ' :—'পূর্ব-পাকিস্তান' বা 'অখণ্ড হিন্দুস্থান' তো দূরের কথা, 'অখণ্ড বাঙলা'ও নয় ;—খণ্ডিত বাঙলা, সাম্প্রদায়িক লোকাপসরণ ও কোটি কোটি লোকের বাস-পরিবর্তন এবং 'অখণ্ড ইংরেজ-স্থান'—'সবার উপরে ব্রিটেন সত্য, তাহার উপরে নাই !'

এ শুধু রাজনৈতিক বা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন নয়। সে-দিক থেকে এ নতুন পর্বের আলোচনা দু'চার কথায় অসম্ভব। কিন্তু রাজনৈতিক হিসাবে, এমন কি সুস্থ হিন্দু, সুস্থ মুসলমান হিসাবেও যা কর্তব্য, তা তবু অস্বীকার করবার উপায় নেই। অন্তত সংস্কৃতিবোধ যাঁদের লোপ পায় নাই, তাঁরা এ-কর্তব্যকে অস্বীকারও করবেন না ; সুস্থ জীবনবোধের দায়েই তাঁরা স্থির করে নেবেন নিজেদের কঠিন, দুঃখসাধ্য এই কর্তব্যের পথ।

সুস্থ পথে আজ পদক্ষেপ কত দুঃসাধ্য হয়ে উঠ্‌ছে তা আমরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার বশেই প্রত্যেকে জানি। দু' একটি সংবাদপত্রের বিশেষ করে উত্তেজনাই আজ জীবিকা। কেউ আমরা হিন্দু-পাড়ায় ছিলাম, দেখেছি তাই হিন্দুর দৌরাত্ম্য। কেউবা আমরা মুসলমান মহল্লায় ছিলাম, দেখেছি তাই মুসলমানের দৌরাত্ম্য। যারা মিশ্রিত পল্লীতে ছিলাম তারা দেখেছি উভয় সম্প্রদায়ের উন্মত্ততা। কারা বেশি 'নৃশংস', কে 'জয়ী' কে 'পরাজিত', কে কত 'বীরত্ব' (মানে উন্মত্ততা) দেখিয়েছে, এসব আলোচনা এখন যখন শুনি তখন আমাদের সহজ, সুস্থ, সংস্কৃতির ও সত্যকারের রাজনৈতিক বুদ্ধিরও যে পরীক্ষা দিতে হয়, তা অস্বীকার করা যায় না। তবু এ দায়িত্ব পালন করাই সংস্কৃতির ও জাতীয় চেতনার দায়। বিতৃষ্ণায় মন বিষিয়ে ওঠাই এক্ষেত্রে স্বাভাবিক, তাতে হয়ত কথাবার্তায় সত্যই সুবুদ্ধির পরিচয়ও সব সময় দেওয়া হয় না। কিন্তু নীরবতাও সুস্থ জীবনের পক্ষে অনেক ক্ষেত্রে সুবর্ণ পন্থা নয়।

'কে প্রথম ঢিল ছুঁড়েছিল'—স্বাভাবিক হলেও এ গবেষণা আমাদের পক্ষে আমরা নিষ্প্রয়োজন মনে করি। কারণ, আমরা অন্তত জানি—বহুদিনের ধূম্রায়মান সমস্যায় গত এক বৎসর ধরে বারুদ জোগাবার লোকের অভাব হয়নি। জাতীয় নেতৃত্বের একাংশ অক্লান্তভাবে বুঝিয়ে এসেছেন—"মুসলমানের শত্রু কংগ্রেস, আর কংগ্রেস হিন্দুপ্রতিষ্ঠান। কংগ্রেসের 'কুইট্‌ ইণ্ডিয়া' মানেও 'গৃহযুদ্ধ'।" জাতীয় নেতৃত্বের বৃহত্তর অংশও একবৎসর যাবৎ

(গত বৎসরের 'সিমলা বৈঠকে'র শেষে, বোম্বাই'র এ. আই. সি. সি'র অধিবেশন থেকে) তেমনি তীব্রকণ্ঠে বক্তৃতা করে এসেছেন, "ইংরেজ ভারত ছাড়তেই রাজী, ভারতের স্বাধীনতার পক্ষে বাধা এখন কেবল মুস্‌লিম লীগ্ ও মুসলমান। 'গৃহযুদ্ধ'ই যদি আসে, আসুক তা তবে।" এভাবে 'গৃহযুদ্ধের' পথ ক্রমশই তৈরী হয়ে এসেছে। হয়ত খাতাপত্রের লীগ্-প্রস্তাব বা কংগ্রেস-প্রস্তাব উদ্ধৃত করে অনেক ভালো ভালো কথা দেখানো যায়। কিন্তু কোনো প্রতিষ্ঠানের পরিচয় শুধু তার খাতার প্রস্তাব নয়—বরং তা তার নেতৃমণ্ডলীর বক্তৃতার সুর ও তার কর্মীদের মন ও কাজের ধারা, ইত্যাদি। সাধারণ মানুষ সে সবই দেখে, তার দ্বারাই প্রভাবিত হয়। সেদিক থেকে ভুললে চল্‌বে কেন, গত সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে, নির্বাচনের দিন ও তার পরেও সারা দেশে,—বিশেষ করে কলকাতায় ও তার শহরতলিতে—লীগ ও কংগ্রেস কি ধরনের প্রচারকে তাঁদের সম্বল করেছিলেন? ভুল্‌লে চল্‌বে কেন, ইতরতার সে বেসাতি ও ইতরতার সে বিস্তৃতি কোথাও এই নেতৃমণ্ডলের দ্বারা অকুণ্ঠিতভাবে ধিক্কৃত হয়নি? এবং এ কথাই বা ভুললে চল্‌বে কেন, জনমন আপনার প্রেরণায় যতবার শুধুমাত্র সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী পথে সক্রিয় হয়ে উঠেছে, যতবার সম্মিলিত অভিযানে পা বাড়িয়েছে, ততবারই এই উভয় নেতৃমণ্ডলী সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে আপোসের আশায় জন অভ্যুত্থানে বাধা দিয়েছেন, 'গুণ্ডামি' বলে তাদের সেই পথকে ধিক্কৃত করেছেন? বরং ইতরতার উত্তেজনাই তাঁদের নিকট প্রশয় পেয়েছে, স্বাধীনতার সম্মিলিত চেষ্টা সংবর্ধনা পায়নি। সাম্রাজ্যবাদী চালে, লীগ ও কংগ্রেস নেতৃত্বের ইচ্ছাকৃত ও অনিচ্ছাকৃত কথায়, কাজে, উদ্দীপনদানে, এবার সেই ব্যাহত বিক্ষোভই পরিণত হতে যাচ্ছে ইতরতার অভিযানে—গৃহযুদ্ধে। এই কঠিন সত্য অন্তত সুদৃঢ়ভাবেই রাজনৈতিক শুভবুদ্ধি ও সাংস্কৃতিক শুভচেতনা আজ ঘোষণা করবে—নেতৃত্বের এই ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত সহযোগিতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ না পেলে ভারতে ইতিহাসের এই বৃহত্তম জন-জাগরণকে আজ সাম্রাজ্যবাদীরা বিপথচালিত ও গৃহযুদ্ধে পরিণত করতে পারে না। '২৯শে জুলাই'র পরে '১৬ই আগস্ট' এ কথারই ক্লেদাক্ত সাক্ষ্য। বিপ্লবের বিরুদ্ধে প্রতি-বিপ্লবের, সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইতরতার অস্ত্র এদেশে আজ 'গৃহযুদ্ধ'।

এই সত্যের আর একটি আংশিক প্রমাণ তবু এই যে, '২৯শে জুলাই'র সব স্মৃতি এখনো ধুয়ে মুছে যায় নাই। এত বড় ইতরতার অভিযানের মধ্যেও অধিকাংশ

ক্ষেত্রেই সংঘবদ্ধ শ্রমিকদল মোটামুটি তাদের মিলন খুইয়ে ফেলেনি ; গ্রামের কৃষক এখনো এই পঙ্কে নিমজ্জিত হয়নি ; এমন কি বহু ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-সমাজও নিজেদের বুদ্ধি অনেকটা অটুট রাখতে পেরেছে। হয়ত তার ব্যতিক্রমও হয়েছে, তবু এটাই সাধারণ সত্য। এবং বহু বহু ক্ষেত্রে সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ মুসলমান নর-নারী পরস্পরকে বহুভাবে রক্ষা করেছেন, হয়ত কেউ কেউ তাতে জীবনও দিয়েছেন—তাঁদেরকে রবীন্দ্রনাথের ও দেশবন্ধুর দেশ প্রণাম জানাবে। উত্তেজিত ও অনুত্তেজিত জনতা রাজনৈতিক শিক্ষাবশে আশ্চর্য সংগঠনশক্তির পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু মুক্তিকামী মানুষ এখনো সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে প্রতীক্ষা করবে এই সংগঠন-শক্তির সচেতনতার অপেক্ষায় ; এবং তাকিয়ে থাকবে এ-দুটি শিখার দিকেই—সংঘবদ্ধ শ্রমিক-কৃষক আর সুস্থ ছাত্র ও বুদ্ধিজীবী। এ শিখাও নিবে গেলে আশ্চর্য হবার কথা নয়—সামনেই কংগ্রেস ওজারত, ঈদ ও পূজার উত্তেজনা এসে জুটবে।

কিন্তু এই দুটি শিখা থেকেই এখনো জনশক্তির আলোক-লাভের সম্ভাবনা। শ্রমিক-কৃষকের নেতৃত্বই আজ সচল জনতাকে আত্মঘাত থেকে রক্ষা করতে পারে, নবলব্ধ সংগঠনশক্তিকে শুভ আদর্শে সংযুক্ত করতে পারে। এদেশের ইতিহাসেও স্বষ্টির শুভশক্তির উত্তরাধিকারী আজ আর সাম্রাজ্যবাদী ওয়েভলের সহযোগী কংগ্রেস-নেতৃত্ব নয়, সাম্রাজ্যবাদীর সহযোগলুব্ধ আর নিরাশায় ক্ষুব্ধ লীগ-নেতৃত্বও নয়—আজ ভরসা শ্রমিকশক্তি ও তার সহযোগী কৃষক ও বিপ্লবী বুদ্ধিজীবী।

কিন্তু আগামী কয়েক মাসের উত্তেজনাময় ঘটনাবলীর মধ্যেই বোঝা যাবে—এই আলোক নিবল কি নিবল না—সামনে কি শ্রমিক-নেতৃত্বে স্বষ্টির অভিযান, না, বিকৃত নেতৃত্বে ইতরতার অভিযান ; বিপ্লব না প্রতিবিপ্লব, সংস্কৃতি না বিকৃতি।

বিবাদের সাংবাদিকতা

কলিকাতা ও বোম্বাই'র গৃহযুদ্ধের পরে এল নোয়াখালী, এল বিহার।

ভারতবর্ষের বিপ্লবী জাগরণ যে মন্ত্রীমিশনের চক্রান্তেও নেতৃদলের নিষ্ফলতায় এক আত্মঘাতের উন্মাদনায় বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে এ-আশঙ্কা আমরা ১৬ই আগস্টের পরে প্রকাশ করেছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে বুঝেছিলাম,

সুস্থ সবল জীবনযাত্রার যখন অভাব ঘটছে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রেও তখন আর সুপরিণত নতুন সম্পদ সহজলভ্য হবে না। গত তিন মাসে বাঙলাদেশে বর্বরতা ও বিকৃতির অভিযানই সদর্পে চলেছে। সঙ্গে সঙ্গে শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে আমাদের প্রকাশ স্তিমিত হয়ে এসেছে—তবে নির্বাপিত হয়ে যায়নি, এ কথাও ঠিক। শক্তিমান শিল্পী ও লেখকের পক্ষে আবার এই আঘাতে জীবনের স্বপক্ষে, মানবতার স্বপক্ষে নতুন সংগ্রামে নতুন সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ হওয়াও সম্ভব। ইতরতার ব্যাপ্তিতে অবসন্ন না হয়ে, বা বর্বরতার বিরোধে নিস্তব্ধ না হয়ে, সংস্কৃতির বাহকেরা আজও তাঁদের এই নতুন কর্তব্য সাহসের সঙ্গে গ্রহণ করবেন, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে অবস্থাকে বিচার করবেন আর প্রাণময় সৃষ্টি দিয়ে এই আত্মঘাতকে প্রতিরোধ করবেন—শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতি সকল বুদ্ধিজীবীর নিকট নিশ্চয়ই বাঙলার অতীত ঐতিহ্য ও ভাবী সংস্কৃতি এই দাবী করবে।

এ জাতীয় অপঘাতে বিচলিত হবেন না এমন সংবেদনশীল চিত্ত হয়ত অল্পই আছে। কিন্তু যাঁরা এই অপঘাতকে শুধু একটা ওজর হিসাবে গ্রহণ করে সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের যে কোনো নতুন সৃষ্টি, শুভ সাধনা ও সুস্থ প্রয়াসকে হেয় প্রতিপন্ন করতে চায়, সুস্থ সৃষ্টিকে অবজ্ঞা করবার জন্য সাধারণ মানুষকে প্ররোচিত করে, তারা যে সত্যই এই আঘাতে বেশি আহত হয়েছে এমনও নয়। বরং নিজেদের দৃষ্টির বক্রতা, সৃষ্টির দৈন্য, আত্মার ক্লীবত্ব ঢাকবার জন্যই তারা এরূপ সময়ে সুস্থ সংস্কৃতি-স্রষ্টাদের নানা ভাবে অপদস্থ করতে চায়। নইলে কর্ম-ক্ষেত্রেও বিবাদ-জীবীরা আসলে এগিয়ে আসে না, সৃষ্টি-ক্ষেত্রেও তারা বিকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে না—এ কথা তাদের ইতিহাস থেকেই স্পষ্ট বোঝা যাবে।

এই বিকৃতি-জীবী ও বক্রোক্তি-জীবীদের কলঙ্কিত ইতিহাস আরও কলঙ্কিত হয়ে উঠেছে ১৬ই আগস্টের পর থেকে এবং তাতে দেশের ইতিহাসই আজ হয়ে উঠেছে আরও রক্ত-কলঙ্কিত, আরও ভয়াবহ। বিবদমান নেতৃমণ্ডলীর সঙ্গে তাল রেখে দেশের সংবাদপত্র অনেকদিন ধরেই বিবাদপত্র হয়ে উঠেছিল। নেতাদের মতই তারাও দেশের দুই প্রবল জন-গোষ্ঠীকে বিবাদের শেষে এখন ভ্রাতৃহত্যার যুদ্ধে এনে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু সেদিনের পরেও দেশের সংবাদপত্র এ-খেলায় নিবৃত্ত না হয়ে বরং—খানিকটা অন্ধ বিদ্বেষে, অনেকটা ব্যবসায়িক স্বার্থে—পাতা জুড়ে বিবাদের বেসাতি ও ভ্রাতৃহত্যার প্ররোচনাকে

স্থান দিয়েছে। এবিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই—ভারতবর্ষের এই রক্তাক্ত দিনগুলির জন্য যারা দায়ী তাঁদের মধ্যে সংবাদপত্র অন্যতম প্রধান স্থান দাবী করতে পারে—তাদের সংবাদ বানানো, বাড়ানো, কমানো, সাজানো, প্রভৃতির জন্য, তাদের বিদ্বেষ-প্রসূ মন্তব্যের জন্য; এমন কি, দেশের শ্রেষ্ঠ লেখকদের পুরাতন ক্রোধান্ধ দিনের বিস্মৃতপ্রায় লেখাকে এ-মুহূর্তে বিশেষ দুরভিসন্ধি সাধনের উদ্দেশ্যে নতুন করে পরিবেশনের জন্য। আশ্চর্য এই যে, এই বিষ পরিপূর্ণরূপে দেশের শরীরে ছড়িয়ে না পড়া পর্যন্ত মিস্টার সোহ্‌রাবর্দীর সরকার তার বিরুদ্ধে কিছুমাত্র অবহিত হয়নি। তারপরে অবশ্য যথা নিয়মে আজ সংবাদপত্রের উপর কড়া অর্ডিন্যান্স চেপে বসছে। কিন্তু লক্ষ্য করবার মত কথা এই যে, এ সব হুকুমনামায় ভ্রাতৃবিরোধী ও ভ্রাতৃহত্যার বিরুদ্ধে যতটা শাসনের চেষ্টা আছে, তারও চেয়ে বেশি চেষ্টা আছে সাধারণ সুস্থ গণ-আন্দোলন দমনের। যেমন বাঙলার "বিশেষ ক্ষমতার অর্ডিন্যান্সে" এখন ন্যায়সঙ্গত কারণেও শ্রমিক বা কর্মচারীদেরকে হরতাল করতে বলা, সে জন্য কাগজ ও ইস্তাহার ছাপা, পুলিস, ফৌজ বা সরকারী কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ প্রকাশ করা, প্রভৃতি সব কিছুই দণ্ডনীয়। এ সব অভিযোগ প্রকাশে অবশ্য সংবাদপত্ররা উৎসাহীও ছিল না, কাজেই সংবাদপত্রগুলি এতে তাদের "স্বাধীনতা" খর্ব হয়েছে বলে বিশেষ মনেও করে না। আরও স্মরণীয় এই—বিপ্লবী জনতার বিরুদ্ধে সাহেবরা এ দাবীই করেছিল বরাবর। মুটে, মজুর, কর্মচারীরা হয়ত এ হুকুমে আরও দুর্দশা ভোগ করবে। তা করুক, বাঙলা দেশের দু'পক্ষীয় সংবাদপত্র উত্তেজিত হয়েছে সোহ্‌রাবর্দীর অন্য হুকুমে। একদল ভাবছে নোয়াখালীর বর্বরতাকে কেন্দ্র করে মুসলমানের বিরুদ্ধে প্রচারের যে "পবিত্র স্বাধীনতা" আছে, এভাবে সোহ্‌রাবর্দী তা খর্ব করছেন। অন্য দল মনে করছে—বিহারের বর্বরতাকে আশ্রয় করে হিন্দুর বিরুদ্ধে প্রচারে তাদের যে "পবিত্র স্বাধীনতা" আছে, তা এ হুকুমে বাধা পাচ্ছে। অবশ্য, কার্যত আক্ষরিক ভাবেও যে এ হুকুম খুব পালিত হচ্ছে তা নয়। আর তার উদ্দেশ্য যে ব্যর্থ হচ্ছে তা তো স্পষ্ট; এ উদ্দেশ্যেই পটেল-চালিত কেন্দ্রীয় সরকারও কতকগুলি নির্দেশ দিয়েছে। তারও কার্যত ফল হবে গরীবের কণ্ঠরোধ, কিন্তু ভ্রাতৃহত্যার প্ররোচনা দেবার "পবিত্র স্বাধীনতা" তাতেও সংযত হয়নি। হবে কি করে যখন নেতারাই ও-বিষয়ে সম্পূর্ণ সংযত হননি?

কিন্তু কথাটা এই যে, সংবাদপত্রই দেশের সংস্কৃতির সব চেয়ে সহজলভ্য বাহক। তার মধ্য দিয়ে যদি আমরা সত্যকে দেখতে ও বুঝতে না পাই তা হলে শিল্পী ও বৈজ্ঞানিকের যে দুর্দিন ঘনিয়ে উঠবে। তাই সাংবাদিক-সঙ্ঘকেও বলতে হয়—এই ভ্রাতৃ-রক্তে সত্য যেন ধুয়ে মুছে না যায় তা কি তাঁরা দেখবেন?—সংবাদ-ব্যবসায়ী মালিকরা বা সাংবাদিক গদীয়ানরা অবশ্য সত্যের থেকেও বেশি দেখবেন স্বার্থ। কিন্তু পুলিসরাজই যে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।

কি কর্মক্ষেত্রে, কি সৃষ্টিক্ষেত্রে বর্বরতার বিরুদ্ধে মানবতার সংগ্রামে দেশের বুদ্ধিজীবীরা,—শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিক, সাংবাদিক সকলে আজ সাহসের সঙ্গে সম্মিলিত হবেন—এ মুহূর্তে এই তো সংস্কৃতির দায়। [অগ্রহায়ণ, ১৩৫৩]

১৩৫৩'র সালতামামি

১৩৫৩ শেষ হচ্ছে। তেপ্পান্ন'র নববর্ষের দিনে বাঙালী হিসাবে স্বদেশী ও প্রবাসী বাঙালীর নিকট প্রশ্ন ছিল, "আজ কি আমাদের স্বাধীনতার নববর্ষ? না, আমাদের গৃহযুদ্ধের নববর্ষ? জন-সাধারণের অধীরতা ও প্রেরণার দিক থেকে দেখলে মনে হবে—স্বাধীনতার। আর সংগঠন ও নেতৃত্বের দিক থেকে দেখ্‌লে মনে হবে—গৃহযুদ্ধের।" (দ্রষ্টব্য পৃঃ ১০৭)। সেদিন যা অনেকের কানে শুনিয়েছিল কাল্পনিক ভীতি বলে ১৩৫৩ সাল তা'ই অক্ষরে অক্ষরে কঠিনতম সত্য রূপে প্রকাশিত করে দিয়ে গিয়েছে—বাঙালীর চলতি সংস্কৃতির হিসাব এ বিরোধের জের টেনে চল্‌বে ১৩৫৪ ও ১৩৫৫এর প্রথমার্ধ ("১৯৪৮এর জুন") পর্যন্ত তো নিশ্চয়ই। এ্যাটলি-ঘোষণা তা সুনিশ্চিত করেছে।

অবশ্য, গত এক বৎসরের মধ্যে মন্ত্রীমিশন ও তার "অখণ্ড ভারতে স্বতন্ত্র পাকিস্তান-মণ্ডলের" পরিকল্পনা সমাধিস্থ হয়েছে। এখন আবার এ্যাট্‌লি-মাউন্টবেটন রোয়েদাদের দিন এসেছে; রাজনীতিতে সঙ্গে সঙ্গে এসে গিয়েছে শুধু খণ্ড ভারত নয়;—খণ্ড বাঙলা, খণ্ড পাঞ্জাবের আন্দোলন,—সেই কুপল্যাণ্ড প্রস্তাবিত "হিন্দুস্থান", "পাকিস্তান", খণ্ড-খণ্ড "প্রিন্সিস্তান", এবং সবার উপরে ব্রিটিশ নেতৃত্বে "ডিফেন্স সেণ্টার" বা "সামরিক কর্তৃমণ্ডলের" অধিষ্ঠান সম্ভাবনা।

অবশ্য ভারতের রাজনৈতিক সংকটের সঠিক পরিণতি এখনো সর্বাংশে বলা সম্ভব নয়, তবু তার সম্ভাব্য কাঠামো বলা যে সম্ভব, তা স্বীকার্য্য। এই

সম্ভাব্য কাঠামো রূপ নেবে, এমন কি রূপান্তরিত হবে, ভাবীদিনের ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে। কাজেই এই কাঠামোকেই যারা স্বীকার করেছে লীগ ও কংগ্রেসের সেই দুই নেতৃত্বের পক্ষে আগামী কয়েক মাস হবে কঠিন পারস্পরিক দ্বন্দ্বের দিন। গৃহযুদ্ধই হবে, তাঁদের বিবেচনায়, এ সময়ে অনিবার্য, এমন কি ধর্মযুদ্ধও। ফলে, সমস্ত ভারতবর্ষেরই সংস্কৃতি আজ ইতরতার আঘাতে বারে বারে রক্তাক্ত হবে। এ সময়ে সংস্কৃতির স্বপক্ষে জীবন্ত শক্তি আছে সংগঠিত শ্রমিক, সংগঠিত কৃষক, সংগঠিত গণ-আন্দোলন। কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর থেকে বোম্বাই, কল্‌কাতা, কানপুর, গোল্‌ডেন্‌ রক, কিংবা দিনাজপুর, রঙ্গপুর, ময়মনসিংহ, মালদা, মেদিনীপুর প্রভৃতি অগণিত নতুন অভ্যুত্থানের দিকে তাকালেই এ সত্য বুঝতে পারি। বিপ্লব এখনো পরাহত হয়নি, যদিও প্রতিবিপ্লবও উৎকট হয়ে উঠ্‌ছে—বিশেষ করে বাঙলার দিকে তাকালেই এ-কথা সুস্পষ্ট হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেখি, সমস্ত ভারতবর্ষেই প্রতিবিপ্লবের হাতে আজ দুই অস্ত্র—গৃহযুদ্ধ আর দমননীতি ; সমস্ত ভারতবর্ষেও বিপ্লবের হাতে আজ দুই অস্ত্র - জনতার সম্মিলিত ফ্রণ্ট আর বৈপ্লবিক সংগ্রামনীতি।

বিশেষ করে বাঙলা দেশই এই মহাসঙ্কটের প্রধান দ্বন্দ্বক্ষেত্র। কারণ, বাঙলার (প্রধানত কলিকাতায়, ও আসামের চা-বাগানেও) ব্রিটেনের সাম্রাজ্য-বাদী স্বার্থ কেন্দ্রিত। গৃহযুদ্ধের নীতির মধ্য দিয়ে এখানে তাকে আত্মরক্ষা করতে হবে, এ-কথা বেশ জানে ক্লাইব্‌ ষ্ট্রীটের মালিকতন্ত্র এবং লাল বাজারের আমলাতন্ত্র। দ্বিতীয়ত, বাঙলাই নবজাত মুস্‌লিম ধনিকদের (ইস্‌পাহানী, কাশেম দাদা, আদমজী সিদ্দিকী, প্রভৃতি) ও ক্ষমতাপন্ন বাঙালী জমিদার-জোতদার, কনট্রাক্‌টার, কর্মচারী ও মধ্যবিত্ত মুস্‌লিমদের (নাজিমুদ্দীন, সাহাবুদ্দীন সোহরাবর্দী, মৌলানা আক্রাম খাঁ, বাকী প্রভৃতিদের) একমাত্র আশ্রয়কেন্দ্র। এখানে একচেটিয়া রাজত্ব পেলে মুসলিম্‌ বুর্জোয়া ক্রমে অন্যত্রও হিন্দু বুর্জোয়াদের (বিড়লা, গোয়েঙ্কা, সিংঘানিয়া প্রভৃতিদের) সঙ্গে প্রতিযোগিতা ও সহ-যোগিতা করতে সক্ষম হবে। নইলে 'অখণ্ড ভারতে' সেই হিন্দু বুর্জোয়ার চাপে তারা খর্ব হয়ে থাক্‌তে বাধ্য। তাই চাই পাকিস্তান। তৃতীয় দিকে, ব্রিটিশ শক্তি যখন দুর্বল হয়ে আস্‌ছে তখন বাঙলা-আসামের দ্বিতীয় বুর্জোয়া-শক্তি (বিড়লা, গোয়েঙ্কা, হিম্মৎসিংকা প্রভৃতি) নিজেদেরই সেই ব্রিটিশ-ধনিক-সৌভাগ্যের উত্তরাধিকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত করতেও উদ্যোগী। তাদের তাই চাই 'অখণ্ড ভারত' অর্থাৎ কলিকাতা ও আসামের উপর আর্থিক ও রাষ্ট্রীক আধিপত্য। এ তিন

প্রতিদ্বন্দ্বী ধনিক শক্তির ভাগ্য বাঙলাতেই অনেকটা স্থির হবে, এই তাদের ধারণা।

অন্যদিকে, বাঙলার পুরনো জমিদারী-তন্ত্রের সংকটও এবার প্রকট হয়ে উঠেছে। কিন্তু পুরনো কাঠামোকে ভেঙে নতুন বাঙালী ভূমি-ব্যবস্থা গড়া মুসলিম মালিকতন্ত্রের, হিন্দু মালিকতন্ত্রের কিংবা ব্রিটিশ মালিকতন্ত্রের কারো ঈপ্সিত নয়। তাই দমন-নীতির পক্ষে শ্রমিক আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন ও সমস্ত জন-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই তিন কায়েমি স্বার্থই একত্র দাঁড়াচ্ছে।—আর, সকল কায়েমি স্বার্থই শ্রমিকের ধর্মঘট, কৃষকের "তেভাগা" ও টংক-বিরোধ, ছাত্রদের স্বাধীনতা সংগ্রাম,—এককথায় সমস্ত গণতান্ত্রিক প্রয়াসকে বিপথচালিত করছে নিজেদেরই পরিপুষ্ট সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পথে।

ভারতবর্ষ ও বাঙলার এই রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিত না বুঝলে এই তেপ্পান্ন'র শেষে বাঙালী সংস্কৃতির হিসাবও ঠিক বোঝা যাবে না। কারণ রাষ্ট্র ও আর্থিক ক্ষেত্রের প্রশ্ন এই মুহূর্তে বাঙলায় দেখা দিয়েছে—'বঙ্গ-ভঙ্গের' আন্দোলনরূপে, আর "অখণ্ড বঙ্গাসামের" অভিযানরূপে। হিন্দুর মুখে, জুগিয়েছে 'পাকিস্তানী-নীতির' যুক্তি,—'হিন্দু বাঙলা চাই, হিন্দু মুসলমানের অখণ্ড বাঙলা চাই না'; আবার মুসলমানকে করেছে "অখণ্ড" জাতীয়তাবাদী,—'অখণ্ড বাঙলা চাই, বাঙালী হিন্দু মুসলমান ভেদ নাই।'

বঙ্গভঙ্গের স্বপক্ষের এবং বিপক্ষের যুক্তির বিচার এখানে সম্ভব নয়। কিন্তু তা না বিচার করলে, তার আর্থিক, রাষ্ট্রীক, সামাজিক অনিবার্য দুর্দশার কথা না বুঝলে, সম্পূর্ণরূপে এ-প্রশ্নের বিচার হয় না, তা বলাই বাহুল্য। আমাদের এখানে শুধু লক্ষণীয় এই—বাঙালী সংস্কৃতি তার যে অসঙ্গতির বোঝা নিয়ে আস্‌ছিল এবার সে তার চরম সংকট-মুহূর্তে এসে ঠেকেছে। বলা বাহুল্য, এ অসঙ্গতি একদিক থেকে দেখ্‌লে অবশ্য সেই 'বাবু কালচার' ও 'মিঞা কালচারের' দ্বন্দ্ব: আমাদের আধুনিক বাঙালী কাল্‌চার হিন্দুর সৃষ্টি; আর বাঙালী মুসলমান উনিশ শতকের সেই রিনেইসেন্সে, রিফর্মেশনে, এমনকি সেই রাজনৈতিক প্রয়াসেও যোগদান করতে পারেননি। আজও বাঙালী মুসলমান যখন বাঙলায় রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে প্রধান তখনো তার রাজনৈতিক দৃষ্টি অস্বচ্ছ, তার রাজনৈতিক প্রয়াস অস্থির ও আত্মহারা। কারণ, তার রাজনৈতিক চেতনার পিছনে কোনোরূপ বাঙালী মুস্‌লিম রিনেইসেন্স ও বাঙালী মুস্‌লিম রিফর্মেশনের উজ্জ্বল আশীর্বাদ নেই; বাঙালী মুসলমান নজরুল, আব্দুল ওদুদ বা ওয়াজেদ আলীকে গ্রহণ করে দাঁড়াতে বিমুখ

এমন কি, মুসলিম সমাজের সংস্কারেও এখনো সে উদ্যোগী নয়। তাই সত্যই কোনো "মিঞা কালচার" গঠনেও এখনো সে অক্ষম। এই রিনেইসেন্স-রিফর্মেশন-বঞ্চিত রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক বিকাশও সম্ভব নয়; পরপীড়ন ও আত্মপীড়নই হয় তার পথ। বাঙালী সংস্কৃতির ভাগ্যে "মিঞা কালচারের" কোনো বড় সৃষ্টিও তাই মিলে না, মিলে তার আক্রোশ ও আক্রমণ।

কিন্তু "বাঙালী সংস্কৃতি" রক্ষার নামেই যে-হিন্দুরা "বঙ্গভঙ্গ" চান তাঁরা বঙ্গ সংস্কৃতির এই অসঙ্গতিকেই একমাত্র সত্য বলে স্বীকার করে নেন। তাঁরা ভুলে যান—"বাবু কালচার" "মিঞা কালচারের" এই সংঘর্ষও অনেকটা বাইরের জিনিস; বাঙালীর আধুনিক কালচারের মূল সংকটটা হচ্ছে "ভদ্র-সংস্কৃতি" ও "লোক-সংস্কৃতির" বিচ্ছেদ ও দ্বন্দ্ব। বাঙালী সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে চাইলে তাকে করতে হবে সম্পূর্ণ, সমগ্র বাঙালীর সংস্কৃতি। তার জন্য দরকার হবে—রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক ক্ষেত্রে বাঙলার গণতান্ত্রিক বনিয়াদ—অর্থাৎ জমিদারীতন্ত্রের অবসান, শ্রমশিল্পের বিকাশ ও বিস্তার, বাঙালী জনতার রাষ্ট্রীয় ও আর্থিক গণতন্ত্র লাভ। সেই বনিয়াদের উপরই সার্বজনীন শিক্ষার বেদি স্থাপনা করে গড়তে হবে বাঙালীর সার্বজনীন সংস্কৃতি, বাঙালীর সর্বাঙ্গীণ সংস্কৃতি।

চতুর্দিকে যখন বাঙালী জীবন ও বাঙালী সংস্কৃতির "ভঙ্গতার" সম্ভাবনা, তারও মধ্যে এই তেরশ তেপ্পান্ন'র শেষ দিনেও অমরা লক্ষ্য করতে পারি—বাঙালীর সেই গণতান্ত্রিক জীবনের ভিত্তি আজ রচনা করছেন হিন্দু-মুসলমান বাঙালী কৃষক-মেয়ে কৃষক-পুরুষ বুকের রক্ত ঢেলে; বাঙালী মজুর আর বাঙালী কেরানী কর্মচারী দেশজোড়া ধর্মঘটের সূত্রে; বাঙালী ছাত্র ও শিক্ষক, লক্ষ মেয়ে লক্ষ ছেলে, পথে পথে জনতার সঙ্গে হাত মিলিয়ে। আর এরও মধ্য দিয়ে দেখ্ছি—বাঙালী সাহিত্যিকের সৃষ্টি-প্রতিভা নতুন পথ তৈরী করছে মন্বন্তর, গণ-আন্দোলন, দাঙ্গা, 'তেভাগা', শ্রমিক আন্দোলনকে গ্রহণ করে গানে, গল্পে, উপন্যাসে, কবিতায়, নাটকে, নৃত্যে, ব্যাক্‌চিত্রে, ছায়া-নাট্যে। বাঙালী সাংবাদিক পর্যন্ত ('স্বাধীনতার' মত সংবাদপত্রের মধ্য দিয়ে) গণ-জাগরণের এক নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করছে। বাঙালী শিল্পী তার তুলিকা নিয়ে দাঁড়িয়েছেন এই নতুন জীবনকে স্বীকার করবার জন্য। আর বাঙালী বৈজ্ঞানিকেরা নতুন বৈজ্ঞানিক কর্মী-পরিষদ গঠন করে চিন্তায় ও প্রয়াসে এক পরম শুভ সম্ভাবনার জন্য উদ্যোগী হচ্ছেন।

বিশদভাবে হিসাব নেবার প্রয়োজন নেই। কিন্তু মন্বন্তরের বাঙলার পরে

চলতি সংস্কৃতির দিকে তাকিয়ে কি বুঝ্‌তে কষ্ট হয়—কি সাহিত্যে কি শিল্পে, কি নৃত্য ও নাট্যকলায় কিংবা বৈজ্ঞানিক চিন্তায় ও প্রয়াসে বাঙলায় আজ এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গি জন্ম লাভ করেছে? সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়া ও প্রতিবিপ্লবের সমস্ত বাধা ও উপহাস অগ্রাহ্য করে সাহিত্যে, চিন্তায়, কর্মে বাঙালী জীবনের—এবং ভারতীয় জীবনেরও—আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব আজ কারা অধিকার করছেন?

তাই বিপ্লবী শক্তি যদি বাহ্যত ব্যাহত হয় আজও, তবু তার আগামী কালের জয় সুনিশ্চিত হয়ে উঠ্‌ছে। কারণ, বিপ্লবী সংস্কৃতি ইতিমধ্যেই বাঙালী জীবনে আপনার স্থান প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছে—এই যুদ্ধকালে ও যুদ্ধান্তের আলোড়নের মধ্যে বাঙলার সংস্কৃতি মোড় ঘুরছে। বাঙালী সংস্কৃতি আজ হতে চলেছে—culture for the people, of the people, অবশ্য সমাজের গণতান্ত্রিক সংগঠন সুসম্পূর্ণ হলে তবেই তা হতে পারবে culture by the people.

মধ্যবিত্ত বাঙালীর সংস্কৃতি আপনার সীমা ও সংকট উত্তীর্ণ হয়ে ক্রমেই হতে চাইবে জন-সংস্কৃতি: culture for the people, of the people and by the people. [চৈত্র সংক্রান্তি, ১৩৫৩]

শুদ্ধিপত্র

মুদ্রণকালীন যে সব ভ্রম বা বানানের অসঙ্গতি পাঠক-সাধারণ সহজেই বুঝতে পারবেন তার উল্লেখ করা বাহুল্য। কিন্তু দু'এক ক্ষেত্রে এরূপ ভ্রমের জন্য অর্থের ব্যতিক্রম ঘটতে পারে। এখানে তাই নির্দেশ করা হল। পাঠকগণ অনুগ্রহ পূর্বক শুদ্ধ-পাঠ লক্ষ্য করবেন ঃ

পৃ:	৫	পং	১০এর	'পেশা'র	স্থলে	'ভদ্র পেশা'	হবে।
"	১২	"	৩ "	'পরিষদের'	"	'রাজার পারিষদ'	"
"	১৯	"	২০ "	'তা কখনো'	"	'নিম্নস্তরে এখনো'	"
"	২৬	"	১৫ "	'শিক্ষা বাণিজ্যে'র	"	'শিল্পে বাণিজ্যে'	"
"	২৭	"	২০ "	'জ্ঞান-বিশ্বাস'	"	'জ্ঞান-বিজ্ঞান'	"
"	৩৩	"	১২ "	'চাকর'	"	'চাকরে'	"
"	৪৫	"	২৫ "	'মুসলিমজাতির'	"	'মুসলিম জাতিসমূহের'	"
"	৭৩	"	৩ "	'অগ্রসর হই'	"	'অগ্রসর নই'	"
"	"	"	৪ "	'বৈজ্ঞানিক ভুল'	"	'বৈজ্ঞানিক মূল'	"